# ঠাকুরবাড়ির সুষমা

## নারীপ্রগতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম দে'জ প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫৮

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রন্থন : রবিশঙ্কর বণিক। মাইক্রোডট্ কম্পিউটার
২০ শ্যামপুকুর লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

পরমশ্রদ্ধেয়া ড. সুমিতা চক্রবর্তী শ্রীচরণেষু

# নিবেদন

রবীন্দ্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী সুষমা দেবী নারীপ্রগতিতে সেকালের পক্ষে অনেক অগ্রবর্তিনী ছিলেন। নারীপ্রগতিতে তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপ বিস্ময়ে আমাদের অভিভূত করে। এদেশে নারীজাগৃতির জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তিনি কলমও ধরেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল নারীপ্রগতির ভাবনা ও আদর্শকে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

তাঁর ব্যতিক্রমী জীবন ও কর্ম এ প্রজন্মের কাছে এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়। এই বিস্মৃতি যতটা না লজ্জার, তার চেয়েও বেশি অতীতকে পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে আমাদের অপারগতার উদাহরণ।

তিনটি অধ্যায় ও আটটি পরিশিষ্ট-সংবলিত বর্তমান গ্রন্থ ধাপে ধাপে গৌরবময় সেই অতীতকে পুনরুদ্ধার করতে চাইছে। খুব সংক্ষেপে এই গ্রন্থের রূপরেখা বিবৃত করছি :

প্রথম অধ্যায়ে সুষমা দেবীর ব্যতিক্রমী জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় *জীবনকথা* শিরোনামে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে *নির্বাচিত রচনা* শিরোনামে নারীপ্রগতি কর্মে সুষমা দেবীর কিছু লেখা সংকলিত হল। এদেশের মেয়েদের উদ্‌বোধিত করার জন্য তিনি বিদেশি অনেক বিদুষী রমণীর জীবনকথা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। সুষমা দেবীর লেখা সেইসব জীবনকথা গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে। তাঁর লেখা শিক্ষাবিষয়ক রচনা, ধর্মবিষয়ক রচনাও এখানে গ্রথিত কবা গেল।

তৃতীয় অধ্যায়ে *নির্বাচিত ভাষণ* শিরোনামে আমেরিকায় সুষমা দেবীর প্রদত্ত ৩৮টি ভাষণের মধ্যে দুটি ভাষণ সংকলিত হল। স্বদেশে প্রদত্ত তাঁর দুটি

ভাষণও এই অংশে সংযোজিত হয়েছে। এই অংশের সমস্ত রচনাগুলিই প্রায় অপ্রকাশিত।

আমেরিকায় প্রদত্ত সুষমা দেবীর ভাষণগুলির প্রতিক্রিয়ায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ পরিশিষ্টে সংযোজিত হল। পরিশিষ্টে সুষমা দেবী সংক্রান্ত কয়েকটি চিঠিও যুক্ত হয়েছে। সর্বোপরি, সুষমা দেবীর দিদি শোভনাসুন্দরী দেবী ও বোন সুদক্ষিণা দেবীর কয়েকটি নারীপ্রগতিমূলক অগ্রন্থিত রচনাকেও এখানে যোগ করেছি। সংকলিত সমস্ত রচনার তথ্যসূত্র প্রদত্ত হয়েছে পরিশিষ্ট ৪-এ।

গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য পারুল প্রকাশনীর কর্ণধার মহাশয়ের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, চৈতন্য লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাছেও আমি ঋণী। সুষমা দেবীর রচনাগুলির মুদ্রণ-অনুমতি দানের জন্য সুষমা দেবীর দুই পৌত্র শ্রীজয়ন্তনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। সুষমা দেবীর একটি রচনার জন্য *উদ্বোধন* পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কেও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

প্রত্যুষকুমার রীত

# সূচি

## তৃতীয় অধ্যায়

## প্রথম অধ্যায়

# জী ব ন ক থা

## ঠিক-ভুল

রবীন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে বড়ো উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়েছেন তাঁদের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধু এই দুই ভাইয়ের ক্ষেত্রেই নয়, ঠাকুরবাড়ির আরও অনেকেরই ওপর হেমেন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে। ঠাকুর পরিবারের শিক্ষাভাবনা ও শরীরচর্চার ক্ষেত্রেও হেমেন্দ্রনাথ স্মরণীয় হয়ে আছেন। হেমেন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যারাও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

হেমেন্দ্রনাথের প্রত্যেক কন্যাই হয়ে উঠেছিলেন এক-একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। প্রতিভাসুন্দরী, প্রজ্ঞাসুন্দরী, অভিজ্ঞাসুন্দরী, মনীষাসুন্দরী, শোভনাসুন্দরী, সুনৃতাসুন্দরীরা নানাভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। হেমেন্দ্রনাথের অষ্টম কন্যা হলেন সুদক্ষিণা দেবী। সুষমাসুন্দরী দেবী হেমেন্দ্রনাথের সপ্তম কন্যা।

প্রতিভা-প্রভা-অভিজ্ঞা-শোভনার মতো বোন সুষমা দেবীও সেকালের পক্ষে অনেক অগ্রবর্তিনী ছিলেন। তাঁর জন্ম জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় কুড়ি বছর পরে। তিনি বেঁচেছিলেন প্রায় চুরাশি বছর ; ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে মারা যান তিনি। সেই হাওড়ার শিবপুরে। আমরা পরিশিষ্টে সুষমা দেবীর শ্রাদ্ধের কার্ডটির প্রতিলিপি চিত্র দিয়েছি। সেখান থেকে তার মৃত্যুদিনের সঠিক সংবাদটি জানা যায়।

উল্লেখ্য যে, চরিতাভিধানগুলিতে সুষমা দেবীর নামের উল্লেখ চোখে পড়ে না। চিত্রা দেব তাঁর *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল* গ্রন্থের (আনন্দ, ১৮৮১) বংশতালিকায় সুষমাসুন্দরীর স্বামীর পদবি 'মুখোপাধ্যায়'-এর বদলে করেছেন 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। একই তালিকায় ভাস্করনাথ-এর বড়ো ছেলে জয়ন্তনাথের স্ত্রীর নাম করেছেন

'সুতপা'-র পরিবর্তে 'সুষমা'। তা ছাড়া অনেক তথ্যই কিন্তু আসেনি শ্রীমতী দেবের পূর্বোক্ত গ্রন্থের বংশতালিকায়। বংশতালিকা সম্পূর্ণ ও নির্ভুল না-হলে যে পাঠকসাধারণের বিভ্রান্ত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থেকে যায়। তথ্যের শূন্যস্থান গ্রহণ করা যায়, কিন্তু ভুল তথ্য এহেন সুবিখ্যাত গ্রন্থে পরিবেশিত হওয়া বিপজ্জনক।

সুষমা দেবীর বাল্যশিক্ষা বিষয়েও ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা অবশ্য সংশোধিত হয়েছে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের নিয়ে লেখা ইতিহাস গ্রন্থে।

চিত্রা দেব তাঁর *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল* গ্রন্থে লিখেছেন, 'তাঁর দিদিরা সবাই লোরেটোতে পড়লেও সুষমা ভর্তি হন ডায়োসেশনে।' সুষমা দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা ভারতী *দেবীর স্মৃতিচারণায় উল্লেখ* :

> আমার মা 'ডায়াসেশনে' পড়তেন। যদিও তিনি পিয়ানো শিখতেন 'লরেটো' স্কুলে। শুধু তাই নয়, আমার মা ভালো ঘোড়ায় চড়তেও জানতেন। ঘোড়ায় চড়ার জন্য তাঁর আলাদা জকির মতো পোশাকও বাড়িতে আমি দেখেছি।

ঠাকুরবাড়ির শুধু জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নয়,সুষমা দেবীও রীতিমতো ঘোড়ায় চড়তেন, সেদিকগুলি প্রায় অনালোকিত। তা ছাড়া সুষমার বোন সুদক্ষিণার স্বামী মারা গেলে মাত্র ২৭ বছর বয়সে তিনি ঘোড়ায় চড়ে জমিদারি কার্য পরিচালনা করতেন ; সে-ও এক বিস্তৃত ইতিহাস। তাছাড়া সুষমা দেবীর কনিষ্ঠ পুত্রের পুত্র জয়ন্তনাথের ভাষ্য : 'ঠাকুরমা এবং বাবার কাছেও শুনেছি, তিনি (সুষমা) কনভেন্টেই পড়তেন।'

পিয়ানোর পরীক্ষায় কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকেও প্রথম হন সুষমা। সে পরীক্ষা অবশ্য কলকাতায় হত। পরীক্ষায় মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮৮ পেয়েছিলেন তিনি। এসব সুষমার বিয়ের আগের কথা। বিয়ের পর তিনি প্রাইভেটে এন্ট্রান্স পাস করেন। স্বামীর সাহচর্যেই।

## ইংরেজিতে পারদর্শিতা

সুষমা দেবীর ইংরেজিতে দক্ষতার কারণে তিনি বিড়লা পরিবারের ও গায়কোবাড় রাজপরিবারের ইংরেজির গৃহশিক্ষিকা হয়েছিলেন। 'বালিকা শিক্ষা সংঘ' ছাড়াও ঠাকুরবাড়িতেও তিনি মেয়েদের এক স্কুল চালাতেন, যার পরিচয় আমরা পরিশিষ্টে সংযোজিত ইংরেজি সমালোচনার সংবাদগুলিতে দেখতে পাব। গায়কোবাড় পরিবারের শিক্ষিকা পদে বৃত হওয়ার কাগজপত্রের প্রতিচিত্রও পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে।

## বিবাহ

জীবনের প্রথমদিকে সুষমা অবশ্য বিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু মায়ের দৃঢ়তার কারণে তিনি এ নিয়ে বিদ্রোহ করতে পারেননি। ব্যারিস্টার যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ, বুধবার। রবিজীবনীকার আমাদের জানিয়েছেন যে, মহর্ষি এ বিবাহে ৪০০০ টাকা যৌতুক দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন শোভনার স্বামী নগেন্দ্রনাথের ভাই। সুষমার বিবাহে নগেন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছিলেন। *পুণ্য* পত্রিকার পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৃ. ৫৬) তা প্রকাশিতও হয়। যোগেন্দ্রনাথ থাকতেন হাওড়ার শিবপুরে। ব্যারিস্টারি ছেড়ে তিনি কলেজে, পরে হাওড়া জিলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন (১৯০৬-১৯১৫)। সবশেষে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মিথ্যা বলার পেশা তিনি পূর্বেই ছাড়েন। হাওড়ার শিবপুরে তিনি থেকেছেন কালীকুমার মুখার্জি লেন, রামমোহন মুখার্জি লেন, হেম ব্যানার্জি লেন, নাগপাড়া লেন প্রভৃতি স্থানে।

যোগেন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার হলেও তিনি এই কর্মে সম্পূর্ণ মন দিতে পারেননি। তিনি প্রচুর গণিতচর্চা করতেন। *মডার্ন এরিথমেটিক* গ্রন্থটি তাঁর লেখা এক জনপ্রিয় স্কুল-পাঠ্যপুস্তক ছিল। সুষমার নারীপ্রগতি কর্মেও তিনি কোনো বাধা দেননি। ভারতীয় আইনেরও এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যোগেন্দ্রনাথ। নাম : *ল রিলেটিং টু হিন্দু পর্দানসীন উইমেন*। এটি ছিল সুষমা দেবীর নারীপ্রগতি কর্মের পরিপূরক। ঠাকুরবাড়ির *পুণ্য* পত্রিকায় যোগেন্দ্রনাথের বহুবিধ রচনা মুদ্রিত হয়েছে।

## নারীপ্রগতি

সুষমা অবশ্য দিদিদের মতো কেবলমাত্র সংগীতচর্চা, সাহিত্যচর্চা ও রন্ধনচর্চাতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি, তিনি গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন নারীপ্রগতি কর্মে।

*আঙ্কল টমস্ কেবিন* প্রণেত্রী হ্যারিয়েট বিচার স্টো-র অবদানের কথা তিনি *পুণ্য* পত্রিকায় লেখেন। উল্লেখ্য যে, *আঙ্কল টম্‌স কেবিন* গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থের লেখিকার জীবনচরিত সুষমার নারীপ্রগতির মনকে গড়ে তুলেছিল। মহীয়সী মহিলা

মাদাম স্টো-র জীবনীই শুধু নয়, পুণ্য পত্রিকার পাতায় তিনি পরপর লেখেন প্রগতিশীল বিদেশিনী হ্যারিয়েট মার্টিনো, সুইডিশ গায়িকা লিন্ডে-র জীবনী। সেই সমস্ত জীবনকথায় তিনি নারীদের অগ্রগতির কথাই বর্ণনা করেছেন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতি। লক্ষ্য ছিল এদেশের মেয়েদের উদ্‌বুদ্ধ করা। নারীপ্রগতিই একমাত্র ছিল তাঁর ভাবনায়। তাঁর রচনা যেন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, 'যাঁহারা বলেন যে, স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধি পরিচালন দ্বারা কোনো কর্ম করিবার শক্তি নাই। মহিলাগণ কেবল সন্তানপালন করিতেই জানে। স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা কিছুই করিতে পারেন না।'

সুষমা দেবী নারীপ্রগতিতে এগিয়ে এলেও (১৯২২ খ্রি. থেকে সম্পূর্ণভাবে) জীবনের প্রথমদিকে সাতটি সন্তানের প্রতিপালনেই ব্যস্ত ছিলেন। আন্তরিকতা থাকলেও তাই পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারেননি। সে কারণে সুষমা দেবী প্রথম জীবনে তেমন আলোকিত হয়ে উঠতে পারেননি।

তবে পরে তিনি তাঁর ভাবনাচিন্তাকে রূপ দিয়েছেন। তিনি নারী প্রগতিবাদী হলেও, তা ছিল একান্তভাবেই ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শে গড়া নারীভাবনা। তাঁর কাছে নারীপ্রগতি ছিল শিক্ষিতা ও আত্মমর্যাদাসম্পন্না, স্নেহপ্রবণ মা ও স্বামী প্রেমিকার গুণান্বিত রমণীর কথা। তাঁর রচিত ইংরেজি গ্রন্থ *আইডিয়াল অব হিন্দু উওম্যানহুড*-এ তেমন ভাবনাই পরিবেশিত হয়েছে।

তিনিই শোভনাকে নারীপ্রগতিতে প্রভাবিত করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। শোভনা দেবীর মতোই সুষমা দেবীও যথেষ্ট সংগীতচর্চা করতেন তার পরিচয়দান প্রথমেই কিছুটা করা গেছে। এই রচনার পরবর্তী অংশে দেখা যাবে, *পুণ্য* পত্রিকায় তিনি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন। তবে পরবর্তীকালে সাংসারিক চাপে সমস্ত কাজই তাঁর শ্লথগতি হয়।

তবে নিজের ছেলেমেয়েরা বড়ো হতে সুষমা দেবী নারীপ্রগতির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সুষমা দেবী হাওড়াতে 'বালিকা শিক্ষা সংঘ' (১৯২২) নামে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নারী প্রগতির জন্য এ তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। হাওড়ার সালকিয়াতে 'বালিকা শিক্ষা সংঘ' স্থাপন করেই বুঝলেন মেয়েদের অশিক্ষার হার কত বেশি, সে তুলনায় শিক্ষিত মেয়েদের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়।

## বিদেশযাত্রী

১৯১৬-তে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার এগারো বছর পরে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭-এ তাঁর ভাইঝি সেখানকার মানুষের মনকে টলিয়ে দেন তাঁর বক্তৃতায়। সুষমার আচার-আচরণ-ভাবভঙ্গি তাঁদের কাছে 'most unladylike' মনে হলেও তাঁরা ক্রমশ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন সুষমার প্রতি— তাঁর কথায়, তাঁর উত্তরে, তাঁর ভাষণে।

সুষমা দেবী কোন জাহাজে করে বিদেশযাত্রা করেছিলেন বা কোন সময় ফিরলেন এবং সেখানে কোন পত্রিকায় তাঁর বক্তব্যের কী সমালোচনা হল আমরা পরিশিষ্ট ৬-এ তার সমস্ত পরিচয় পাব।

জুলাই, ১৯২৯ পর্যন্ত মার্কিন মুলুকে মোট ৩৮টি স্থানে সুষমা বক্তৃতা করেন। প্রত্যেক স্থানেই মেয়েদের ভীষণ ভিড় হত। সুষমা প্রচুর দক্ষিণাও পেয়েছেন বক্তৃতা বাবদ। সুষমার বক্তৃতার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি হল, 'নারীশিক্ষা', 'ভারতের নারী', 'ভারতের আদর্শ', 'ভারতের দর্শন', 'বিশ্বভগ্নিত্ব বোধ', 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'মহাত্মা গান্ধির দর্শন', 'বৈদিক সংগীত', 'মাই পিলগ্রিমেজ টু আমেরিকা', 'অ্যাডভানটেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভানটেজ অব ইন্টার ম্যারেজ বিটুইন ইন্দো-এরিয়ানস অ্যান্ড ইউরো-এরিয়ানস' প্রভৃতি। সুষমা দেবীর ভাষণগুলি অপ্রকাশিত হলেও তাঁর ভাষণের দু-একটি কথা উদ্ধৃতি হিসাবে কোনো গ্রন্থে লক্ষ্য করা গেছে। সমকালীন দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকাতেও সুষমা দেবীর ভাষণের কোনো কোনো কথা উদ্ধৃত হয়েছিল সংবাদ হিসাবে।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বিলেত গিয়েছিলেন (১৮৭৭ খ্রি.), মনীষা দেবী ও শোভনা দেবীও ইউরোপ গিয়েছিলেন, নিছক বেড়ানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু সুষমা দেবীই ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। 'উইমেন্‌স এডুকেশনাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া'র প্রতিনিধি হয়ে শিক্ষার এক মহাসম্মেলন 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ন্যাশনাল এডুকেশন'-এর কনফারেন্সে (১৯২৭ খ্রি.) যোগদানের জন্য। মনীষা দেবী শোভনা দেবীরা বেড়াতে গেলেও সুষমা গিয়েছিলেন শিক্ষার আন্দোলনে যোগ দিতে, নারীপ্রগতির জন্য। সুষমার আগে অবশ্য বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় আমেরিকায় অসামান্য কর্মের ছাপ রেখেছিলেন। ভারতীয় নারী রমাবাই-এর নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। রবীন্দ্রনাথের পরে পরে সুষমা দেবীও আমেরিকায় আদরণীয় হয়ে উঠতে

পেরেছিলেন 'Niece of Tagore' বলে। তা ছাড়া সুষমার সৌন্দর্যেও যে আপ্লুত হয়েছিলেন বিদেশিরা, তার নানা সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়।

## নারীর কর্তব্য

নারীশিক্ষা, নারী-স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তাঁর *আইডিয়াল অব হিন্দু উওম্যানহুড* গ্রন্থটিও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য। ভারতীয় নারীদের আদর্শরূপে তিনি সতী, সীতা, শৈব্যা, সাবিত্রী, দময়ন্তী এবং শকুন্তলাকে বেছে নিয়েছিলেন। ত্যাগে, প্রেমে উজ্জ্বল নারীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আত্মমর্যাদার কথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন।

ঠাকুরবাড়ির *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় তিনি শিক্ষা নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছিলেন। হেমেন্দ্রনাথের পারিবারিক পত্রিকা *পুণ্য*-তেও সুষমা দেবীর কয়েকটি রচনা দেখা যায়। কয়েকটির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেগুলি ছাড়াও *পুণ্য*-তে গানের স্বরলিপিও রচনা করেছেন পত্রিকার পঞ্চম বর্ষে (পৃ. ৯৪, ৩১৬-৩১৭)। এই পঞ্চম বর্ষেই লিখেছেন *রাজনীতি ও রমণীপ্রতিভা* (পৃ. ১৮৮-১৯৬)। *পুণ্য* পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষে তিনি আবার জীবনীবিষয়ক রচনা লিখলেন 'সুকবি হেম্যান্স' (পৃ. ৮৯-৯৬)। পাঠক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এই লেখক প্রণীত *ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা পুণ্য* গ্রন্থে এর পরিচয় পেতে পারবেন।

সুষমা দেবী ১৮৪৬ শকের *তত্ত্ববোধিনী*-তে (পৃ. ৩৪০) লেখেন 'আধুনিক ছাত্রজীবন'। *তত্ত্ববোধিনী*-তে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনি। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের *তত্ত্ববোধিনী*-তে (পৃ. ২০৫) তিনি লেখেন 'রাউলপিন্ডির পথে' নামক ভ্রমণকাহিনি। তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে দেখা যায় ভ্রমণ বর্ণনার থেকেও সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে কাশ্মীরবাসীদের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা।

তিনি *তত্ত্ববোধিনী*-তে ক্রমাগত নানা ভ্রমণকাহিনি লেখেন। যথা, 'শ্রীনগরের পথে' (১৮৪৪ শক, পৃ. ৩৩৮), 'শ্রীনগরের পথে' (১৮৪৫ শক, পৃ. ১১০, ২৫৪, ২৮৬, ৩২৪, ৩৪৮), 'শ্রীনগরের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বন্য অধিবাসী' (১৮৪৬ শক, পৃ. ১২), 'শ্রীনগর ভ্রমণবৃত্তান্ত' (১৮৪৬ শক, পৃ. ১০৬, ১২৮)।— অর্থাৎ শুধু শ্রীনগর ভ্রমণ নিয়েই সুষমা দেবী *তত্ত্ববোধিনী*-তে নয় কিস্তি লেখেন। এখানেই লেখেন *রামপুরের পথে* প্রবন্ধ। সে সমস্ত রচনা নিয়ে সম্প্রতি সুষমা দেবীর

তা ছাড়াও *তত্ত্ববোধিনী*-তে সুষমা লেখেন 'বাল্যবিবাহ' (১৮৪৭ শক, পৃ. ২৬৯) এবং 'শিক্ষার তাড়না' (১৮৪৭ শক, পৃ. ২৪৯) নামক দুটি প্রবন্ধ।

মার্কিন মুলুকের সভায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে সুখ-শান্তি প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সুষমা দেবী বলেছিলেন :

> Real satisfaction lies in control and self restraint. Let us enjoy the material side of life, but not loose ourselves in its glamour.

সুষমা দেবীর উপদেশ ছিল ভোগবিলাস না বাড়ানো ও ভোগবিলাস ত্যাগ করা। বিবাহবিচ্ছেদ নিয়েও সেখানে আলোচনা করেছিলেন তিনি। বিদেশে বিবাহবিচ্ছেদ স্বাভাবিক হলেও ভারতে এই সামাজিক বন্ধন অনেক তীব্র কেন, এই প্রশ্নের জন্য তাঁর উত্তর ছিল :

> Your idea of marriage, compassionate marriage and love seems very strange to us. Your divorces startle us. We believe in the holiness of marriage considering it sacred and divine union of two souls. Our marriages are regarded as permanent, separation or divorce unspeakable, we stay married.

সেই সভায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে নিয়ে আরও নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। ভারতে স্ত্রীরা কেন স্বামীর অধীনস্থ হয়, এমন প্রশ্নের উত্তরে সুষমা দেবী বলেন— 'ভারতীয় স্বামী-স্ত্রীরা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে ভরপুর। তার প্রমাণ হিসাবে তিনি বলেন যে তাঁর স্বামীকে ছাড়াই তিনি সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে সে দেশে এসেছেন। এটাই কি যথেষ্ট নয়?'

যাইহোক,নারীপ্রগতি, নারীশিক্ষা ভাবনাই ছিল সুষমা দেবীর বিদেশযাত্রার মূল কারণ। বিদেশ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফিরলে তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে মনোভাবনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। লোকশিক্ষা, জনশিক্ষার জন্য সুষমা দেবী কয়েকটি মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন ; রবীন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লোকশিক্ষাভাবনার পাশাপাশি তা সমান মূল্যবান। সুষমা দেবী চেয়েছিলেন 'ভারতের গ্রাম নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি'-র প্রতিষ্ঠা। প্রত্যেক প্রদেশে 'প্রাদেশিক কমিটি' প্রতিষ্ঠার কথাও ভেবেছিলেন আর 'গ্রাম্য শিক্ষা কমিটি'-র বিস্তৃত পরিকল্পনাও তিনি করেছিলেন, তার ব্যয়নির্বাহের ভাবনাও করেছিলেন সুষমা, সেই পরাধীন

ভারতেই। সে বোধহয় এক 'কঠিন এক্সপেরিমেন্ট', 'দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার' বা 'মহৎ সাধনা'। এখানে সুষমা দেবীর শিক্ষার বিস্তার ও পল্লিচিন্তা বড়ো প্রকট হয়ে উঠেছে। নারীশিক্ষা শুধু নয়, নারীমুক্তির নানা দিক তাঁর ভাবনায় ছিল, অবশ্যই ভারতীয় আদর্শে। সুষমা দেবীর এইসব চিন্তাভাবনার সঙ্গে তাঁর কাকা রবীন্দ্রনাথের অনেক মিলও ধরা পড়ে একটুমাত্র মনোনিবেশে। 'জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সহজ উপায়' প্রবন্ধে সুষমা দেবীর তেমনি নানা চিন্তাভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। তার সঙ্গে 'বাল্যবিবাহ', 'শিক্ষার তাড়না' প্রবন্ধগুলিরও যোগসূত্র আছে।

বিদেশ থেকে ফিরে সুষমা দেবী আরো নানাভাবে দেশের উন্নতিতে মনোনিবেশ করেন। বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত, বিধুভূষণ বসু সম্পাদিত *পল্লীচিত্র* পত্রিকার ১ম বর্ষেই সুষমা দেবীর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, আমেরিকা থেকে কৃষিকার্য শিখে এদেশে প্রয়োগের কথা।

বহু গুণের অধিকারিণী সুষমা ইংরেজিতেও অসম্ভব দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ইংরেজি বলার ভঙ্গি তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। মার্কিন দেশের কিছু সংবাদপত্রে সে বিবরণ আছে। তিনি পরে *চতুরঙ্গ* (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬) ও *উদ্বোধন* পত্রিকায় লেখেন 'আমেরিকায় বেদান্ত ধর্মের প্রভাব ও সমাদর' নামক রচনা। পূর্বে কথিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষামূলক সভায় সুষমা দেবী ভারতীয় নারীর আদর্শ, শিক্ষা ও দর্শনের বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সুষমা দেবী নূতন কথা বলতে সমর্থ হয়েছিলেন। সুষমা দেবীর ইংরেজি বলার ভঙ্গি তাঁকে যে বিশিষ্ট করে তুলেছিল, *ডেইলি টেক্সাস*-এর এক প্রতিবেদন থেকে তা বোঝা যায় :

> ...She is also capable of presenting it in clear and forceful English, which none of the people of India can do.

## বিবেকানন্দের প্রভাব

শুধু সরলাই নয়, বিবেকানন্দের ভাবধারায় আপ্লুত ছিলেন সুষমাও। সুষমা দেবী পছন্দ করতেন বিবেকানন্দের সংস্কারমুক্ত জীবনধারা এবং উদারতা। তিনি নিজে ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্ভুক্ত হলেও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিও যথেষ্ট অনুরাগিণী ছিলেন। সে কারণে তিনি স্বামীজি সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিন্দামূলক কথার তথ্যানুসন্ধান করেছিলেন আমেরিকায় এবং দেখেছিলেন স্বামীজির মহানত্ব। দেশে

ফিরে নানা পত্রপত্রিকায় তা প্রমাণ করেছিলেন নানা রচনার মাধ্যমে। *বামাবোধিনী* পত্রিকা, শিবনাথ শাস্ত্রীর *মুকুল, প্রবাসী,* এমনকি ঠাকুরবাড়ির *ভারতী* পত্রিকাও বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেছিল। কিন্তু সুষমা দেবী স্বামীজিকে নূতনভাবে আবিষ্কার করলেন, তাঁর নিন্দার শাস্তিকে মোচনে প্রয়াসী হলেন। ১৯২৭-১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ—এই দু-বছর বিদেশে থেকে তিনি এসব সমস্যার নিরসন ঘটান এবং একই সঙ্গে ভারতের নারীসমাজ নিয়ে পাশ্চাত্যের ভুল ধারণা দূর করেন।

## প্রিয়দর্শিনী

সুষমা দেবী অসম্ভব রূপবতী ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় :

> আমার মাসিদের মধ্যে আমার মা-ই ছিলেন সবচেয়ে রূপসী। জীবনে কোনো প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করেননি। তবে শীতকালে মৌচাকের মোম থেকে তিনি নিজ হাতে ক্রিম তৈরি করতেন। সাবানের বদলে বেসন মেখে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে শরীর পরিষ্কার রাখতেন। এ ছাড়া, তিনি দেশীয় উপায়ে দাঁতের মাজন তৈরি করতেন নিজ হাতে। আমরা ছেলেবেলায় সেই মাজনই ব্যবহার করতাম। কবিরেজি মতে ছাই বা অঙ্গার গুঁড়ো করে—তাতে হরীতকী ও সুপারি গুঁড়ো মিশিয়ে সুগন্ধি দিয়ে মাজন তৈরি করতেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন সুষমা গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর সৌন্দর্য, নিরাভরণ লাবণ্য অনেককে মুগ্ধ করেছিল। সেখানে সংবাদপত্রে সুষমা দেবীর রূপলাবণ্যের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে :

> Miss (?) Tagore is a charming bit of the orient in an occidental setting. Short of stature, quiet and demure, with lazy dark eyes that can flash fire when the occasion arises, it takes the native garb of India to really do justice to her Hindu Beauty.

এই বিবরণ যে কোনো অতিশয়োক্তি নয়, তার আরও নানা প্রমাণ আছে। সেদিকে আমরা যাচ্ছি না।

## উত্তরাধিকার

সুষমা দেবীর পুত্র-কন্যাদের মধ্যে ভাস্করনাথের পুত্র-কন্যারা ও ভারতী দেবীর কন্যা এখনও জীবিত আছেন। সেদিকের তথ্যাদি অন্বেষণের বোধহয় প্রয়োজন আছে ও অবকাশ আছে। যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের থেকে এখনও ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসের লুপ্তপ্রায় তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব।

সুষমা দেবীর সাত সন্তান-সন্ততির ইতিহাসও এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। সাতটি সন্তানের মধ্যে পাঁচটি পুত্রসন্তান ও দুটি কন্যাসন্তান :

১. যতীন্দ্রনাথ (স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ)
২. লোকেন্দ্রনাথ
৩. শংকরনাথ (শ্রী নিবাসাচার্য)
৪. ভর্গনাথ (+ গৌরী)
৫. সুমিত্রা (+ বিমলেন্দু ঘোষাল)
৬. ভাস্করনাথ (+ উমা)
৭. ভারতী (+ জনকপ্রকাশ গাঙ্গুলি)

চতুর্থ পুত্র ভর্গনাথের ছিল চারপুত্র ও এক কন্যা। পাঠক চিত্রা দেবের *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে* তার বিস্তৃত তালিকাটি পাবেন। ভর্গনাথের কন্যা প্রয়াত হলেও চার পুত্র এখনও বর্তমান। সেখানে যা নেই এখানে তা উল্লেখ করি :

৬. ভাস্করনাথ (+ উমা)
—জয়ন্তনাথ [+ সুতপা (বুলবুল)] → সুমনা, সুজয়
—নৃপেন্দ্রনাথ (+ প্রভাবতী) → অনির্বাণ (চিরশ্রী)



আয়ুষ্মান
—পাঁচ কন্যা (লক্ষ্মীশ্রী, মঞ্জুশ্রী, রাজশ্রী, গীতশ্রী, মীনাশ্রী)

৭. ভারতী দেবী (+ জনকপ্রকাশ গাঙ্গুলি)
—জয়শ্রী (+ অমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
—জয়প্রকাশ গাঙ্গুলি

সুষমা দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা ভারতী দেবীর বিয়ে হয় প্রথম বাঙালি পাইলট জনকপ্রকাশ গাঙ্গুলির সঙ্গে। তিনি বিখ্যাত জমিদার বাড়ির সন্তান ছিলেন। তাঁর

পিতা ছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতী দেবীও সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। তিনি থাকতেন হাওড়ার ব্যাতাইতলায়, গৃহী সন্ন্যাসী পুত্র জয়প্রকাশের কাছে। তিনি দার পরিগ্রহ করেননি। ভারতী দেবীর পুত্র জয়প্রকাশও সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। জয়প্রকাশবাবু মামা শংকরনাথের দ্বারা সন্ন্যাসী ভাবাদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হন। যাইহোক, ভারতী দেবীর বিয়ে হয়েছিল ব্রাহ্ম মতে ; কিন্তু পতিগৃহে হিন্দুমতে বিবাহ হয়। ভারতী দেবীর কন্যা জয়শ্রীর বিয়ে হয় এক গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। তিনি কলিকাতার বালিগঞ্জে থাকেন।

ভারতী দেবী প্রথমে হাওড়া গার্লস স্কুলে পড়লেও পরে বেথুন কলেজে ভর্তি হন এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করতে থাকেন। সে সময়ই তাঁর বিয়ে হয়।

সুষমা দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র ভাস্করনাথ মুখোপাধ্যায় হাওড়া জিলা স্কুলে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেন এবং ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংকের ম্যানেজারি থেকে অবসরপ্রাপ্ত হন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিবাহ হয় উমা দেবীর সঙ্গে। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ -এ তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁদের দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা-সন্তান। দুই পুত্র জয়ন্তনাথ ও নৃপেন্দ্রনাথ এখন জীবিত আছেন ; একজন শালিমারে ভড়পাড়া রোডে থাকেন পৈতৃক বাড়িতেই। অন্যজন পাশেই, ব্যাতাইতলায় থাকেন। জয়ন্তনাথ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি 'গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড' থেকে অবসরপ্রাপ্ত। তাঁর পাঁচ বোনের ইতিহাসও তাঁর কাছ থেকে অনায়াসে উদ্ধার করা সম্ভব। তাঁর ভাই নৃপেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কণ্ঠসংগীতে এম. এ. পাশ করেছেন ও বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পদকও লাভ করেছেন এবং তবলা বাদনেও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

সুষমা দেবীর বড়ো মেয়ের বিয়ে হলেও স্বামীর প্রবাসকালে অতি অল্প বয়সে মারা যান বড়ো মেয়ে সুমিত্রা। তাঁর স্বামী বিমলেন্দু ঘোষাল আর দেশে ফেরেননি। বিদেশ থেকে সুষমা দেবীকে লেখা তাঁর একটি পত্রও পরিশিষ্টে সংযোজিত করা হয়েছে।

সুষমা দেবী নিজে সংসারী হলেও সাধু-সংসর্গে অনেক সময় কাটাতেন। তাঁর বড়ো ছেলে ও সেজ ছেলে দুজনে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। তাঁর মেজ ছেলে সন্ন্যাসী না-হলেও তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের একদা সভাপতি স্বামী বীরজানন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন গৃহী সন্ন্যাসী এবং অকৃতদার। তিনি

দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগ দেন, কারাবরণও করেন। তিনি হাওড়া কর্পোরেশনে চাকরিও করেন। আর তাঁর চতুর্থ পুত্র ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ দন্ত চিকিৎসক ; হাওড়া মল্লিক ফটকের পাশেই সন্ধ্যাবাজারে ছিল তাঁর চেম্বার। সুষমা দেবীর পুত্র বা কন্যা কেউ আজ জীবিত নেই। সুষমা দেবীর বড়ো ও সেজ ছেলের সন্ন্যাসী হওয়ার নেপথ্যে তাঁদের মামা ক্ষিতীন্দ্রনাথের সন্ন্যাস-জীবনের অনুপ্রেরণা অনেকে অনুভব করেন।

রবীন্দ্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী সুষমা দেবী নারী প্রগতিকর্মে সেকালের পক্ষে অনেক অগ্রবর্তিনী ছিলেন। নারী প্রগতিকর্মে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ আমাদেরকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। এদেশে নারীজাগৃতির জন্য তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিদেশি বিদুষী রমণীদের জীবনকথাও লিখতে আরম্ভ করেন, এদেশের মেয়েদের উদ্‌বোধিত করার জন্য। সুষমা দেবী লিখিত পূর্বে কথিত সেই সমস্ত জীবনীমূলক রচনাগুলি (যা নারী প্রগতিকর্মের জন্যই মূলত লিখিত) ও তাঁর শিক্ষাবিষয়ক রচনাগুলি এবং নারীপ্রগতিমূলক ও ধর্মমূলক কয়েকটি রচনার সমাহারে সুষমা দেবীর জীবন ও কর্মের এক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ গড়ে তোলা গেল।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# নির্বাচিত রচনা

# হ্যারিয়েট মার্টিনো

যাঁহারা বলেন যে স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধি পরিচালন দ্বারা কোনো কর্ম করিবার শক্তি নাই, মহিলাগণ কেবল সন্তান পালন করিতেই জানেন, স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা কিছুই করিতে পারেন না, তাঁহারা একবার গার্গী, মৈত্রেয়ী, ম্যাডাম ডা স্টেল, হ্যারিয়েট মার্টিনো প্রভৃতি খ্যাতনামা প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য মহিলাগণের জীবনী আলোচনা করুন।

অদ্য আমরা যাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত আভাস দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি সেই পরম-বিদুষী পাশ্চাত্য মহিলা হ্যারিয়েট মার্টিনো কী অসীম প্রতিভাসম্পন্না ছিলেন। বিজ্ঞান, রাজনীতি, তত্ত্বজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় গুরুতর বিষয় অতি সূক্ষ্মভাবে ও বহুদর্শিতার সহিত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

জন্মাবধি ইনি অত্যন্ত রুগ্না ছিলেন। আশৈশব তিনি আঘ্রাণ শক্তি বিহীনা এবং বিশ বছর বয়স হইতে প্রায় একেবারে বধির হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু হ্যারিয়েটের এই বধিরতা তাঁহার কোনো কষ্টের কারণ না হইয়া বরং সুখের বিষয়ই হইয়াছিল। বহির্জগতের কোলাহল হইতে এরূপে চিরকালের জন্য পরিত্রাণ লাভ করিয়া নির্বিঘ্ন চিত্তে কাগজ-কলমের মধ্যে স্বীয় প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার কোনো গ্রন্থের একস্থানে তিনি নিজে লিখিয়া গিয়াছেন যে 'আমার মনে হয় যে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের সমভাবে চালনা হইলে মনের মধ্যে যে সমুদয় ভাব বর্তমান থাকে তাহাতে প্রবলরূপে মস্তিষ্ক চালনা করিলেও আমাদের বিশেষ কোনো কষ্ট হয় না। কিন্তু এই ইন্দ্রিয় সকলের কার্যকারী শক্তি না থাকিলে যদি আমাদিগকে একাগ্রচিত্তে মস্তিষ্কের চালনা করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের মস্তিষ্কের কার্য অতিশয় ভারবহ হইয়া উঠে—মস্তিষ্ক লেশমাত্র বিশ্রাম অনুভব করিতে পারে না। যাঁহাদের পঞ্চেন্দ্রিয় সমভাবে কার্য

করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা যে আমাদের ন্যায় বধিরের জীবনে অধিকতর কষ্ট ও পরিশ্রমের সহিত কার্য করিতে হয় তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন কিনা সন্দেহ।'

হ্যারিয়েট মার্টিনো যে ফরাসি বংশোৎপন্না ছিলেন তাহা তাঁহার নাম হইতেই বুঝা যায়। ইহার পিতৃপুরুষগণ প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টীয় ধর্মাবলম্বী ছিলেন, সেই জন্য কোনো বিশেষ কারণে ফরাসি আইনানুযায়ী ফরাসিদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া তাঁহারা ইংলন্ডের নরিচ প্রদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। ইংলন্ডে এই বংশ সামাজিক এবং ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীনচেতার জন্যই প্রসিদ্ধ। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে হ্যারিয়েট এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা আট ভাই-ভগিনী—তান্মধ্যে ইনি ষষ্ঠ। ইঁহার পিতা একজন অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ইনি যদিও খুব ধনী ছিলেন না তবুও তাঁহার অবস্থার তুলনায় তাঁহার সন্তানদিগকে খুব ভালো করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। তৎকালে আজকালের ন্যায় এরূপ উচ্চশিক্ষা বালিকাদিগকে দেওয়া হইত না, কিন্তু হ্যারিয়েট জেম্‌স মার্টিনো নামক তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতে স্বীয় চেষ্টাগুণে এইরূপ ধরনের উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

আশৈশব হ্যারিয়েট অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন। তিনি ধীর মনে গভীরভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন। চিন্তা করিবার কালে তিনি বাহিরের বিষয় হইতে এত অন্যমনস্ক হইতেন যে সেই সময় চক্ষুর সম্মুখে একটা কোনো বস্তু ধরিলেও তাহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না। তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহার এই ভাবকে মস্তিষ্কের কোনো রোগ বলিতেন। এই অন্যমনস্ক ভাবের বিষয়ে হ্যারিয়েট নিজে যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে তিনি একটা কোনো বিষয় কত গভীরতার সহিত চিন্তা করিতেন।

> ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে নভোমণ্ডলে যখন একটি বৃহৎ ধূমকেতুর উদয় হয় সেই সময় আমার বয়স নয় বৎসর। প্রায় প্রত্যহ রাত্রে আমাদের সমস্ত পরিবারগণ ওই ধূমকেতু নিরীক্ষণ করিবার জন্য আমার পিতার কার্যালয়ের জানালায় গিয়া দাঁড়াইতেন। আমিও তাঁহাদের সহিত গমন করিতাম। তাঁহারা সকলেই উহা দেখিতেন ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন। উহা দেখিবার জন্য আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি হইত না—কিন্তু তবুও আমি উহা দেখিতে পাইতাম না। পিতা-মাতা ভ্রাতাভগিনীগণ সকলেই একবাক্যে বলিতেন 'তুমি দেখতে পাচ্ছ না? ওই যে! এটা যে একটা বড়ো রেকাবির ন্যায়। বল না কেন যে তুমি চাঁদকেও দেখতে পাচ্ছ না।' তাঁহারা এইরূপ বলিলেও আমি ধূমকেতুর কিছুই দেখিতে পাইতাম না, কেবল নিরাশার তীব্র যাতনায় আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইত। আমার এখন

মনে হয় যে তখন আমি ধূমকেতুর আকৃতিটা ভিন্ন প্রকারের কল্পনা করিয়া লইয়া দেখিতে যাইতাম সুতরাং সেই মনগড়া বস্তুকে যতই চক্ষুবিস্তার করিয়া দেখি না কেন দেখিতে পাইতাম না।

বহির্জগতের প্রতি হ্যারিয়েটের এরূপ অন্যমনস্ক ভাবের জন্য তাঁহার সমবয়স্ক বালিকাগণ তাঁহার সহিত বড়ো বেশি মিশিত না ; এই কারণে তিনি নিজেও সকলের নিকট হইতে দূরে থাকিতেন। কিন্তু মনুষ্য কি বিনা কর্মে থাকিতে পারে? কখনই না। ভগবানের রাজ্যে একটি প্রাণীরও চুপ করিয়া থাকিবার আদেশ নাই। সকলেই ভালো হউক মন্দ হউক কোনো-না-কোনো কর্ম করিবেই করিবে। অতএব হ্যারিয়েট মার্টিনো বাহিরের আমোদপ্রমোদ হইতে বঞ্চিত হইলে অন্তর্জগতের আনন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি পুস্তকের কীট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভ্রাতা জেমস্ যে সমুদয় বিষয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেন মিস্ মার্টিনো সেইগুলি তাঁহার নিকট হইতে নিজের আয়ত্তাধীন করিতে চেষ্টা করিতেন। সাহিত্য তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইল। কিন্তু ছোটোবেলায় তিনি সংগীত ও বাদ্য খুব ভালো রকম শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা অগ্রেই বলিয়া গিয়াছি যে বিশ বৎসর বয়ক্রম হইতে তিনি প্রায় সম্পূর্ণরূপ বধির হইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং বেশিদিন সংগীত ও বাদ্যের চর্চা রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে যদি কেহ তাঁহার নিকট সংগীতের বিষয় উল্লেখ করিত কিংবা কেহ দূর হইতে কোনো কথা বলিতেছেন দেখিলে তিনি হঠাৎ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে যাইতেন ও চমকিয়া উঠিতেন—তাঁহার মনে কী একটা যেন ভাবের উদয় করিয়া দিত। পূর্বের ন্যায় যেন তিনি ফ্রক পরিহিত একটি ছোটো বালিকা, টুলে বসিয়া সংগীত বাদ্য অভ্যাস করিতেছেন ও ভাইভগিনীদের কোলাহলধ্বনি শুনিতেছেন এই সমুদয় মনে হইত এবং নিমেষের জন্য তাঁহাকে ওই মধুর পূর্বস্মৃতি সকল অভিভূত করিয়া ফেলিত।

কিছুকাল পরে ইহার পিতার সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়াতে হ্যারিয়েটকে জীবিকা নির্বাহার্থে কর্ম করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। প্রথম দিনকতক তিনি কয়েকজন বালিকাকে বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু বধিরতার জন্য উহা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। এখন হইতে তিনি রীতিমত সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করিলেন। অল্পকালের মধ্যে তাঁহার অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তাঁহার পুস্তকের ভাষা অতিশয় সরল, প্রাঞ্জল ও তেজস্বিতাপূর্ণ। তাহার এক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই সকলেই আগ্রহের সহিত পাঠ করিত। সেই জন্য তিনি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্রী বলিয়া জগতে পরিচিত হইবার পূর্বেই যথেষ্ট অর্থ

উপায় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হ্যারিয়েট আজীবন কুমারী থাকিয়া সাহিত্যকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে, জগতে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে কত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কত অধ্যবসায়ের সহিত দারুণ সাংসারিক বিপদআপদের মধ্যে পড়িয়াও তিনি স্থির থাকিতে পারিয়াছিলেন। তিনি একাধারে শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী ছিলেন। কোনও সামান্য বস্তুও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে এড়াইত না। সমস্ত বিষয়ের সার ভাব গ্রহণ করিতে সতত যত্নবতী থাকিতেন।

হ্যারিয়েট মার্টিনো বাস্তবিকই আত্ম-শিক্ষিতা ছিলেন ; যাহা কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তৎসমুদয়ই আত্মচেষ্টার গুণে। ইহার জন্য যে তিনি আর কাহারও নিকট ঋণী তাহা বলিতে পারি না। ইহার প্রথমকার প্রবন্ধগুলি আদর্শ রচনা না হউক সুস্পষ্ট ও পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত। ইনি কীরূপ অসীম প্রতিভাসম্পন্না ছিলেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা দ্বারা প্রতিভাত হইতেছে। একবার 'ব্রিটিশ এন্ড ফরেন ইউনিটারিয়ান এসোসিয়েশান' নামক কোনো সভা, রোমান কাথলিক, ইহুদি এবং মুসলমানদিগের ধর্ম সম্বন্ধে তিনটি স্বতন্ত্র ভাবের প্রবন্ধের জন্য তিনটি পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হয়। যথা সময়ে প্রবন্ধ তিনটি প্রেরিত হইল ; উহারা এমন তিনজন ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা পরীক্ষিত হইল, যাঁহারা পরস্পরের সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। পরীক্ষা শেষে পুরস্কার বিতরণকালে জানা গেল যে ওই তিনটি বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধের লেখক একই ব্যক্তি ; তিনি আর কেহই নন, আমাদের এই মিস হ্যারিয়েট মার্টিনো।

তিনি যখন আমেরিকা ভ্রমণ করিতে যান, তখন তিনি মার্কিনবাসীদিগের রীতিনীতি, আইন এবং শিক্ষাপ্রণালীর মূল সত্য তন্ন তন্ন করিয়া আয়ত্ত করিতে সবিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মার্কিন দেশ সম্বন্ধে তাঁহার রচনাগুলিতে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের সাধারণ বিবরণ ব্যতীত মার্কিনদিগের আচার, ব্যবহার, সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় সকল অতি বিশদরূপে লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক রচিত কোনো পুস্তক তাঁহার পুস্তকের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাদির তালিকা পাঠ করিলে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির অসীমতায় আশ্চর্য হইতে হয়। সামাজিক সংস্কার শ্রমজীবীদিগের অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনের উচ্চভাব ও দেশকাল অবস্থা ভেদে কর্তব্যাকর্তব্যের যথার্থ জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কী আখ্যায়িকা, সমাজনীতি, কী অর্থনীতি, কী রাজনীতি, কী ধর্ম, কী আইন

কোনো বিষয়ই ইহার লেখনী হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। তিনি দরিদ্র ও শ্রমজীবীদিগের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এ পর্যন্ত অসহায় ও কষ্টসহিষ্ণু শ্রেণির লোকদিগের হইয়া এতটা পরিশ্রম স্বীকার করিতে আর কোনো স্ত্রীলোক সাহস করেন নাই। অত্যধিক মানসিক চর্চাবশত ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া গেল। চার-পাঁচ বৎসর কাল তিনি নিতান্ত অসুস্থ ছিলেন, এমনকী তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। যন্ত্রণা উপশম করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অহিফেন মিশ্রিত ঔষধ সেবন করিতে হইত। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগ-ভোগ কালে তিনি একেলা বসিয়া টিনমাউথে স্বীয় গৃহের গবাক্ষ হইতে সমুদ্রের মহান দৃশ্য, উহার তরঙ্গ-খেলা নিরীক্ষণ করিয়া একমাত্র আনন্দোপভোগ করিতেন। কিন্তু এই পীড়িত অবস্থায়ও তিনি চিন্তাস্রোত হইতে মনকে বাঁধিয়া রাখিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার *লাইফ ইন এ সিক রুম* নামক পুস্তকখানি সেই অসুস্থাবস্থায়, তাঁহার মানসিক ভার যে কীরূপ অবিকৃতভাবে ছিল তাহাই স্পষ্ট দেখাইতেছে। এই সময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার বিশাল কর্মের পুরস্কার স্বরূপ বাৎসরিক দেড় শত পাউন্ড (২২৫০ টাকা) করিয়া বৃত্তি দিবার জন্য দুই-দুইবার প্রস্তাব করেন ; হ্যারিয়েট, যে কার্য তিনি করিয়াছেন, তাহার জন্য পুরস্কার স্বরূপ অর্থ লওয়া নিতান্ত ঘৃণিত জ্ঞানে দুইবারই সে প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া অস্বীকার করেন। ইহা দ্বারা তাঁহার মন কীরূপ উচ্চভাবে পূর্ণ ছিল তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি পুনরায় স্বীয় স্বাস্থ্যলাভ করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ তিন খণ্ডে শেষ করিয়া বাহির করেন। ইহাতে তিনি প্রাচীন এবং আধুনিককালের *'গেম'* আইনের তুলনা করিয়া ইহাদের ফলাফল দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহার পর মিস মার্টিনো প্রাচ্য জগত দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে মিসর, পালেস্তাইন, গ্রিস, সিরিয়া এবং আরব প্রভৃতি দেশসমূহ পরিদর্শন করিয়া *বর্তমান এবং অতীত প্রাচ্য জীবন* নাম দিয়া একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে তিনি তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া *হিস্টরি অব ইংলণ্ড ডিউরিং থার্টি ইয়ারস্ পিস্* এবং *গৃহ শিক্ষা* লিখিয়া প্রভূত যশ লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত তিনি লন্ডনে মাসিকপত্র ও সংবাদপত্র সমূহে বহুতর প্রবন্ধ লিখিতেন।

ইংলন্ডের যে গ্রামে হ্যারিয়েট বাস করিতেন, তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতিশয় মনোহর। তিনি সেই সৌন্দর্য রস পান করিয়া কঠোর বিদ্যাচর্চার মধ্যেও তাঁহার মনকে সদা প্রফুল্ল রাখিতে পারিতেন।

তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি কেবলমাত্র লেখনী পরিচালনেই বদ্ধ ছিল না ; তাঁহার প্রতিভা

নানা বিষয়ে প্রত্যক্ষ কার্য করিয়া গিয়াছে। তাঁহার সেই কুটির, বাগান ও চাষবাস সমুদায় এরূপ সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতেন এবং চাষের এত উন্নতি করিয়াছিলেন যে তাহা নিকটস্থ কৃষকদিগের হিংসার ও আশ্চর্যের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। হ্যারিয়েট প্রায়ই অগ্ন্যাধার উনানের নিকট বসিয়া তাঁহার পাড়া প্রতিবাসী এবং কৃষক বন্ধুগণকে হাস্যকর গল্প বলিয়া ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া আমোদ দিতেন। গ্রামের সকলে তাঁহার অত্যন্ত ভক্ত ছিল। যে কেহ একবার তাঁহার সংশ্রবে আসিত সকলেই তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, পরোপকারিতা, বিনয়, সরলতা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িত। কেই কখনও ইহার নিন্দাবাদ করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার মৃত্যুতে দেশশুদ্ধ সকলেই শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন—ইংলন্ড একটি রত্নচ্যুত হইয়াছিল।

# রাজনীতি ও রমণীপ্রতিভা

বিখ্যাত মহিলা মাদাম দা স্টেলের নাম কে না শুনিয়াছে? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই মহিলা সমগ্র ইউরোপকে আপনার উজ্জ্বল প্রতিভা দ্বারা স্তম্ভিত করিয়াছিল। ইহার ন্যায় অতুলনীয় বিদ্যাবুদ্ধি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই আদর্শ ফরাসি রমণী মাদাম দা স্টেল (কুমারী অ্যান লুই জার্মেন নেকার) ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

নেপোলিয়ন, ওয়াশিংটন, মহারানি ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি খ্যাতনামা পুরুষ ও রমণী দিগের জীবনী পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ইহাদিগের পিতা-মাতারা বিখ্যাত না-হউন কিন্তু অতিশয় উচ্চমনা এবং বহু গুণে বিভূষিত ছিলেন। এই আদর্শ রমণী মাদাম দা স্টেলের পিতা-মাতারাও ঐ শ্রেণির লোক ছিলেন।

ইহার পিতা জেমস নেকার অতিশয় দরিদ্রাবস্থাপন্ন হইয়াও একসময় ফরাসি রাজনৈতিক গগনে অল্পক্ষমতা বিস্তার করেন নাই। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে জেমস নেকার স্বীয় জন্মভূমি জেনিভা পরিত্যাগ করিয়া কোনো ব্যাংকের কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া প্যারিসে আইসেন। কিয়ৎকাল পরে এই কর্ম ছাড়িয়া দিয়া অপর একটি ব্যাংকে কর্ম করিতে আরম্ভ করেন। পরিশেষে ইহারই অংশিদার হইয়া যেকালে ইংরেজদিগের সহিত ফরাসিগণের সাত বৎসর কাল মহা যুদ্ধ হয়, সেই সময় ইনি প্রভূত ধনোপার্জন করেন। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি রাজস্ব সম্বন্ধে কোনোরূপ সুবন্দোবস্তের অভাব হেতু তাঁহাকে ফরাসি গভর্নমেন্ট রাজস্ব সচিবের পদে নিযুক্ত করেন। নেকারের অগ্রে এ পর্যন্ত কোনো প্রোটেস্টানট্ ধর্মমতাবলম্বী ফরাসি এরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। রাজস্ব সচিব হইয়া ইনি নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশের অনেক হিতসাধন করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার জন্য ফরাসি রাজ হইতে তিনি কোনোই

পুরস্কার প্রাপ্ত হন নাই, বরঞ্চ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় আচরণই করা হইয়াছিল।

ফরাসি বিপ্লবের প্রথম সূচনায় জেমস নেকার ফরাসিরাজ ষোড়শ লুইকে প্রজাবিরোধী কতকগুলি কর্ম হইতে নিরস্ত করিতে গিয়া কর্মচ্যুত হইয়া প্যারিস হইতে তাড়িত হইলেন। রাজাদেশানুযায়ী প্যারিস ত্যাগ করিয়া নেকার মাতৃভূমি জেনিভায় চলিয়া গেলেন। সেখানে উচ্চবংশের বহুবিধ পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। ইনি প্যারিস হইতে প্রস্থান করিলে নগর মধ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে এক মহা হাহাকার পড়িয়া যায়। এই কোলাহল থামাইবার জন্য মহারাজ লুই পুনরায় নেকারকে প্যারিসে ডাকাইয়া পূর্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হইলেন। নেকারের প্রত্যাগমনে ফরাসিরা অতিশয় আনন্দিত হইল, কেননা নেকারের প্রতি তাহাদিগের অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। অবশেষে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের প্রথম জাতীয় অধিবেশনে তাঁহাকে পুনরায় কর্মচ্যুত করিয়া প্যারিস হইতে নির্বাসিত করা হইল। তিনি তখন জেনিভার নিকট কপেট নামক প্রদেশে তাঁহার যে নিজের ভূসম্পত্তি ছিল সেইখানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে জীবনের অবশিষ্ট কয়েক দিবস তিনি সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি রাজনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া ছিলেন। ইহা ব্যতীত ফরাসি বিপ্লব সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। এইরূপে স্বদেশের কত মহৎ কার্য সাধন করিয়া কত লোকের অনুরাগ ও বিরাগভাজন হইয়া কত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার দ্বারা জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান।

মাদাম স্টেলের মাতা দাম সুজ্যান নেকার একজন পাদরির দুহিতা। এই সুজ্যান নেকার এক অসাধারণ বিদুষী রমণী ছিলেন। ইঁহারই যত্নে ও সুশিক্ষার গুণে, ইহাদের একমাত্র কন্যা ভবিষ্যতে লোকসমাজে এত প্রসিদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন। মাদাম নেকার যেমন পরমাসুন্দরী ছিলেন তেমনি বিদ্যা, বুদ্ধি, সুমিষ্ট বাক্যালাপ ব্যবহারাদিতেও অন্যান্য রমণীগণের অপেক্ষা এত শ্রেষ্ঠ ছিলেন যে বিখ্যাত রোম ইতিহাসবেত্তা গিবান সাহেবও তাঁহার রূপ ও গুণে মোহিত হইয়া তাঁহার হস্তপ্রার্থী হন। কিন্তু পরে, ইহার দরিদ্রাবস্থা দেখিয়া বিবাহ করেন নাই। সুজ্যান পিতার মৃত্যুর পর, অর্থ কষ্টের জন্য দিন কতক শিক্ষয়িত্রীর কার্য করিয়া নিজের ও মাতার ভরণপোষণ নির্বাহ করেন। এইরূপে তিনি যখন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রকে শিক্ষা দিতেছিলেন সেই সময় নেকারের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সুজ্যানের আন্তরিক

ও বাহ্যিক উভয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইহাদের পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল। নেকার সম্বন্ধীয় বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া কোনো সামান্য বিষয়ও স্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া চলিতেন না, তেমনি মাদাম নেকারও স্বামীর অতিশয় বাধ্য ছিলেন, তাঁহার বিনা অনুমতিতে কোনো কর্ম করিতেন না। তিনি রূপের জন্য যত না ততোধিক গুণের দ্বারা স্বামীর এত অনুরাগভাজন হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

জেমস নেকারের রাজস্ব সচিবের পদ মাদাম নেকারকে দরিদ্র প্রজাদিগের কষ্ট ও দুঃখ লাঘবের পক্ষে খুব সহায়তা করিয়াছিল। পাঁচ বৎসর কাল তিনি নিরন্তর প্রগাঢ় যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত প্যারিসের যাবতীয় কারাগৃহ এবং হাসপাতালের অধিবাসীগণের দুঃখমোচনে এবং উহাদের ব্যবস্থাপ্রণালী সংস্কারে একান্ত ব্রতী ছিলেন। নেকার তাঁহার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে এক স্থানে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে

> একজন রাজস্ব সচিবের পক্ষে সহধর্মিনীকে এইরূপ যাবতীয় কার্যে সহকারিণী স্বরূপে লাভ করা, ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়; ইহা কী সুখের বিষয় যে এরূপ একজন সুশিক্ষিতা মহিলাকে আপনার সমস্ত সুখ দুঃখের ভাগী করিতে পারিয়াছি।

এমন সর্বগুণে বিভূষিতা বিদুষী রমণী যিনি অন্যান্য লোকের উপকারে এত ব্যস্ত, তিনি যে একমাত্র কন্যার শিক্ষার জন্য সতত চেষ্টিত ছিলেন, তাহা বলাবাহুল্য মাত্র।

কুমারী নেকার অর্থাৎ মাদাম দা স্টেল স্বীয় মাতার নিকট শিক্ষালাভ ব্যতীত তাঁহার পিতৃগৃহে সমবেত খ্যাতনামা জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের গবেষণাপূর্ণ বহু প্রকারের তর্কবিতর্ক ও আলোচনা হইতেও জ্ঞান লাভ করিতেন। বয়সে অন্যান্য বালিকারা পুতুল খেলায় প্রবৃত্ত থাকে কুমারী নেকার বয়সে এসব প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে বসিয়া সাহিত্য, রাজনীতি কর্মের কথা কহিতে শিখিয়াছিলেন।

বালিকাবস্থা হইতেই ইনি কূট বিষয় সকল এরূপ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিতে পারিতেন , যে তৎকালে অতি প্রবীণ বহুদর্শী শাস্ত্রবেত্তারা ইহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া অতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তিনি একখানি দুরূহ ফরাসি গ্রন্থের উপর আপনার মন্তব্য লিখিয়া সুন্দরভাবে তাহার সমালোচনা করেন। তাহা দেখিয়া প্রসিদ্ধ দার্শনিক অ্যাবে রেন্যাল, কুমারী নেকারকে তাঁহার তৎকাল রচিত কয়েক খানি দুরূহ গ্রন্থের সমালোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

মাদাম দা স্টেলে একদিকে যেমন পুরুষোচিত গুণ, যথা অধ্যবসায়, বুদ্ধি, তেজস্বিতা, বহুদর্শিতা প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল, অন্যদিকে রমণীর কোমলভাবও তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় ছিল, পিতা-মাতার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। কুমারী নেকার নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে

> আমার পূজনীয় পিতার নিকট হইতে আমি এরূপ চিন্তা করিতে অভ্যাস করা শিক্ষা করিয়াছি যাহাতে সকলে পরিষ্কারভাবে আমার হৃদয়ে পড়িতে পারে।

জেম্‌স্‌ নেকার *কাউন্ট রাঁদু* নামে এক গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিলে কুমারী নেকার তাঁহার পিতাকে, এই গ্রন্থের সুন্দররূপে সমালোচনা করিয়া একটি বেনামি পত্র লিখেন। ওই পত্রের লেখার ধরনে নেকার বুঝিতে পারিয়াছিলেন, উহার লেখিকা কে এবং সেই অবধি তিনি স্বীয় দুহিতার পরমর্শানুযায়ী কার্য করিতেন এবং তাঁহার বিচার-বিবেচনাতে অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

কুড়ি বৎসর বয়স হইতে কুমারী নেকার রীতিমতো সাহিত্যসেবী হইয়াছিলেন। ইহার আগে তিনি তাঁহার পিতার কার্যের সহায়তা করিতেন মাত্র।

তাঁহার প্রথম রচনা *সোফী* বা *গুপ্ত অনুরাগ* নামে একখানি উপন্যাস। তাহার পর বৎসরে লেডি *জেনগ্রের* জীবনী অবলম্বন করিয়া আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এই সময় সুইডেন প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি, মহারানি অ্যানটোয়নেটের অতিশয় প্রিয়পাত্র, ষোড়শ লুইর সভাসদ্‌ ব্যারণ ডাস্টির সহিত কুমারী নেকারের বিবাহ হয়। এই ব্যারণ ডাস্টি এক মহান অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। তিনি সুইডেন প্রদেশের রাজমহিষীর প্রধান কর্মচারীর পদ প্রাপ্ত হন এবং পরে অনেক উচ্চ উপাধি-ভূষিত হইয়াছিলেন।

দুভাগ্যর্বশত ইহাদের মিলন কিন্তু সুখের হয় নাই। মাদাম স্টেলের জীবনের লক্ষ্য তাঁহার স্বামীর জীবনের লক্ষ্য হইতে একেবারে ভিন্ন ও উচ্চদরের থাকাতে তাঁহারা পরস্পরের সংসর্গে সুখী হইতে পারেন নাই। দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মাইবার পর, ইহারা পরস্পর পৃথক হইয়া যান।

ফরাসি বিপ্লবের সহিত প্রথমে ইহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, কিন্তু পরে কর্ম সূত্রে অনেক লোমহর্ষক বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইলে, তিনি ইহার একজন মহাবিপক্ষ হইয়া উঠেন। রাজপরিবারের প্যারিস হইতে গোপনে পলায়নের জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া ও ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সবশেষে পিতার সহিত সুইজারল্যান্ড প্রদেশে চলিয়া যান।

মহারাজ লুইয়ের হত্যার সংবাদ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং মহারানি মেরি অ্যানটোয়নেটকে বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। বিখ্যাত ফরাসি সচিব রোবস্ পিয়েরের রাজত্বকালে নিজের আসন্ন বিপদ তুচ্ছ করিয়া রানির পক্ষ সমর্থন করত এই বিপ্লবকারীদিগের বিরুদ্ধে এক গ্রন্থ রাখিলেন, কিন্তু তাহা তখন কে পড়িবে! সকলেই তখন রাজার শিরশ্ছেদন দর্শনার্থ লালায়িত। প্রজাসাধারণের প্রতি রাজা যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, সেই অন্যায় তাহারা রাজরক্তে ধৌত করিতে চায়। অতএব কে এখন মাদাম দা স্টেলের কথা শুনিবে? সুতরাং তাহাদিগের সেই রাজমুণ্ডের জন্য গগনভেদী উচ্চনাদে মহারানিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল।

প্রাতঃকালে মেরি অ্যানটোয়নেট রাজপ্রাসাদের সম্মুখে 'গিলোটিন' নামক শিরশ্ছেদন যন্ত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই প্রাসাদেই কয়েক মাস গত হইল অতিশয় জাঁকজমকের সহিত ইঁহার বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই আনন্দসূচক ঘটনা আজ কী হৃদয়ভেদী ঘটনায় পরিণত হইল!

মহারানি আস্তে আস্তে গিলোটিনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার মস্তকে একটি কালো টুপি এবং পরিধানে শ্বেত বস্ত্র, তাঁহার চারিধারে অমানুষিক ঘৃণা ও বিদ্বেষভাবপূর্ণ মনুষ্যমূর্তির যেন তরঙ্গ খেলিতেছিল। ধর্ম বলে বলী হইয়া মেরী সেই ভয়ংকর গিলোটিনের সম্মুখীন হইলেন। মুহূর্তের জন্য উর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সন্তানগণ ও মহারাজের নিকট দু-একটি মাত্র কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, আর তৎক্ষণাৎ সেই ভয়ংকর খড়্গ তাঁহর মস্তক ছেদন করিল। হায়! এইরূপ নৃশংসভাবে একজন নির্দোষী নিঃসহায় রমণিকে নিহত হইতে দেখিয়া সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ পশুতুল্য মনুষ্যগুলির মধ্যে কাহারও চক্ষে একবিন্দুও অশ্রু দেখা দেয় নাই! ক্রমে কত ভালো ভালো লোক এই নরপিশাচগুলির হস্তে নিহত হইল। প্যারিস শহরে নররক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। যে কেহ এই ক্ষিপ্তপ্রায় মানবপাষণ্ডদিগের সহিত সমস্বরে 'জয় সাধারণতন্ত্রের জয়' না বলিবে তাহারও জন্য এই গিলোটিন প্রস্তুত আছে। এই সকল ভয়ানক দৃশ্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য মাদাম দা স্টেল প্যারিস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বোধ হয় আর দিনকতক এই স্থলে থাকিলে এই পশুদিগের হস্তে ইঁহাকেও প্রাণ হারাইতে হইত।

প্যারিস হইতে পলায়ন কালে তিনি রাস্তায় বিদ্রোহীদের দ্বারা ধৃত হইয়া হোটেল দা ভিলয়ে নীত হন। পরিশেষে অনেক কষ্টে অন্যান্য বন্ধুদিগের সাহায্যে

এই স্থান হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া কপেট নগরে তাঁহার পিতার নিকট আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কপেট হইতে তিনি ইংলন্ডে গমন করেন। এই স্থানে তিনি 'শারি চিন্তা' নামক একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া প্রভূত যশোলাভ করিয়াছিলেন।

মন্ত্রীসভার (কনভেনশনের) অধিবেশনে মাদাম দা স্টেল প্যারিসে পুনরাগমন করিয়া ফরাসি বিপ্লবের দ্বারা দেশে যে সকল কুফল ফলিয়াছিল, তাহা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ইঁহার জন্য তাঁহাকে মন্ত্রীসমাজে তিরস্কৃত হইতে হইয়াছিল।

শৈশবকাল অবধি রাজনৈতিক বিষয় আলোচনাদির দ্বারা ইনি এরূপ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল এমন গভীর ও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে পারিতেন যে তৎকালীন ফরাসি বিপ্লবের বিপক্ষ স্বপক্ষ উভয় দলের শত শত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার বৈঠকে তাঁহার সহিত আলাপ করিবার অভিপ্রায়ে সমবেত হইতেন।

প্রসিদ্ধ রাজনীতিকুশল টালেরান্ড যখন স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া অপমানিত হৃদয়ে আমেরিকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, কে তাঁহাকে প্রধান উদ্যোগী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করাইল? এই রাজনীতিকুশলা রমণী মাদাম স্টেলেরই অসীম যত্নে ও পরিশ্রমে টালেরান্ড পুনরায় স্বদেশের মুখ দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন।

এইরূপ স্বদেশ লইয়া মাদাম অত্যন্ত ব্যস্ত, সেই সময় তাঁহার মাতার আসন্ন কালের সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি মাতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং মাতাকে মৃত্যু শয্যায় শায়িত দেখিয়া তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। যাহার যত্নে, যাহার শিক্ষার গুণে তিনি আজ স্বদেশের জন্য এত কার্য করিতে পারিতেছেন সেই স্নেহময়ী গুণবতী মাতা তাঁহাকে ছাড়িয়া কী জানি কোন্ অজ্ঞাতলোকে চলিয়া যাইতেছেন। আর কে তাঁহাকে সুপরামর্শ দিবে! এইরূপ আরও প্রশ্ন তাঁহার মনে উদয় হইল! যে যতই দুঃখ করুক না কেন প্রকৃতি আপনার কার্য ঠিক করিয়া যাইবে, অতএব মাদাম দা স্টেলও ইহার নিষ্ঠুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। তাঁহার মাতার মৃত্যু হইল, ইহাতে তিনি অত্যন্ত শোক পাইয়াছিলেন। এই সময় তিনি আপনার চিত্ত স্থির করিবার জন্য এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা গুজবের নিরাকরণ করিবার অভিপ্রায়ে একখানি অতি সুন্দর সরল ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। মাতার মৃত্যুর কিয়ৎদিন পরেই তাহার স্বামীরও কাল হইল। যদিও এতাবৎকাল তাহারা পরস্পর ভিন্ন ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি পত্নীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া এ দেহ ত্যাগ করেন।

তাঁহার পিতৃভক্তি অতিশয় প্রগাঢ় ছিল। কপেটে বাসকালে তাঁহার মনে আমোদ দিবার জন্য প্রত্যহ মধ্যাহ্নভোজনের পর পিতার সহিত রাজনীতি, সাহিত্য ও স্বদেশ সম্বন্ধে বহু প্রকারের আলোচনা, তর্কবিতর্ক সেই সঙ্গে পিতার বাক্যকেই উচ্চ স্থান দিতেন।

একস্থানে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও শক্তিবলে ক্ষমতা সঞ্চয় করিতেছিলেন এবং সেই হেতু তাঁহার শত্রুবর্গের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছিল। মাদাম দা স্টেলের বাটীই তাঁহার বিরোধী দলের একটি প্রধান আড্ডা হইয়া উঠিয়াছিল।

এই গুণবতী রমণীকে স্বীয় পক্ষে আনিবার জন্য বোনাপার্ট বহু যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমনকী গভর্নমেন্টের নিকট তাঁহার পিতার যে দুই লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্য ছিল তাহা শোধ করিয়া দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন তথাপি তাঁহাকে স্বদলে টানিতে পারেন না। ক্রমে ইহাদের মধ্যে শত্রুতা দৃঢ়তর হইতে লাগিল। অবশেষে নেপোলিয়ন ইঁহাকে ছলে বলে কৌশলে কিছুতেই বশে আনিতে না-পারিয়া ফরাসি রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। প্রিয় মাতৃভূমি ফ্রান্স হইতে নির্বাসিত হইয়া তিনি জার্মানিতে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি বড়ো বড়ো জার্মান পণ্ডিতগণের সহিত পরিচিত হইলেন। প্রুসিয়ার রাজকুমারের নেতৃত্বে জার্মানির যাবতীয় সম্ভ্রান্ত পুরুষগণ উঁহাকে অতিশয় সমাদর করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হওয়াতে, তিনি পুনরায় কপেটে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নেকারের বাছা বাছা কতকগুলি রচনাসমেত তাঁহার জীবনী প্রকাশ করিলেন। ইহার পর দুই বৎসরকাল ধরিয়া তিনি জার্মানি ও ইটালি ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। ইটালি ভ্রমণ কালে *করিণ* নামে গ্রন্থ লিখিয়া তিনি জগৎবিখ্যাত হইয়াছিলেন।

জেনিভাতে বাসকালীন তিনি মন্‌সর ডারক্কা নামে একজন সৈনিক কর্মচারীর সহিত পরিচিত হন। এই যুবক কর্মচারীর সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। মনসর ডারক্কাও মাদামের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আত্মবিক্রয় করেন। ক্রমে কথাবার্তায় ইহাদের অনুরাগ বর্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে ইহাদের বিবাহ হইয়া গেল।

এই প্রথম মাদাম দা স্টেল পতির সহিত সুখদুখের কথা, প্রাণের কথা ও মনের কথা কহিয়া যে কী পর্যাপ্ত সুখী হইয়াছিলেন তাহা অবর্ণনীয় কিন্তু এই যথার্থ দাম্পত্য সুখের মধ্যেও একটি বিষয়ে তিনি হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন। নেপোলিয়ন তাঁহার বিবাহ সংবাদ পাইয়া এই প্রেমিক ফরাসি দম্পতিকে ফরাসি

সাম্রাজ্যে থাকিতে নিষেধ করিলেন। অতএব তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অস্ট্রিয়ায় গেলেন, কিন্তু তথায় রীতি নীতি তাঁহার মনমতো না হওয়াতে তিনি রুসিয়ায় গমন করিলেন। বিপদ যে এখানেও তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়াছে তাহা তিনি জানিতেন না। এখানে তাঁহার প্রিয় পুত্র এলবার্ট এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নিহত হইল। এই ঘটনায় আর তিনি কিছুতেই রুসিয়ায় থাকিতে পারিলেন না। তখন তিনি শাসিতদের আশ্রয়স্থান স্বাধীনতার ক্ষেত্র ইংলন্ডে যাত্রা করিলেন। ইংলন্ডেও বেশিদিন তাঁহাকে থাকিতে হয় নাই। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়ান রাজত্ব অস্তমিত হইলে মাদাম দা স্টেল আশ্বস্ত হইলেন যে তাঁহার চিরশত্রু নিহত হইল। এইবার তিনি নির্বিঘ্নে জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন তার প্রিয় জন্মভূমি প্যারিসে কাটাইতে পারিবেন।

প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বেশি দিন বাঁচেন নাই এবং তাহার পর বাঁচিবার আশাও আর ছিল না। তাঁহার দ্বিতীয় পতির স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় পতির জীবনের জন্য তিনি সর্বদাই শঙ্কিত মনে থাকিতেন। প্রিয় পুত্রকে হারাইয়া তিনি ভীত হইতেন বুঝি এই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ের মৃত্যুও তাঁহার দেখিতে হইবে কিন্তু ঈশ্বরের প্রসাদে ইঁহাকে সেই দুঃখ ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার স্বামীর আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। ৫২ বৎসর বয়সে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জন্য প্যারিসশুদ্ধ সকল লোকে শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছিল, তাঁহার পতি তাঁহার শোকে ছয়মাসকাল মাত্র জীবিত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

বিদুষী রমণী কী অসাধারণ পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শীলা। ইহার গ্রন্থাবলি অষ্টাদশ খণ্ডে বিভক্ত। ইহার চরিত্র আলোচনা দ্বারা যদি আমাদের রমণীগণের মধ্যে একজন ভালো কার্যে উৎসাহান্বিত হয়েন তাহা হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

# সুইডিশ কিন্নরী বা গায়িকা লিণ্ড

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে সংগীতের চর্চা হইয়া আসিতেছে। তানসেন প্রভৃতি গায়কগণের বিষয় পড়িয়া জানা যায় যে পূর্বে সংগীতের জন্য অনেকে রীতিমতো কঠোর সাধনা করিতেন। এখন এখানে কয়টা লোক গীতবাদ্যের নিমিত্ত সেরূপ কষ্ট স্বীকার করেন? কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদিগের সেই সাধনা অন্য ভাবে ইউরোপীয় গায়ক-গায়িকাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সংগীতবিজ্ঞান ভারতবর্ষ হইতেই অন্যান্য দেশে প্রচারিত হইয়াছিল ; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইউরোপ অপরিসীম অধ্যবসায়ের গুণে গীত বাদ্যাদিতে আজিকাল বড়ো কম উচ্চ আসন লাভ করে নাই। জেনি লিন্ড, সারা বার্নাড, অ্যাডেলিনা পার্টি প্রভৃতি পাশ্চাত্য গায়িকাগণ সত্য সত্যই অত্যন্ত কঠোর সাধনা করিয়া সংগীতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে যে খ্যাতনামা মহিলার বিষয় আমরা বলিব তিনি সংগীতের দ্বারা সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকায় অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

এই মহিলা নাট্যালয়ে গাহিতেন শুনিয়া পাঠকগণ সহসা ইহা না ভাবিয়া বসেন যে থিয়েটারের স্ত্রীলোক বিষয়ে লেখা হইতেছে। আমাদের দেশে ভদ্রমহিলাদিগের মধ্যে গানগাওয়া রীতি একেবারে নাই। বাড়ির মধ্যে কোনো স্ত্রীলোক একটু গলার সুর বাহির করিলে আর রক্ষা নাই, অমনি তাহাকে বাড়ির লোকে, পাড়ার লোকে লজ্জাহীন প্রভৃতি বাক্যে কত না বিদ্রূপ উপহাস করিবে। অবশ্য ইহার জন্য যে কাহাকেও দোষ দিতে পারা যায় তাহা নয়, কেননা এইরূপ সামাজিক রীতি আমাদের মধ্যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এখন সময়ের পরিবর্তনের সহিত সামাজিক সংস্কারও হওয়া উচিত ও হইয়াও আসিতেছে। কলিকাতার মধ্যে অনেক শিক্ষিত পরিবারে আধুনিক রীতিনীতি অনুযায়ী পুত্রকন্যাদিগকে সমানভাবে

গীত বাদ্য শিক্ষা দেওয়া হয়। মহিলাগণ সংগীত শিক্ষা করিলে বাড়িতে অভ্যাগত ব্যক্তি আসিলে তাঁহারা গীত বাদ্য দ্বারা অনায়াসে সকলের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের পরিতুষ্টি সাধন করিতে পারেন, অন্তত সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর দিনান্তে পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী সম্মিলিত হইয়া সংগীতের মোহন শক্তি দ্বারা কিছুক্ষণের জন্য পবিত্র সুখানুভব করিতে পারেন।, আমরা যদি আমাদের পুত্রকন্যাদিগকে সংগীত বিদ্যা শিক্ষা দিই তাহা হইলে আমাদের সামাজিক রীতিনীতিরও যে বিশেষ উন্নতি হইবে তাঁহার আর সন্দেহ নাই। বর্তমানকালে আমাদের শিক্ষিত সমাজ গীতবাদ্য সম্বন্ধে মহিলাদিগকে অনেকটা স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের মহিলাগণ বরাবরই সে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

ইউরোপে সংগীতবিদ্যা অতিশয় আদরের বিষয়। কোনো প্রসিদ্ধ গায়ক বা গায়িকা দেশে আসিয়াছেন, আজ অমুক অপেরা হাউসে বা ন্যাট্যালয়ে গাহিবেন শুনিলে সেই নাট্যালয় অত্যল্পকাল মধ্যেই লোকের জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া যায় ও অনেককেই নিরাশ হৃদয়ে স্থানাভাব বশত ফিরিয়া যাইতে হয়। এই সব গায়ক গায়িকাগণের গীত শ্রবণের জন্য লোকেরা এত লালায়িত যে নাট্যালয়ের টিকিট সমূহ নিলামে পর্যন্ত বিক্রয় হয়।

আমাদের দেশের ন্যায় ইউরোপেও রঙ্গালয়ের গায়িকাদিগের নিন্দা আছে বটে, কিন্তু তাহা এরূপ খ্যাতনামা গায়িকাদিগের পক্ষে নহে। জেনি লিন্ডের ন্যায় গায়িকাগণকে পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা অতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখেন। ইহারা নাট্যালয় ও গীতবাদ্যের সংগত বা কন্সার্টে গাহিয়া জগতে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন বলিয়া কেহ ইঁহাদের হীন চক্ষে দেখেন না। সম্রাট, রাজ্ঞী, রাজ পরিবারের মহিলাগণ পর্যন্ত অন্য কোনো ভদ্রমহিলার সহিত যেমন মিশিবেন ইঁহাদের সহিতও সেইরূপ অকুণ্ঠিত চিত্তে মিশিবেন। ইউরোপ বা আমেরিকার, কোনো বালিকা সংগীতে অসামান্য শক্তিসম্পন্না হইয়া উঠিলে প্রকাশ্যভাবে জনসাধারণের নিকট গান গাওয়া তাঁহাদের পক্ষে একটা লজ্জাজনক ব্যাপার বলিয়া গণনীয় নয়। এইরূপ স্থলে রঙ্গালয়ে গাহিয়া জগতের নিকট পরিচিত হইলে লোকে তাহা দূষণীয় কার্য বলিয়া মনে করে না।

আমরা যাঁহার কথা, বলিতেছি এই অসাধারণ গায়িকা যে কেবল সংগীতবিদ্যাতেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নহে তাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা, দানশীলতা এবং বিদেশি ও স্বদেশিয়ের প্রতি সমভাব তাঁহার চরিত্রের একটি প্রধান

অঙ্গ ছিল। তিনি আমেরিকা, জার্মানি ও ইংলন্ডে যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন, সর্বাপেক্ষা বোধ হয় এই কারণেই ইংলন্ডের গৃহে গৃহে এখনও অতি সম্মানের সহিত তাঁহার নাম ধ্বনিত হয়। এই সদাশয়া মহিলা একজন সুইডিশ রমণী। ইনি ১৭২১ খ্রিস্টাব্দে সুইডনের রাজধানী স্টক্‌হলম নগরে ২১ অক্টোবরে শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা স্টক্‌হলম নগরে এক জন বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। শিশুকাল হইতেই জেনি অত্যন্ত সংগীতানুরাগী ছিলেন। চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি যে-কোনো সংগীত একবার শুনিতেন তাহা তৎক্ষণাৎ নির্ভুল গাহিয়া দিতে পারিতেন। অনেক সংগীতবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ জেনি লিন্ডের শৈশবকালের এরূপ সংগীত প্রতিভা দ্বারা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাদাম লাণ্ডবার্গ নামক স্টক্‌হলমের একজন বিখ্যাত গায়িকা নবম বৎসরের বালিকা জেনিকে একদিবস গাহিতে শুনিয়া এবং তাহার গানের কৃত্রিমতাশূন্য সুন্দর সহজভাবে অত্যন্ত প্রীত হইয়া জেনির পিতা-মাতাকে বার বার অনুরোধ করেন যাহাতে উহাকে খুব ভালো করিয়া সংগীতবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই পরামর্শে জেনির অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া ইহার পিতা-মাতাও স্বীকৃত হন। তৎপরেই জেনি মাদাম লান্ডবার্গের সাহায্যে সংগীতবিদ্যায় সুপণ্ডিত খ্যাতনামা ক্রিয়োলিনের নিকট পরিচিত হন। ক্রিয়োলিন এই বালিকার সংগীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন ; বুঝিলেন ইহা ঐশ্বরিক দান, ইহা খাঁটি সোনা, এখনও ইহাতে খনির মাটি কাদা প্রভৃতি কিছু ময়লা আছে বটে, কিন্তু জিনিসটা একেবারে খাঁটি, ইহাতে কোনো কৃত্রিমতা নাই। এখন কেবল ইহা একজন ভালো স্বর্ণকারের হস্তে পড়িলে ইহাতে এখনও যাহা কিছু ময়লা আছে তাহা সম্পূর্ণভাবে সংশোধিত হইয়া যাইবে এবং তখন ইহা নিজ প্রভায় জগৎ আলোকিত করিবে। এখন হইতে তিনি এই বালিকাকে ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ যত্নের সহিত প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জেনি সংগীতে এত উন্নতি লাভ করিলেন যে তাঁহাকে নাট্যালয়ে জনসাধারণ সমক্ষে গাহিতে দেওয়া হইল। এরূপ অবস্থায় অনেক বালিকারা অহংকারে স্ফীত হইয়া উঠে। এই তমোগুণবশত বিদ্যায় পারদর্শী হইলেও তাহারা সেই বিদ্যার মাধুর্যটুকু নষ্ট করিয়া ফেলে, কিন্তু বালিকা জেনি সেরূপ প্রকৃতিরই ছিল না। ভবিষ্যতেও যখন তিনি প্যারিসে শিক্ষা লাভ করিয়া স্বীয় মধুর ঝংকারে জগৎ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন তখনও তিনি কদাপি 'আমি একজন মস্ত গাইয়ে' বলিয়া গর্ব প্রকাশ করেন নাই। কোনো বিখ্যাত সমসাময়িক লোক জেনি লিন্ডের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন 'জেনি লিন্ড সদা সুখী, ইহজগতের লোক তিনি নন। ইহার উচ্চ ও মহান হৃদয় স্তুতিতে বশীভূত হয় না। সহস্র প্রশংসাবাদে

ইনি অটল এবং গম্ভীর থাকেন, আমার জ্ঞাতসারে একটিবার মাত্র তাঁহাকে , তাঁহার ওই স্বর্গীয় বিদ্যার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলাম। কোপনহেগন নগরে শেষবার থাকিবার সময় তিনি প্রত্যহ কোনো গীতবাদ্যের সঙ্গতে কিংবা নাট্যালয়ে গাহিতেন। সেই সময় একটি সভার সহিত তাঁহার পরিচয় হয় ; এই সভার একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল নষ্ট পিতা-মাতাদিগের হস্ত হইতে হতভাগ্য বালক-বালিকাদিগকে উদ্ধার করা ও তাহাদিগকে ভালো করিয়া শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যতে ভালো অবস্থায় আনয়ন করা। জেনি এই সভার মহৎ কার্যের জন্য একটি বৃহৎ সংগীত সভা আহ্বান করেন ইহাতে তাঁহার গীত শুনিবার জন্য অসম্ভব রকমের জনতা হয়। এত বৃহৎ লোকের সমাবেশ দেখিয়া জেনি লিন্ডের মুখ সহসা প্রফুল্ল আকার ধারণ করিল, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি বলিলেন, 'কী চমৎকার, আমি এত ভালো গাহিতে পারি !' তাঁহার স্বাভাবিক সরল সলজ্জ নম্রভাবের কারণে স্টক্‌হলম নগরের সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলাগণ জেনির সহিত আলাপ করিয়া অতিশয় প্রীত হইতেন। বার তেরো বৎসর বয়সে জেনির একটি অতিশয় দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। তাঁহার স্বরের সর্বোচ্চ সুরটি গাহিতে অপারগ হইলেন। তাঁহার গান গাহিবার কালে সুরগুলি রেখাব হইতে গান্ধার, গান্ধার হইতে পঞ্চম, পঞ্চম হইতে ধৈবত, ধৈবত হইতে নিখাদ, এইরূপ ধাপের পর ধাপে উঠিত পড়িত; বায়ুর স্রোতে সুরলহরী ক্রীড়া করিতে করিতে গগনে যেন মিলাইয়া যাইত ; তাহা একবার যিনি শুনিতেন তিনি আর উহা ভুলিতে পারিতেন না, তাঁহার কর্ণে সর্বদাই যেন উহা লাগিয়া থাকিত। সেই অতি উচ্চ সুরে এখন হইতে আর তিনি গাহিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহার বন্ধুগণ এবং জেনি নিজেও ঐ উচ্চ সুরগুলি হইতে বঞ্চিত হওয়াতে অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। অনেক বৎসর এইভাবে কাটিল, জেনি উহা পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত অনেক সাধনা করিতে লাগিলেন ; এইরূপ কত কাল কাটিয়া গেল কিন্তু তাঁহার আশার কোনো সুফল হইল না। অবশেষে ভগবান বুঝি তাঁহার সাধনায় তুষ্ট হইলেন।

একবার স্টক্‌হলম নগরে একটি বৃহৎ কন্সার্টের আয়োজন হইল। যে নাটকটি অভিনীত হইবার জন্য নির্বাচিত হইল তাহার একটি নায়িকা, অ্যালিস—এই নায়িকার অভিনয় করিবার নিমিত্ত অনেক বড়ো বড়ো গায়িকাদিগকে বলা হইল, কিন্তু কেহই উহা একটি অকিঞ্চিৎকর বিষয় বলিয়া স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে কর্তৃপক্ষগণ জেনি লিন্ডকে এ অংশটি লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জগতে সামান্য বিষয়ও তুচ্ছ করিবার নহে এই ঘটনায় তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া

যাইতেছে। ভগবানের রাজ্যে এক একটি সামান্য সামান্য বিষয়ে তাঁহার যে মঙ্গলময় ভাব ফুটিয়া উঠে তাহা দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া যাই। যে উচ্চসুরগুলি পুনঃলাভের জন্য এতকাল ধরিয়া জেনি লিন্ড চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন তাহা সেইরাত্রে তুচ্ছ অ্যালিশের অভিনয় কালে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। এই সুর হারাইয়া তিনি নিজে এবং তাঁহার বন্ধুগণ অত্যন্ত নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন ; কেননা তাঁহার কণ্ঠ হইতে এ সুরগুলি অন্তর্হিত হওয়াতে, তাঁহার প্রথম শ্রেণির গায়িকা ভুক্ত হইবার পক্ষে একান্ত বাধা পড়িয়াছিল। এক্ষণে সেগুলি পুনঃপ্রাপ্তির পর সকলে মহসন্তুষ্ট হইলেন। তখন জেনি লিন্ড বহুদিনের বাঞ্ছিত কোনো একটি বিখ্যাত নাটকের অভিনয়ে প্রধান নায়িকার পদে নিযুক্ত হইলেন। এই অভিনয় কার্যে তিনি প্রভূত যশোলাভ করিলেন। এইরূপে বৎসরাধিক কাল স্টক্‌হলমে অতিশয় দক্ষতার সহিত বড়ো বড়ো অভিনয়ে তাঁহার অংশগুলি গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। গৃহে গৃহে তাঁহার নাম লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। কিন্তু জেনি সংগীতবিদ্যায় সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত লালায়িত হইলেন। তিনি এসব প্রশংসা-বাক্যে একটু মাত্র মনোযোগ দিতেন না। সুতরাং ক্রোইলিন প্রভৃতি কতকগুলি বন্ধুর পরামর্শানুসারে তিনি প্যারিসে গমন করিলেন। প্যারিসে আসিয়া গার্সিয়া নামক ইউরোপের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদের নিকট সংগীত শিখিবার জন্য দেখা করিতে আসিলেন। গার্সিয়া তাঁহাকে গাহিতে বলিলেন এবং তাঁহার গান শুনিয়া বলিলেন...'বৎস, তোমার কিছুই সুর নাই, কিংবা আমি এই বলিতে পারি যে এককালে তোমার ছিল, কিন্তু এখন ইহা হারাইতে বসিয়াছ। তোমার গাহিবার যন্ত্রটির এখন বৃদ্ধ কাল উপস্থিত। অতিরিক্ত পরিশ্রমে উহা অক্ষম এবং শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আমার পরামর্শ যদি চাও তো আমি বলি যে তুমি একাদিক্রমে তিন মাস একটি মাত্র সুরও গাহিবে না। এই কাল গত হলে আমার নিকট তুমি পুনরায় আসিবে, তখন আমি তোমার গতায়ু প্রায় সুরের পুনর্জীবনের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করিব। নিরাশ হৃদয়ে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গার্সিয়ার পরামর্শানুযায়ী তিনি তিন মাসের মধ্যে একটি বারের জন্য একটি সুর গলা দিয়া বাহির করিলেন না। নৈরাশ্যে দুঃখে দেখিতে দেখিতে এই দীর্ঘ তিন মাস কাটিয়া গেল। পুনর্বার তিনি ওস্তাদ গার্সিয়ার সহিত দেখা করিলেন। গার্সিয়া তাঁহাকে গাহিতে বলিলেন এবং গান শুনিয়া আহ্লাদ প্রকাশ পূর্বক বলিলেন 'এখন তোমার গলা সংগীত চর্চার যোগ্য হইয়াছে বটে।' প্রায় এক বৎসর কাল গার্সিয়ার নিকট তিনি সংগীত শিক্ষা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ (Composer) মিয়ারবিয়ারের নিকট পরিচিত হন। ইতিপূর্বেই মিয়ারবিয়ার জেনি লিণ্ডকে কোনো গীতিনাট্য অভিনয় স্থলে

গাহিতে শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে পুনর্বার তাঁহার গলা পরিক্ষা করিয়া একান্ত প্রীত হইলেন এবং বার্লিন নগরে লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু জেনি যশের জন্য স্বদেশ প্রেম ভুলিলেন না। তিনি বার্লিন যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। যেসব বন্ধুদিগের পরামর্শে তিনি প্যারিস আসিয়া সংগীতে উৎকর্ষ লাভ করিলেন আজ কি তাহাদিগকে ভুলিতে পারেন! কখনই নয়। তিনি স্বদেশে প্রত্যবর্তন করিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী প্যারিসে নির্জন প্রবাসের পর তিনি দেশে আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিন্তু স্টক্‌হলমে তিনি বেশি দিন থাকিতে পারিলেন না ; বার্লিন নাট্যালয় খোলা হইলে মিয়ারবিয়ারের নিকট হইতে বার্লিনে যাইবার জন্য পুনরায় আমন্ত্রিত হইলেন। এত বড়ো এক জন সংগীত রচয়িতা যিনি একটি কথা কহিলে কত লোক আপনাকে ধন্য মনে করে, তাঁহার নিকট হইতে বার বার নিমন্ত্রিত হইতেছেন। আবার এই খ্যাতনামা পুরুষের বিখ্যাত নাটক 'রবার্ট লা দি অবর' হইতে অ্যালিসের অংশ গাহিবার কালেই তাঁহার বহু দিনের হৃত উচ্চ সুরগুলি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং এবার আর জেনি লিন্ড মিয়ারবিয়ারের কথা ঠেলিতে পারিলেন না। শঙ্কিত হৃদয়ে বার্লিনে উপস্থিত হইলেন। কারণ বার্লিন জগতের মধ্যে যত বড়ো বড়ো কূট সমালোচকদিগের অধিষ্ঠানভূমি। ইহাদিগের নিকট কীরূপভাবে তিনি অভ্যর্থনা পাইবেন সেই চিন্তায় ভীত হইলেন। যাহা হউক দুই-তিনটা গীতিনাট্যের অভিনয়স্থলে জেনি আবির্ভূত হইবার পর চারিদিক হইতে তাঁহার ডাক পড়িতে লাগিল। প্রুসিয়ারাজই ইংলন্ডের মহারানি ভিক্টোরিয়াকে রাইনে অভ্যর্থনা করিবার কালে কতকগুলি মহাভোজের আয়োজন করেন। তৎকালে জেনি লিন্ড গীতবাদ্য বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। বার্লিনে তিনি যে সকল বিষয় অভিনয় করেন তাহাতে লোক বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার নামে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনে গমন করেন। ইংলন্ডে এই তাঁহার প্রথম পদার্পণ। লন্ডনে আসিয়া তাঁহার প্রিয় অ্যালিশের অংশ অভিনয় করিলেন। পরদিন লন্ডন শহরে কেবল একমাত্র ওই অপূর্ব গায়িকার বিষয়ই আলোচনা হইতে লাগিল ; ছোট বড়ো সকলের মুখে ওই এককথা। টিকিটের অগ্নিমূল্য হইয়া গেল ; নাট্যালয় স্বত্বাধিকারীরা এক এক রাত্রে লক্ষপতি হইতে লাগিল। মিয়ারবিয়ার মোজার্ট, রসিনি, ভার্ডি, মেডলসন্ প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত পাশ্চাত্য গীতবাদ্য-রচয়িতা দিগের নাটকসমূহ অভিনয় দ্বারা সমস্ত জগৎ মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। লন্ডন হইতে তিনি স্বদেশ যাত্রা করিলেন। স্বদেশে বহুদিনের পর প্রত্যাগমন করিলে অত্যন্ত সমাদর লাভ করিলেন। নাট্যালয়ের

টিকিটসমূহ নীলামে বিক্রয় হইতে লাগিল। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় লন্ডনে আসিলেন। লন্ডনের নাট্যালয়সমূহ এত লোকারণ্য হইতে লাগিল যে এক এক রাত্রে ত্রিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকা উঠিতে লাগিল। রাজপরিবারগণ তাঁহার নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন।

যদিও জেনি লিন্ড অভিনয়ে এবং সংগীতে উভয় গুণে সর্বোচ্চ আসন পাইয়াছিলেন কিন্তু তথাপি তাঁহার সাতাশ আঠাশ বৎসর বয়স হইতে অভিনয় কার্যে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল। এক্ষণ হইতে তিনি আর রঙ্গালয়ে গীত গাহিতেন না। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ বড়ো বড়ো কন্সার্টে গাহিতেন। লন্ডনে তিনি যাহা উপায় করিলেন তাহার অধিকাংশ টাকা প্রায় ৯০০০০০ (নয় লক্ষ টাকা) ইংলন্ডে দান করেন। ইহার পূর্বে জার্মানিতে ত্রিশ হাজার ফ্লোরিন্স্ দান করেন।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে নিউ ইয়র্কের মিস্টার পি.টি. বার্ণ্যমের সহিত মিস লিন্ডের মার্কিন প্রদেশে কন্সার্টে গাহিবার বন্দোবস্ত হয়। মার্কিন ভ্রমণে জেনিকে সর্বশুদ্ধ দেড়শত কন্সার্টে গাহিতে হইবে ঠিক হইয়াছিল এবং প্রত্যেক কন্সার্টে ৩০০০ হিসাবে তিনি দেড় শত কন্সার্টে ৪৫০০০০ (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) পাইয়াছিলেন। প্রত্যেক কন্সার্টে তাঁহার যশ যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমেরিকায় প্রথম দিন যেদিন তিনি গাহিলেন সেদিন প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার লোকের সমাগম হয় এবং ৩০০০০ ডলার নামক মার্কিন মুদ্রা বার্ণেস প্রাপ্ত হয়। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ওইখানে অটো গোল স্মিড্ নামক সুপ্রসিদ্ধ জার্মান পিয়ানো বাদ্যকারের সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হয়। সোনায় সোহাগা হইল। পর বৎসরে দম্পতিদ্বয় ইউরোপ চলিয়া আসেন। জেনি লিন্ড ওরফে মাদাম গোল স্মিড্ অত্যন্ত স্বদেশানুরাগী ছিলেন। চারিদিক হইতে প্রচুর খ্যাতিসম্মান পাইলেও স্বদেশের প্রতি কর্তব্য ভোলেন নাই। মার্কিন হইতে স্বামীর সহিত স্টক্হলমে আসিয়া তিনি কতকগুলি স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য ৬০০০০০ (ছয় লক্ষ টাকা) প্রদান করেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে তিন লক্ষ দু-হাজার ডলার্স পাইয়াছিলেন, ইহার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার ডলার্স আমেরিকার নানাস্থানে খয়রাতি কার্যে ব্যয় করেন। দানে জেনি লিন্ডের সমান প্রায় আর দেখা যায় না। ইহার স্বভাবও অত্যন্ত দয়ালু ছিল। এই রমণী বদান্যতা, দয়া পরোপকারিতা এবং সংগীতবিদ্যার দ্বারা যে জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা যুগযুগান্তেও ম্লান হইবার নহে।

# টম কাকার কুটীর
## প্রণেত্রী শ্রীমতী হ্যারিয়েট বিচার স্টো

যাঁহার যত্নে, যাঁহার প্রয়াসে, যাঁহার লেখনীর প্রভাবে এক্ষণে সমুদায় পাশ্চাত্য জগৎ হইতে পাশবিক দাসত্ব ব্যবসায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে আজ সেই প্রাতঃস্মরণীয়া উন্নত হৃদয়া মিসেস হ্যারিয়েট স্টোর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করিব।

ভালো বীজ হইতে যেমন ভালো বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া সুমধুর ফল প্রদান করে সেইরূপ সুপ্রসিদ্ধ অশেষ গুণসম্পন্ন ডাক্তার লাইম্যান বিচার সদ্‌গুণালঙ্কৃতা পরদুঃখকাতরা হ্যারিয়েট বিচারকে উপহার স্বরূপ জগতকে দান করেন। ডাক্তার বিচার ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার কনেক্‌টিকাট প্রদেশান্তর্গত নিউহেভ্‌ন নামক স্থানে এক লৌহ কর্মকারের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা ডেভিড বিচার কনেক্‌টিকাট প্রদেশের একজন বিখ্যাত কর্মকার ছিলেন। ডাক্তার লাইম্যান বিচারকেও বাল্যকালে তাঁহার পিতার কারখানার হাতুড়ি ঠুকঠাক করিতে হইয়াছিল। স্বোপার্জিত অর্থে তিনি কলেজে প্রবেশ করিয়া বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান ধর্মশাস্ত্রবিদ ডাইটের নিকট আধ্যাত্মিক বিষয় শিক্ষালাভ করিয়া ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট হ্যাম্পটনের গির্জার কর্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হন। ইনি মদ্যপানের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি অনেক ভালো ভালো গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ৮৭ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অপসৃত হন। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে লাইম্যান বিচার যে সমুদায় লোকহিতকর কার্য করিয়া গিয়াছেন সে সকল বিষয় আলোচনা করিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে ; এস্থলে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, এই ধীমান্ পুরুষের স্বীয় অধ্যবসায় এবং অত্যধিক সাহিত্যানুরাগ তাঁহা হইতে তাঁহার পুত্রকন্যা প্রভৃতি বংশাবলিতে এতটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে সমুদায় আমেরিকা মহাপ্রদেশে 'বিচার' নামই প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইহার এয়োদশটি পুত্রকন্যা এবং সকলেই কোনো না কোনো গুণে স্বনামখ্যাত। ইহাদের মধ্যে হেনরি, এডওয়ার্ড, চার্লস্ এই তিন পুত্র পিতার ন্যায় ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু হ্যারিয়েট বিচার '*টম কাকার কুটীর*' নামক একটি গ্রন্থ লিখিয়া জগতে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

এই বিদুষী দয়াশীলা রমণী ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় কনেক্‌টিকাট প্রদেশের লিচফিল্ড নগরে ১৫ জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার যত্নে ইনি বাল্যকালে অতিশয় সুচারুরূপে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমে হ্যারিয়েট হার্টফোর্ডে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ক্যাথরিন বিচার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য করিতে আরম্ভ করেন। এই অল্পবয়সে অন্যান্য বালিকারা সামাজিক আমোদপ্রমোদ লইয়া মত্ত থাকেন, কিন্তু হ্যারিয়েট তাঁহার ভগিনী ক্যাথরিনের সহিত স্বদেশিয় বালিকাদিগের শিক্ষার বিস্তৃতি এবং উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন। ক্যাথরিনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। সুতরাং কিছুদিনের জন্য ক্যাথ্‌রিনকে তাঁহার প্রাণের প্রিয় কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইল। এই সময় হ্যারিয়েট বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিলেন। এত অল্পবয়সেও তাঁহার স্বভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল ও তাঁহার চরিত্রে একটি গভীর মহত্ত্ব দৃষ্ট হইত।

হ্যারিয়েট বিচার রেভারেন্ড ক্যালভিন স্টো নামক একজন পাদরির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী একজন যথার্থ পণ্ডিত ছিলেন। বিবাহিত জীবনের প্রথমে তিনি সংসার লইয়াই একটু ব্যস্ত ছিলেন। পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষা প্রভৃতি সাংসারিক কর্তব্যে তাঁহাকে যথেষ্ট নিযুক্ত থাকিতে হইত। এই সময় কখনো কখনো ছোটো ছোটো গল্প সাময়িকপত্রে বাহির করিতেন এবং এই সকল গল্প একত্র করিয়া *মে ফ্লাওয়ার* ও *স্যাবাথ অতিবাহিত করিবার দুই প্রকার উপায়* নামে দুইখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ইহার পিতা ডাক্তার বিচার ঘৃণিত দাস ব্যবসায়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুত্র কন্যাগণও স্বভাবতই বাল্যকাল হইতে দাসত্ব প্রথা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ক্রীতদাসদিগের উপর তাহাদের প্রভুগণের অমানুষিক অত্যাচার দেখিলে ইহারা মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন। এরূপ অত্যাচার তখন অমেরিকার প্রায় সর্বস্থানেই প্রচলিত ছিল। হ্যারিয়েট এবং তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত নম্র প্রকৃতি, পরদুঃখকাতর, মহান ও উন্নত হৃদয়যুক্ত ছিলেন। হ্যারিয়েট বিবাহের পর সাংসারিক ব্যাপারে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কর্তব্যকর্ম হইতে বিরত হয়েন নাই। তিনি এই সময়

পলায়নপর দাস ও দাসসন্তানদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে যতদূর সাধ্য ভাল ব্যবহারের সহিত প্রতিপালন করিতেন। ইহাদিগকে যত্ন করা তাঁহার সাংসারিক নিত্য কর্মের একটি অঙ্গস্বরূপ ছিল। এইক্ষণে তিনি সাহিত্যালোচনা হইতে বিরত থাকিলে দাসদিগের প্রতি শ্বেতাঙ্গগণের আসুরিক অত্যাচারে মরমে মরিয়া দাসগণের পলায়নে সাহায্য করিতে ক্রটি করিতেন না। তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্র দিয়া তাহাদের কষ্ট দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

কোনো একটি ভালো কর্মের প্রারম্ভে অনেকের শত্রুতা দেখিতে পাওয়া যায়; এই কারণে 'দাস বন্ধু' নামক সভার সভ্যগণ যখন আমেরিকার দাসগণকে স্বাধীনতা প্রদানের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন তখন ইহাদিগেরও বহু শত্রু হইল। দাসপ্রভুরা যখন দেখিল যে তাহাদিগের বহু অর্থকর উপায়ের এইবার বুঝি অন্তিমকাল উপস্থিত হইল তখন তাহারা খুব গোলযোগ আরম্ভ করিল। শ্রীমতী স্টোরে স্বামী 'দাস বন্ধু' সভার একজন মিত্র ছিলেন। তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট দাসগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া উপরিউক্ত 'দাস বন্ধু' সভা-কে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। রেভারেন্ড স্টো 'লেন সেমিনারি' কলেজের খ্রিস্টীয় ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন; দাসবিরোধী দলের নেতা যখন লেন সেমিনারিতে দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়া ইহার কুফল বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন তখন ছাত্রগণের মধ্যে মহা হুলস্থূল বাধিয়া গেল। এমনকী যে যে ছাত্র বহু দাসের অধীশ্বর ছিল তাহারা সকলেই আপন আপন দাসগণকে মুক্ত করিয়া দিল। অন্যেরা দাসগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপনের প্রয়োজন করিতে লাগিল। এই সমুদয় দেখিয়া আমেরিকার দক্ষিণ প্রদেশের তুলা চিনি প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ইহাদের অধীনে শত শত দাস ছিল। প্রত্যেক দাসটিকে ক্রয় করিতে ইহাদিগের কত না অর্থ ব্যয় হইয়াছে। ইহারা পশুর মতো খাটিয়া খাটিয়া ইহাদের প্রভুদের অর্থের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে। অতএব এই সকল দাসগণকে মুক্ত করিলে তাহারা দেখিল যে তাহাদিগের ক্রয়ের টাকা ত জলে যাইবেই, উপরি তাহাদের ব্যবসায়েরও বহু ক্ষতি হইবে, সুতরাং এইসব নিষ্ঠুর দাসব্যসায়ীরা কিছুতেই দাস স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বী হইতে পারিল না। তাহারা যাবতীয় দুষ্টলোকদিগকে অরাজকতার কার্যে উত্তেজিত করিয়া দিল। ইহারা ডাক্তার বিচার ও হ্যারিয়েট স্টোর বাটী, লেন সেমিনারি প্রভৃতি কতকগুলি বাটী লুটপাট করিবার উপক্রম করিল। এই সকল উৎপাত নিবারণের জন্য বোর্ড অফ্ ট্রাস্টিস্ ছাত্রগণকে দাসদিগের কোনো কথায় থাকিতেও নিবারণ করিয়া দিল। ইহাতে সমুদয় ছাত্র লেন সেমিনারি ছাড়িয়া চলিয়া গেল ও কলেজও ছাত্রাভাবে

আর চলিল না। অবশেষে বাধ্য হইয়া প্রধান অধ্যক্ষ ডাক্তার লাইম্যান বিচার কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন ; প্রোফেসর স্টো ম্যাসাচুসেট প্রদেশের ধর্ম বিজ্ঞান সেমিনারি নামক একটি কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় হ্যারিয়েট স্টো তাঁহার জগদ্‌বিখ্যাত *টম কাকার কুটীর* একটি মাসিক পত্রে প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। সকলে মহা আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিল। যখন উহা গ্রন্থরূপে বাহির হইল তখন ইহার কাটতি কুলাইয়া উঠানো মুস্কিল হইল। সংস্করণের পর সংস্করণ যেমন বাহির হইতে লাগিল তেমনি অত্যল্প কাল মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এই পুস্তক অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইল এবং তেমন বিক্রয়ও হইতে লাগিল। ইহা গল্প কী উপন্যাস নহে? ইহার প্রত্যেক ঘটনাগুলি সমুদয়ই সত্য ঘটনামূলক। গ্রন্থোল্লিখিত কতকগুলি ঘটনা গ্রন্থকর্ত্রী নিজে দেখিয়াছেন এবং কতকগুলি ঘটনা খুব বিশ্বস্ত লোকের মুখে শোনা। *টম কাকার কুটীরে* যে ভূগর্ভস্থিত লুক্কায়িত রেলওয়ের কথা পড়া যায় তাহা গ্রন্থকর্ত্রীর বাটীর পার্শ্ব দিয়াই গিয়াছিল। দক্ষিণ দেশীয় নিপীড়িত দাসদিগকে মুক্ত করিবার জন্য কতিপয় দাস বন্ধুদিগের দ্বারা উক্ত রেলওয়ে খোলা হয়। কারণ সেই সময় আমেরিকার দক্ষিণেই দাস ব্যবসা অত্যন্ত চলিত ছিল। উত্তর আমেরিকা কানাডায় কেহ দাস ব্যবসা করিতে পারিত না। সুতরাং ক্রীতদাসেরা যদি একবার কায়ক্লেশে কোনো রকমে ক্যানেজ প্রভৃতি স্থানে চলিয়া আসিতে পারিত তাহা হইলে আর তাহাদিগকে কে পায়। ইংরেজশাসিত স্বাধীন ভূমিতে আসিয়া তাহারাও স্বাধীন হইয়া যাইত। তখন সেখানে আর তাহাদিগকে কাহারও 'এ আমার দাস' ইহা বলিয়া দাবি করিবার অধিকার থাকিত না। এই জন্য 'দাস বন্ধু' সভার সভ্যেরা দাসগণকে মুক্ত করিবার ইহাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ উপায় না দেখিয়া ভূগর্ভে রেলওয়ে খুলিয়া উহার দ্বারা দলে দলে দাসগণকে গভীর রাত্রে দক্ষিণ হইতে উত্তরে চালান করিয়া মুক্ত করিয়া দিতেন।

শ্রীমতী স্টোর এই *টম কাকার কুটীর* এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে এই গ্রন্থ পড়ি নাই বলিলে লোকসমাজে হাস্যস্পদ হইতে হইত। ইহা প্রকাশিত হইবার পর অনেক লোক ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন ইহা ঔপন্যাসিক গল্প, গ্রন্থকর্ত্রীর স্বকপোলকল্পিত ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। মনুষ্যের দ্বারা মনুষ্যের প্রতি এরূপ পিশাচতুল্য ব্যবহার হইতে পারে না। কিন্তু মিসেস স্টো ইহার প্রতিবাদ করিয়া, যে যে ঘটনা তাঁহার স্বচক্ষে দেখা এবং যে যে ঘটনা তাঁহার কোনো আত্মীয় বা বিশ্বস্ত লোকের সমক্ষে ঘটিয়াছিল তাহাদের নাম প্রকাশিত করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া জগতের নিকট *টম কাকার কুটীরের*

সত্যতা আরও দৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই পুস্তকে আফ্রিকাবাসীগণের প্রতি শ্বেতাঙ্গদিগের ঘোর পশুতুল্য ব্যবহার পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। টম কাকার কুটীরে ক-টি ঘটনাই বা বিবৃত করা হইয়াছে ; চল্লিশ লক্ষ দাসের প্রতি তাহাদের পশুবৎ অধম প্রভুদিগের দ্বারা পৈশাচিক আরও কত অত্যাচার হইয়া গিয়াছে তাঁহার খোঁজ কে রাখিয়াছে। আমাদের বাংলা দেশে অসমে নীলকর, চা-করদিগের দ্বারা কুলিদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুর অত্যাচার যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন শ্বেতাঙ্গেরা আপনাদের পকেট পূর্ণ করিবার জন্য কী কাজ না করিতে পারেন, খ্রিস্টধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া তাহারা কীরূপ খ্রিস্টধর্মানুযায়ী কর্ম সকল অনুষ্ঠান করেন।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে মিসেস স্টো তাঁহার স্বামী এবং ভ্রাতার সহিত ইংলন্ডে গমন করেন। লন্ডনে উপস্থিত হইলে ইংলন্ডীয় ভগিনীগণের দ্বারা টম কাকার কুটীরের গ্রন্থকর্ত্রী অতিশয় সমাদৃত হইয়াছিলেন। ইংলন্ড হইতে উহারা ইউরোপের প্রসিদ্ধ বড়ো বড়ো নগর সমুদয় পরিদর্শন করিয়া পরে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করেন। বাটীতে আসিয়া তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া প্রকাশ করেন। ইহা পড়িলে, তিনি কী প্রকার উচ্চ ভাবে ইউরোপে এবং ইংলন্ডে সমাদৃত হইয়াছিলেন তাহা জানা যায়। ইহার পর তিনি টম কাকার কুটীরের ন্যায় দাসকাহিনি বিবৃত করিয়া *ড্রেগু* নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকখানিও জগতে বড়ো অল্প সমাদর লাভ করে নাই। টম কাকার কুটীরের সমান না হউক ইহার ঠিক নিম্নস্থান অধিকার করিয়াছিল। হ্যারিয়েট স্টো বাল্যকাল হইতেই ক্রীতদাসগণের এই সমুদয় দুঃখের বিষয় দেখিয়া শুনিয়া এরূপ সুন্দরভাবে দুঃখের কাহিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার লিখিত পুস্তক পড়িলে ঘটনাগুলি চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে মনে হয়।

*কর্ণহিল* মাসিকপত্রের সম্পাদক থ্যাকারে মিসেস স্টোকে তাঁহার মাসিকপত্রে লিখিতে অনুরোধ করাতে *অ্যাগ্নেস অফ সরেন্টো* নামক একখানি উপন্যাস এ পত্রে তিনি বাহির করেন। এই দাস ব্যবসায় রহিত করিবার চেষ্টার জন্য আমেরিকায় ভীষণ অন্তর্বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীমতী স্টো ইহার যে একটা প্রধান কারণ ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহার পর তিনি 'ইংলন্ডীয় মহিলাগণের প্রতি পত্র' নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহাতেও তিনি দাসগণের দুরবস্থার চিত্র অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার এই পত্রের একস্থানে দেখিতে পাই :

সম্প্রতি এক যুদ্ধে একটি যোদ্ধা হত হইলেন, তিনি তাঁহার মাতার বহু সন্তানের মধ্যে মৃতের একমাত্র অবশিষ্ট জীবিত পুত্র ছিলেন। ওই রমণী তাহার কোনো এক দাসীর একাদশ পুত্রের সমস্তগুলি বিক্রয় করিয়া তাহাকে বৃদ্ধকালে অতিশয় কষ্ট প্রদান করেন, শেষ সন্তানটিকে তাহার নিকট রাখিবার জন্য দাসীর কত কাকুতিমিনতি অশ্রু কিছুই কর্ণপাত করেন নাই। প্রভুপুত্রের মৃত্যু সংবাদ আসিলে ওই দাসী তাহার মনিবকে আসিয়া বলিল 'এখন আমরা সমান হইলাম, তুমি আমার প্রভু হইয়া আমার সমস্ত সন্তান বিক্রয় করিয়াছ এখন তোমার প্রভু তোমার সমস্ত সন্তান লইলেন। এখন আর আমাদের মৃত্যুর পর গোর দিবার কেই নাই। এখন আমি তোমাকে মার্জনা করিলাম।' ওই পত্রে আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন 'ইহা মনে রাখিয়ো, যে দাস ব্যবসায়ের উন্নতি ইচ্ছা করা, আমাদের দক্ষিণ দেশীয় লোকদিগের পুত্রকন্যা ও বংশের উপর ভগবানের ঘোর অভিসম্পাত ইচ্ছা করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। জানিও! যদি আমরা এই যুদ্ধে জয় লাভ করি তাহা হইলে এই সমুদয় দাস ব্যবসায়ী এবং ঘোর দাস ব্যবসায়ের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের বংশধরগণ আমাদিগকে দু-হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিবে এবং আমরাও ইহাদের বংশধরদিগকে চির নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব।

এই মহানুভবা মহিলা দাসদিগের পরিত্রাতা হইয়াই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এত অর্থ, এত পরিশ্রম ও মহামূল্য সময় নষ্ট করিয়া দাসদিগের সপক্ষে লড়িয়া তাঁহার কী এত লাভের আকাঙক্ষা ছিল। কিছুই না! কেবল মাত্র মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্য যে একটি সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত আছে তাহারই টানে নিগ্রোদিগের কালো রং সত্ত্বেও উহাদের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। এক মাতার বহু সন্তান হইলে যেমন কেহ কালো কেহ বা সুন্দর হয়, কিন্তু তাই বলিয়া কালো ভাই কী ভগিনীকে সুন্দর ভাই কী ভগিনী যেমন ঘৃণা করে না সেইরূপ জগন্মাতার অসংখ্য সন্তানের মধ্যে কত চেহারার কত প্রকার রূপের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাই বলিয়া কালো কিংবা সুশ্রীসম্পন্ন না হইলে ঘৃণা করা কখনই কর্তব্য নহে। মিসেস স্টো এইরূপ উন্নত উদার প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। দয়াপূর্ণ হৃদয়ে তিনি মনুষ্য সাধারণকে সমান চক্ষে দেখিতেন। যতকাল সূর্য উদয় হইবে, যতকাল দাসবংশের একটি লোকও জীবিত থাকিবে ততকাল মিসেস স্টোর নাম জগতে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকিবে, ততকাল তিনি লোকসমাজে পূজিত হইবেন।

# সুকবি হেম্যান্স

ভগবানের রাজ্যে সমস্ত বিষয়েরই মধ্যে কবিত্বের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির শোভায়, সুন্দরী মুখশ্রীতে, শিশুর মধুর হাসিতে সর্বত্রই কবিত্ব ; আবার জ্যোৎস্নাবিকশিত রজনিতে যেমন মহাকবির কবিত্বের রসাস্বাদন করি তেমনি ঘোর অমাবস্যা নিশীথেও একটি মধুর গম্ভীর ভাবে মগ্ন হইয়া যায়। ধনী, নির্ধন, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ওই সমুদয়ের কবিত্বে মুগ্ধ হইতে পারেন কিংবা অতি তুচ্ছ কোনো বস্তুতেও সহস্রগুণ সৌন্দর্য দেখিতে পারেন তাই বলিয়া তাঁহারা সকলেই কবি নহেন। বড়ো বড়ো গায়কদিগের সংগীত শ্রবণ করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া অনেক শ্রোতা ঘাড় নাড়িতে এবং তালি দিতে থাকেন কিন্তু তাই বলিয়া কী তাহাদিগের সকলকেই গায়ক বলিবে? কখনই নহে। সেইরূপ প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইলে কিংবা সেই শোভা উপলব্ধি করিলেই কবি হওয়া যায় না। তবে কবি কে? যিনি যাহা দেখেন ও যাহাতে মুগ্ধ হয়েন যদি তাহা মধুরভাবে বর্ণনা করিতে পারেন তবে তিনিই প্রকৃত কবি। আমাদের আলোচ্য এই রমণীও সত্য সত্যই কবি ছিলেন। সাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশ করিবার বহু পূর্বে অতি বাল্যাবস্থা হইতেই এই রমণী প্রাকৃতিক শোভার মাধুর্য উপভোগ করিতে পারিতেন। প্রায়ই তিনি ইংলন্ডের পর্বতোপরি বসিয়া থাকিতে ভালোবাসিতেন ; বৃক্ষের শর শর শব্দে; কী কোনো পর্বতীয় ক্ষুদ্র নদীর কুলুকুলু ধ্বনিতে মোহিত হইয়া তাহাই শ্রবণ করিতে থাকিতেন।

লিভারপুল নগরে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে, ২৫ সেপ্টেম্বরে ডরথি ব্রাউন হেম্যান্স-এর জন্ম হয়। ইহার পিতা মিস্টার ব্রাউন লিভারপুল নগরের এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর ছিলেন। ইহার মাতা ভিনিস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। য়ুরোপের মধ্যে ভিনিস একটি অতিশয় রমণীয় শহর, সেই হেতু হেম্যান্স বলিতেন যে তাঁহার মাতাই তাঁহার

কবিতা ও নাটকাদির প্রধান কারণ। হেম্যান্স বাল্যকালে পরমাসুন্দরী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ক্রমে বাহ্যিক সৌন্দর্যের অনুরূপ মানসিক সৌন্দর্যেও ভূষিত হইয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই তিনি অতি নম্র প্রকৃতির ছিলেন। একবার একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার মাতার সহিত দেখা করিতে আসিয়া বালিকা ডরথিকে দেখিয়া তাহার সম্মুখেই বলিয়াছিলেন 'এই বালিকা সুখের জন্য জন্মায় নাই ; ইহার গণ্ডদেশ অতি ত্বরিতে রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। ত্বরিতেই মিলাইয়া যায়'—সেই অবধি এই কথা তাঁহার হৃদয়ে গাঁথিয়া গিয়াছিল; তিনি ইহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। তেরো বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার কতিপয় কবিতা কোনো মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত করেন কিন্তু সেই কবিতাগুলির একটি কঠোর সমালোচনা হওয়াতে তাঁহার হৃদয়ে এতদূর আঘাত লাগিয়াছিল যে নিরতিশয় দুঃখে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ডরথি যখন নিতান্ত বালিকা তখন ইহার পিতা ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া লিভারপুল হইতে উত্তর ওয়েলস্ প্রদেশের ব্রন উইল্ফা নামক এক নির্জন স্থানে উঠিয়া গিয়া বসতি স্থাপন করেন। অবশ্য তখন তাহাদের পক্ষে লিভারপুল হইতে উঠিয়া যাওয়া অতিশয় কষ্টদায়ক হইয়াছিল, কিন্তু ডরথির পক্ষে ইহা যেন 'শাপে বর হইল'। তাঁহাদের বাড়ির চতুর্দিকের পার্বত্য দৃশ্য সকল বালিকা কবির কবিত্ব উৎসারিত করিয়া দিতে লাগিল। হেম্যান্স সাত-আট বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যদিও তখন তাহা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু লিভারপুলে থাকিলে বোধ হয় এত শীঘ্র তাঁহার কবিতার বিকাশ হইত না। শেক্সপিয়রের গ্রন্থ ইহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একাদশ বৎসর বয়সে তিনি শেক্সপিয়রের গ্রন্থাবলি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন —

> ইতিহাস পাঠ করিতে আমার বড়ো ভালো লাগে। জ্ঞানী ও বীরপুরুষদের এবং তাহাদের কর্মসকল স্মরণ করিলে অতীতকালের স্মৃতি মনোমধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু কবিশ্রেষ্ঠ শেক্সপিয়র প্রমুখ কবিদিগের সুললিত রচনা পাঠ করিলে আমার যেরূপ আনন্দ হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় না—হৃদয় মাতিয়া উঠে। বেচারী ওফেলিয়ার শোচনীয় মৃত্যুতে আমরা যেমন চক্ষুর জল না ফেলিয়া থাকিতে পারি না আবার সেইরূপ হরিত্‌বর্ণের বৃক্ষলতাপূর্ণ উপত্যকা মধ্যে শুভ্র জ্যোৎস্না রজনিতে পরিরা নৃত্য করিতেছে, সে দৃশ্য যেন মনকে বিমোহিত না করিয়া যায় না।

সাত-আট বৎসর বয়সে যে সকল কবিতা তিনি লিখিয়াছিলেন তাহা ওইরূপ অল্প বয়সের পক্ষে খুব ভালো বলিতেই হইবে।

সৌভাগ্যবশত ডরথির মাতা, মিসেস ব্রাউন কন্যার এই অসামান্য দৈব শক্তি দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। তাঁহার আরও শ্রীবৃদ্ধির জন্য খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি মাতার যত্নে ও সাহায্যে উত্তরোত্তর ছন্দ রচনা প্রভৃতিতে উৎকর্ষতা লাভ করিতে লাগিলেন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি *গার্হস্থ্য প্রণয়* নামে যে কবিতা পুস্তকটি প্রকাশ করেন, ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতে তাহার প্রায় লক্ষাধিক সংখ্যা বিক্রয় হইয়া যায়। ইহা হইতেই জনসাধারণে তাঁহার কবিতা কতদূর আদৃত হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

এই পুস্তক বাহির হইবার পর ক্যাপ্তেন হেম্যান্সের সহিত ইহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই বিবাহে দম্পতিদ্বয়ের কেহই সুখী হয়েন নাই। কী করিয়াই বা হইবেন! কাপ্তেন সাহেব কঠোর সৈনিক বিভাগে কর্ম করিয়া নিজের জীবিকা অনুযায়ী রীতিনীতিতে অভ্যস্ত, এদিকে কোমল স্বভাবা সুন্দরী ডরথি ঠিক তাহার বিপরীত, সুতরাং কী করিয়া উভয়ের মনের মিল হইবে? যাহা হউক চারি-পাঁচটি পুত্র জন্মিবার পর ইহার স্বামী শারীরিক অসুস্থতার ভান করিয়া ইটালি চলিয়া যান এবং মিসেস হেম্যান্স সন্তানগুলিকে লইয়া পুনরায় ওয়েল্স্ দেশে তাঁহার মাতার নিকট চলিয়া আইসেন। সেই অবধি ইহারা বরাবরই ভিন্ন হইয়াই ছিলেন।

ক্যাপ্তেন হেম্যান্স ইটালি চলিয়া গিয়া স্ত্রীপুত্রের কাহারই খোঁজ খবর না লওয়াতে মিসেস হেম্যান্স ছোটো ছোটো পুত্রসন্তানগুলির ভরণপোষণ ও শিক্ষার জন্য অতিকষ্টে পড়িলেন, সুতরাং তাঁহাকে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহার্থে মাসিকপত্র প্রভৃতিতে লিখিতে আরম্ভ করিতে হইল। প্রতি পৃষ্ঠা লেখার জন্য তিনি এক মোহর করিয়া পাইতেন, ইহাতে তাঁহার সংসার বেশ একরকম চলিয়া যাইতে লাগিল। এখন হইতে আমোদের পরিবর্তে 'ঐশ্বরিক দান' তাহার জীবিকানির্বাহের একমাত্র উপায় হইল। বাল্যকাল হইতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়া ইনি কখনো লেখাপড়ায় অবহেলা করেন নাই। ছোটোবেলায় ফ্রেঞ্চ এবং ইটালীয় ভাষা জানিতেন, পরে স্প্যানীয় ও পর্তুগিজ ভাষা শিখিয়াছিলেন। জার্মান ভাষা অল্প অল্প জানিতেন কিন্তু নিজের যত্নে ওই ভাষাকে এতদূর আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে তিনি মহাকবি গেটের তেজস্বিতাপূর্ণ ভাষাও বুঝিতে সক্ষম হইতেন।

তাঁহার স্মরণশক্তিও অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার তাঁহার এক ভাই, তাঁহার স্মরণশক্তির বিষয়ে সন্দেহপ্রকাশ করাতে তিনি বিশপ হিবারের 'ইউরোপ' নামক প্রায় চারিশত পঙ্‌ক্তির এক কবিতা এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে মুখস্থ করিয়াছিলেন। ইহার আগে তিনি এ কবিতা একবারও পড়েন নাই। ইহা ব্যতীত তিনি চিত্র কর্মে

বেশ পটু ছিলেন এবং হার্প ও পিয়ানো খুব সুন্দর বাজাইতেন ; ইহারা যেন তাঁহার দুই প্রিয় সখী ছিল এবং ইহাদের সহবাসে তাঁহার দিবসের শ্রান্তি ক্লান্তি সব দূর হইয়া যাইত। বিশপ হিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, ইহারই উৎসাহে তিনি 'Vespers of Palermo' নামক শোকপূর্ণ নাটক লিখিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে সফলকাম হয়েন নাই।

হেম্যান্সের কবিতার যশ-সৌরভ তাঁহার জন্মভূমির ন্যায় আমেরিকাতেও বিস্তৃত হইয়াছিল। সেখান হইতে একটি মাসিকপত্র চালাইবার জন্য তাঁহার নিকট একটি খুব ভালো কর্মের প্রস্তাব আসে, কিন্তু স্বদেশ ত্যাগে অনিচ্ছুক হইয়া ধন্যবাদের সহিত তিনি তাহা অস্বীকার করেন।

তাঁহার যশ-সৌরভে যতই দিগন্ত আমোদিত হইতে লাগিল ততই মধুমক্ষিকার ন্যায় বড়ো বড়ো সাহিত্যসেবী দলের মধ্যে তাঁহার বন্ধুর সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, জেম্‌স মন্ট গমরি, ডাক্তার বাউরিঙ্গ, রস্কো, স্যার ওয়াল্টার স্কট, মিসেস হাউইট এবং আরও অনেক খ্যাতনামা লোকের সহিত তাঁহার খুব ভালো রকম আলাপ পরিচয়াদি হইয়াছিল।

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার পুত্রদিগের শিক্ষার জন্য তাঁহার প্রিয়তম ওয়েল্‌সের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া লিভারপুলের নিকটবর্তী একস্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার 'ওয়েল্‌সের নিকট বিদায়গ্রহণে' তিনি লিখিয়াছেন—

> আমি তোমায় ধন্যবাদ দিতেছি! তাহা তোমার উপকূলে পার্বত্য দৃশ্যের রমণীয় শোভার জন্য নহে, অথবা পুরাকালে তোমার ক্রোড়ে যে সকল বীর ও খ্যাতনামা কবি পালিত হইয়াছিল তাহাদের অমর স্মৃতির জন্যও নহে, অথবা সেই তোমার গৌরবান্বিত অতীত যুগের গানের জন্যও নহে—কেবল তুমি আমার মাতৃভূমি ও আমার কবিত্ব জীবনের ক্রীড়াক্ষেত্র বলিয়া।

তাহার পর বৎসর ডরথি হেম্যান্স স্কটল্যান্ড ভ্রমণে যাইয়া স্যার ওয়াল্টার স্কটের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ইহার আগে ইনি কখনো স্যার ওয়াল্টার স্কটকে দেখেন নাই। ওয়েভার্লি গ্রন্থকর্তার সহিত আলাপের পর মিসেস হেম্যান্স, তাঁহার মধুর ও সৌজন্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন 'আমি আশ্চর্য হইতেছি যে আমি স্যার ওয়াল্টার স্কটের সহিত এমনভাবে কথা কহিতেছিলাম যেন তিনি আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু, যদিও এই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইল। কারণ তিনি এই মাত্র তাঁহার বাড়ি অ্যাবটস্ফর্ডে ফিরিয়া আসিয়া আমার সহিত সকালে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। যখন তিনি আমায় স্কটল্যান্ডে

আন্তরিক অভ্যর্থনা করিলেন তখন আমি তাঁহার সহবাসে একটি প্রখর শক্তি হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলাম। স্কটল্যাণ্ড থেকে ফিরিয়া আসিবার জন্য ওয়াল্টার স্কটের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার কালে তাঁহাকে এই বলিয়াছিলাম 'কোনো কোনো লোক আছে, যাহাদের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই যেন কোনো আপনার লোক বলিয়া দাবি করিতে ইচ্ছা করে ; তোমাকেও সেই ধরনের একজন বলিয়া বোধ হইয়াছিল'।

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সহিত দেখা করিতে যান। তাঁহার সহিত পরিচিত হইলে মিসেস হেম্যান্স বড়োই আনন্দিত হইলেন। তাঁহার কোনো বন্ধুকে কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

> আমি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সহিত পরিচিত হইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ইঁহার দয়ালুভাব আমার হৃদয়ে একরকম শান্তিদান করিয়াছে। ইহার জীবনের দৈনিক সৌন্দর্য, তাঁহার কবিতার সংযোগে যে একটি মধুর সংমিশ্রণ হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। আমরা অনেক সময় একত্র থাকি। তিনি আমার নিকট পড়েন; বেড়ান, আবার যখন আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াই তিনি ইহার অগ্রে অগ্রে থাকেন। বাস্তবিকই তাহার সহিত যেন আমার বহুকালের পরিচয়। আজ সমস্ত সকালটা তিনি অনুগ্রহপূর্বক আমার কাছে স্পেনসরের খানিকটা পড়িয়াছেন, তাহার পর তাঁহার স্বরচিত 'Laodamia', তাহার পর আমার প্রিয় 'টিনটার্ন অ্যাবী' এবং আরও অনেক ভালো ভালো কবিতা পড়িতেছিলেন, যেগুলি তুমিও আমার ন্যায় অত্যন্ত ভালোবাস। তাঁহার পড়া একটু মজার রকমের, কিন্তু আমার কানে খুব মধুর লাগে ; ধীর, গম্ভীর এবং পড়িবার কালে তাঁহার এত আগ্রহপূর্ণ ভাব যে আমি আগে কোথাও কখনো এমন পড়া শুনি নাই। যখন তিনি খোলা জায়গায় কিছু পড়েন কী কিছু আবৃত্তি করেন তখন তাঁহার গম্ভীর ও গভীর সুর যেন কোনো অমানুষিক স্বর হইতে বাহির হইতেছে মনে হয়। বনের গাছপালার এবং নির্ঝরিণীর সুরের সহিত তাঁহার স্বরের সংমিশ্রণ বড়োই মনোহর। তাঁহার ভাব আশ্চর্যরকম কবিত্বপূর্ণ।

আর একটি চিঠিতে হেম্যান্স লিখিয়াছেন—

> কী করিয়া আমি তোমায় বলিব কী প্রকার শান্তি ও পবিত্রতার মধ্যে আমি বেষ্টিত আছি। গত দুই বৎসর হইতে আমি কখনো কখনো ভয় পাইয়াছি যে স্তুতিবাক্য, কঠোর সাংসারিক পরীক্ষা, মনের বৃত্তিগুলিকে বেশি রকম মোচড় দেওয়া এবং গুরুতর পরীক্ষা প্রভৃতির ফলে আমার ভিতরকার শুদ্ধ, পবিত্র আনন্দের নির্ঝরিণী বুঝি শুকাইয়া যাইবে, কিন্তু এখন আমি জানিলাম—

'Nature never did betray
The heart that loved her'

অর্থাৎ 'যাহারা প্রকৃতিকে ভালোবাসে, প্রকৃতি তাহাদের সহায়'। এখন আমি যেন আর পবিত্র সত্য ব্যতীত অন্য কোনো বিষয় ভাবিতে পারি না। আমি কি ইহার আগে তোমায় কখনো বলিয়াছি যে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পড়া আমায় কত আনন্দ প্রদান করে? তাহার স্বর যেন জলদগম্ভীর ভাবে উঠে ; আর মিলাইয়া যায়। আমরা এইমাত্র গ্রাসমিয়ারে গভীর উপত্যকা হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। অনেক রকমের প্রকৃতির বিষয় কথা হইতে হইতে আমি বলিলাম 'বোধ হয় আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহার চেয়েও কত বেশি গম্ভীর ও বেশি মধুর বাদ্য সংগীত'। তিনি নিম্নলিখিত মহাকবি মিল্টনের দুই পঙ্‌ক্তি শ্লোক আবৃত্ত করিয়া আমার কথার উত্তর দিলেন। তাঁহার গম্ভীর আগ্রহভাব— ভক্তিভাবপূর্ণ গুঞ্জনে মিলাইয়া গেল— যেন ওই শ্লোকটি হৃদয় থেকে উত্থিত হইল—ওভাব আমি কখনো ভুলিতে পারি না ; যখন তাঁহার এই উচ্চভাবগুলি ভিতর হইতে বাহির হইতে লাগিল তখন মনে হইতেছিল যেন বনের বৃক্ষপত্রগুলি পর্যন্ত তাঁহার প্রার্থনায় বিচলিত হইতেছে।

এই পত্রগুলি হইতেই হেম্যান্সের হৃদয় কীপ্রকার মধুর কবিত্বপূর্ণ এবং উচ্চ ভাবযুক্ত ছিল তাহা বোঝা যায়। কিছুকাল পরে লিভারপুলের নিকট ওয়েভাট্রি হইতে মিসেস হেম্যান্স পুনরায় আয়ার্লণ্ডের রাজধানী ডব্লিন শহরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইখানে আসিয়াই খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন। কিন্তু একটি বড়ো দুঃখের বিষয় যে এত অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি তাঁহার পুত্রদের লেখাপড়া প্রভৃতি ব্যয়ভারের জন্য কষ্ট করিয়া লিখিতে বাধ্য হইতেন। একবার তিনি তাঁহার এক ভাইকে লিখিয়াছিলেন যে

আমার বরাবর এই দুঃখ যে পুত্রদের শিক্ষার জন্য অনিবার্য আবশ্যকীয় অর্থের জন্য বাধ্য হইয়া যে সকল বিষয় আমি বৃথা বলিয়া মনে করি এমন সব বিষয়ে আমাকে মনোনিবেশ করিতে হয়। আমার ইচ্ছা হয় যে, আমার সমস্ত মানসিক শক্তি কোনো উচ্চ এবং বৃহৎ কর্মে নিয়োজিত করি, এমন কোনো মহান এবং পবিত্র বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি যার মধ্যে একটা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

কিন্তু হায় ! বিধাতা বুঝি সে সাধে বাদ সাধলেন। বিধবার ন্যায় এই পুত্র সন্তানগুলিকে লইয়া এই কঠোর সংসারের সহিত যুঝিয়া তিনি ক্রমেই গম্ভীর,

শান্ত ধীর ও ধর্মিষ্ঠা নারী হইয়াছিলেন এবং বহুদিবস হইতে তিনি ধৈর্য, ত্যাগ প্রভৃতি মহদ্‌গুণ সকল অর্জন করিয়াছিলেন। অন্যান্য গুণের মধ্যে কর্তব্য বোধটি তাঁহার অতিশয় প্রবল ছিল।

মিসেস হেম্যান্সের কবিতায় যদিও একটা খুব শক্তি ও মৌলিকতা দেখা যায় না, কিন্তু ইহাতে বেশ একটি কোমল সুললিত ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ইহাঁর স্কারলেট জ্বর হইলে তিনি শয্যাগত হইয়া পড়েন। ডব্লিনের আর্চবিশপ তাঁহাকে অতি যত্ন করিয়া নিজের গ্রীষ্মাবাসে লইয়া যান, যদিও তাহাতে একটু হেম্যান্স সুস্থ হন। কিন্তু তাহার গৃহে যাইবার সময় ঘনাইয়া আসিতেছিল, সুতরাং আর্চবিশপ এবং তাঁহার সহধর্মিনী অপরিসীম যত্নেও তাঁহার কিছুই উপকার করিতে পারিলেন না। ১১ মে, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ডবলিন শহরে তিনি এই অসার সংসার মোহ ত্যাগ করিয়া যেখানে রোগশোকের যন্ত্রণা নাই, যেখানে সমস্তই মধুর, সেই শান্তিরাজ্যে গমন করেন।

# জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সহজ উপায়

আজ প্রায় বারো চোদ্দো বছর ধরে শিক্ষা বিষয়, বিশেষত বালিকা-শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করে আসছি। এই সূত্রে আমি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেছি। এই মহাদেশ-তুল্য ভারতবর্ষের নানা জাতির সংস্পর্শে এসে সাধারণ লোকদের শোচনীয় অবস্থা দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা এই দুটি মানিক-জোড় হয়ে দেশকে উৎসন্নের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এক অপরের সাহায্য বিনা টিকতে পারে না। দুজনায় যেন হাতধরাধরি করে ভারতবাসীর গৃহে গৃহে দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয়েছে। এর মধ্যে কোন্‌টি প্রবল এবং কোন্‌টির প্রভাব অপরটির উপর আধিপত্য করেছে তা বলা সুকঠিন। আগে দারিদ্র্য শত্রুকে ধ্বংস করলে নিরক্ষরতা শত্রু শক্তিহীন হবে, কি শেষোক্তকে সরাতে পারলে দারিদ্র্য শত্রুর তেজ কমে যাবে সে বিষয়ে ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলে মনে হয় যে অজ্ঞানতাই দেশের বহু দুঃখের কারণ ; সুতরাং তাকে সর্বাগ্রে দূর করতে হবে। অনেক স্থলে দারিদ্র্যবশত শিক্ষার বন্দোবস্ত করা কঠিন হয়েছে অবশ্য তাও দেখা যায়। শহরের কথা ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে পল্লিগ্রামে গেলেই দারিদ্র্য এবং অজ্ঞানতার ভীষণ বিষময় ফল অতি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। পল্লিগ্রামগুলিতে যে সারাবছর কোনো-না-কোনো রোগ লেগেই থাকে তার অনেকটা কারণ অজ্ঞানতা। সামান্য একটা উদাহরণ, যেমন যে পুষ্করিণীর জল লোকে পান করছে তাতেই স্নান, শৌচ কার্য, কাপড় ধোয়া প্রভৃতি সব কাজ চলছে—এটা অজ্ঞানতার ফল বলতেই হবে, যদিও কখনো দেখা যায় যে দারিদ্র্য বশত দ্বিতীয় পুষ্করিণী না থাকাতে এরূপ অজ্ঞানতার কার্য করতে অনেকে আবার বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত হালের গোরু কেনবার জন্য কী অন্য কোনো কারণে কৃষক মহাজনের নিকট থেকে কিছু টাকা ধার করল, সে তিন মাস অন্তর কী ছ-মাস অন্তর সুদে আসলে

মহাজনকে কিছু কিছু শোধ দিয়ে আসছে তা স্মরণ রাখবার জন্যে হয়ত দেয়ালে আঁকড় কেটে রাখল, নয়তো নুড়ি দিয়ে গুণে মনে মনে ঠিক করে রাখল যে তার ঋণ কতটা আছে। কিন্তু তা কে শোনে, সে মহাজনের কাছে তার বাকি দেনার হিসাব শুনে চমকে উঠল। সে যে অত টাকা সুদে-আসলে দিয়ে আসছে তার কী হল? তাকিয়ায় নিজের বিশাল দেহটিকে হেলিয়ে দিয়ে রামাশ্যামাকে দিয়ে খাতাপত্র খুলিয়ে কখনও হেসে কখনো চোখ রাঙিয়ে মহাজন গরিব কৃষককে যে বাকি পাওনার হিসাব দেখাল, তাতে কৃষক বেচারি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ওই মহাজনের ঋণ দায় থেকে সে কি কখনও মুক্ত হবে! হায়, নিরক্ষরতার কী বিষময় ফল! বিদেশি গভর্নমেন্টের সহিত non-co-operation, non-resistance যে কী বস্তু তা পল্লিবাসীদের মধ্যে কয়জনার জানা আছে? মহাত্মা গান্ধি, মহারাজও হচ্ছেন আবার গান্ধি মাইজিও হচ্ছেন । তিনি স্ত্রী কি পুরুষ, কোথাকার লোক, তাও অনেকের জানা নাই। দেশের অবস্থা তারা কিছুই বুঝছে না। শিক্ষিত সমাজে ও ছাত্রদের মধ্যে খাদির প্রচলন, কিন্তু চাষিদের মধ্যে কে খদ্দর ব্যবহার করে? এমনকী দেশি মিলের কাপড় ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও কী তারা বুঝতে পারে? সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বেশ মনে হয় যে, সাধারণ লোকে যদি সহজ সহজ বই ও দৈনিক সংবাদপত্রটা পড়তে পারে, তাহলে নিজেদের ও দেশের অবস্থাটা বুঝতে পারবে। তা বুঝলে আবার তার প্রতিকারের চেষ্টাও করবে। অতএব গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার যে নিতান্ত আবশ্যক তা সহজেই অনুমিত হয়। এই সম্বন্ধে যখন আমি আমার মস্তিষ্ক আলোড়ন করছিলাম সেই সময় আমেরিকার স্বনামধন্য প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের একখানি জীবনী আমার হাতে পড়ে। তাতে আমি ওখানকার 'Little red room school house' এর বিষয় পড়ি। বলাবাহুল্য যে তখন ওই পাঠশালাগুলি লাল রঙের হত। প্রায় প্রত্যেক গ্রামে একটি করে লাল পাঠশালা থাকত। লাল রঙের হওয়াতে অনেক দূর থেকে দেখা যেত, যেন গ্রামের নিশানা। প্রত্যেক রেডরুম পাঠশালা একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর জিম্মায় থাকত। গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থ পরে পরে ওই শিক্ষকের থাকবার ও খাওয়াবার ভার গ্রহণ করত। এই রকম বিদ্যালয়ে পড়েই Washington, Lincoln, Emerson -এর মতো মার্কিন দেশের স্বনামখ্যাত পুরুষগণ স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করে গিয়েছেন।

ঐ উন্নত দেশের শিক্ষা প্রণালী দেখে আসবার জন্য ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে আমি মার্কিন যুক্তরাজ্য গমন করে দুই শতের অধিক শিক্ষালয় পরিদর্শন করি। যে 'লাল

কুঠি' বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে উপরোক্ত ব্যক্তিগণ নিজের দেশকে স্বাধীন করে গিয়েছেন, দাসত্বপ্রথা নিবারণ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যগুলিকে একত্র করে যুক্তরাজ্য স্থাপন করে গিয়েছেন, সে সব লাল কুঠি এখন প্রায় সবই তিরোহিত হয়েছে। তাহাদের পরিবর্তে মর্মর প্রস্তর নির্মিত রাজপ্রাসাদ তুল্য বৃহদাকার মনোহর বিদ্যালয় হর্ম্য সকল সগর্বে দাঁড়িয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

মার্কিন দেশে ৪৮টি স্টেট নিয়ে যুক্তরাজ্যের সৃষ্টি ; তার মধ্যে আমি ৩৮টি স্টেট পরিভ্রমণ করেছি। ইহা ব্যতীত কেনেডার কিউবেক, টোরোন্টো, মন্ট্রিয়েল প্রভৃতি শহরেও গমন করি। গত বৎসর টোরোন্টোতে যে আন্তর্জাতীয় বিরাট শিক্ষা-সংঘ অথবা (World Federation of Educational Association)-এর বৈঠক বসে, সেখানে আমি ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ আহূত হয়ে গমন করি। সে বৈঠকে নানা দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হয়। যাবতীয় ইউরোপীয় দেশের তো কথাই নাই, পারস্য, আফগানের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও দেখা হল। ও সব দেশেও শুনলাম প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হয়েছে। অবশ্য ওসব স্বাধীন দেশ। আর আমাদের অর্থ কোথায়! এক কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে টাকা বৎসরে খরচ হয়, তার অর্ধেক কি আমাদের সমস্ত ভারতের জন্য খরচ হয়? যুক্তরাজ্যে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, কী করে বালকটি ভবিষ্যতে পরের গলগ্রহ না হয়ে স্বাধীনভাবে উপার্জন করতে পারে। পিতা-মাতা যতই গরিব হোক না, ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য তাদের চিন্তা নাই। লক্ষপতির সন্তানের মতোই গরিবের ছেলেও একই স্থানে একইভাবে শিক্ষা লাভ করবে।

ওসব দেশের একটি অতিসাধারণ লোকের সঙ্গে আমাদের সাধারণ লোকের তো তুলনা হয় না। আমার মনে হয় যে আমাদের ম্যাট্রিক পাস করা ছেলেও ওদেশের সাধারণ লোকেদের চেয়েও কম জানে। আমেরিকার একজন চাষি পৃথিবীর অপর প্রান্তের খবর সব বলে দেবে, গত মহাযুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করবে। সুদূর ক্যালিফর্নিয়ার চাষি গোয়ালার ঘরে আমি টলস্টয় এবং আমার কাকামহাশয়ের গীতাঞ্জলি, ডাকঘর প্রভৃতি পুস্তক সজ্জিত রয়েছে দেখে এসেছি।

বর্তমানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে বহু দেশের চারিদিকে খুব হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে। শাসনকর্তারা এতদিন ধরে আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এখন ঘন ঘন আন্দোলনের তাড়নায় শিক্ষা প্রচলন কার্যে মনোযোগ দিতে একরকম তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গভর্নমেন্ট

বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তাব করেন ; তাহাতে তাঁহারা স্বীকার করেন যে গ্রাম্য জনপদ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা খুবই আবশ্যক হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করতে পারলে দেশের বহুকালের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অভাব দূরীভূত হবে। এ অভাব বহুকাল পূর্বেই দূরীভূত হলে, আজ গ্রামের দুরবস্থার অনেকটা অপনোদন হত। এখনও বলা যায় না গভর্নমেন্টের প্রস্তাবটি কীরূপ দাঁড়াবে, ব্যবস্থাপক সভাতে গৃহীত হবে কিনা। প্রথম হতেই এর বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ চলেছে। এইটি কার্যে পরিণত করতে গেলে অনেক টাকার আবশ্যক। তার বেশির ভাগটাই চাষিদের কাছ থেকে আদায় করবার প্রস্তাব হয়েছে। প্রস্তাবিত উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করা কিন্তু অনেকে যুক্তি সংগত বিবেচনা করেন না। কারণ ওই টাকা আদায় করতে গিয়ে আইনের কঠোরতা প্রয়োগ করে অনেক সময় কৃষকদের জমি জায়গা হস্তচ্যুত হবার সম্ভাবনা আছে। প্রস্তাবটি ভালো, আইনে পরিণত হবে কিনা তা বলা যায় না। হলেও আইনানুযায়ী কাজ আরম্ভ হতে অনেক সময় লাগবে। স্কুলগৃহ নির্মাণ করা, শিক্ষক প্রস্তুত করা প্রভৃতি সহস্রাধিক বিষয় খুঁটিনাটিভাবে বিচার আরম্ভ হবে। সকলেই জানেন যে গভর্নমেন্টের কাজ কী রকম মন্থর গতিতে চলে। যাহাই হোক আমাদের গভর্নমেন্টের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকা দরকার তা মনে হয় না। আমাদের কর্তব্য কী ? আমার মনে হয় না যে আমাদের মনীষীগণ এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করেছেন। গোখলে মহাশয় যদিও অনেক চিন্তা করে প্রাথমিক শিক্ষার সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রস্তাবে গলদ ছিল যে তিনি আমাদের বৈদেশিক শাসনকর্তাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করবার চেষ্টায় ছিলেন। গভর্নমেন্টের কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকলে কোনো কর্ম এগোবে না। আমাদের নিজের হাতে দেশের মঙ্গল কার্যের ভার গ্রহণ করতে হবে।

বহুকাল থেকে আমি দেশব্যাপী জনসাধারণের, বিশেষত বালিকাদের শিক্ষার জন্য চিন্তা করে আসছি। কিন্তু এরূপ সংকট অবস্থায় এই গুরুতর কার্য কী প্রকারে করতে পারা যাবে তার কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। মার্কিন দেশের শিক্ষা প্রণালী দেখে শুনে আমার পূর্ব আগ্রহ পুনরায় সজাগ হয়ে উঠল। বোস্টন শহরে অবস্থানকালে আমি এবিষয়ে আদ্যোপান্ত চিন্তা করে শিক্ষাহীনতার প্রতিকারের কয়েকটি উপায় স্থির করি এবং দেশে পাঠাইয়া দিই।

আমার এই শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাব ভারতের সর্বত্র সমানভাবে কাজ করতে

পারবে। আধুনিক উন্নত প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা ব্যয়-সাধ্য। আমাদের দেখতে হবে অন্তত সকলে লিখতে পড়তে পারে, খবরের কাগজটা পড়ে দেশের অবস্থা বুঝতে পারে, আর নিজের টাকা পয়সার হিসেব রাখতে পারে, এর অধিক এখন দরকার নাই। জাপানে শতকরা ৯৯ জন লিখতে পড়তে পারে। পারস্য, আফগান ও চিন সকলেই নিজের নিজের দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীভূত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন, আমরাই সব বিষয়ে পশ্চাতে কেন পড়ে থাকি?

আমার Scheme বা প্রণালী অনুযায়ী ভারতের প্রত্যেক প্রভিন্সে বা প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক শিক্ষা-বিস্তার-সমিতি স্থাপন করতে হবে। এই প্রাদেশিক সমিতিতে ১০ থেকে ২০ জন স্ত্রী ও পুরুষ সভ্য, সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও কার্য পরিচালক থাকবে। ক্ষমতাসম্পন্ন, স্বদেশ হিতাকাঙ্ক্ষী, কর্মোৎসাহী ব্যক্তিকে সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষের পদে নির্বাচন করতে হবে। প্রত্যেক প্রদেশের রাজধানীতে এইরূপ এক একটি স্থায়ী সমিতি স্থাপন করতে হবে। Local Self government act অনুযায়ী স্থাপিত যে Union Board আছে সেই Union Board এর অধীনস্থ গ্রাম লইয়া এক একটি (Union Education Committee) বা 'গ্রাম্য-শিক্ষাসমিতি' গঠিত করা হবে। এই কমিটির সভাপতি ও সভ্য সকলকেই বিশেষ দেশহিতৈষী কর্মপটু লোক দেখে নির্বাচন করতে হবে। এই গ্রাম্য সমিতির গঠনে (Union Board) এবং আরও অন্যান্য সরকারি বেসরকারি সভা সমিতির সহিত পরামর্শ করতে হবে।

গ্রাম্য সমিতির কর্তব্য হবে, উহার অধীনের গ্রামগুলির তত্ত্বাবধান করা, এক গ্রামে একটি পাঠশালায় সমস্ত ছেলেমেয়ের সংকুলান না হলে আর একটি গৃহ স্থাপন করা অথবা দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করা, চেষ্টা করে গ্রামের সব ছেলেমেয়েকে পড়তে পাঠান, পড়বার সময় নিরূপণ করা। অনেক চাষিরা ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে বড়োই নারাজ। তারা বলে যে ছেলে পড়তেই স্কুলে যাবে তো আমার গোরু বাছুর কে চরিয়ে আনবে ; ইত্যাদি অনেক প্রকার আপত্তি তোলে। সেই গোরু বাছুর চরাবার সময়টা রেখে, পড়বার অন্য কোনো সময় স্থির করা ইত্যাদি।

পল্লিগ্রামে ছোটো ছেলেমেয়ের এক সঙ্গে লেখাপড়া শিখতে বিশেষ আপত্তি হবে না। যদি কোনো গ্রামে বিশেষ করে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের আবশ্যক হয় এবং তা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য গ্রামবাসীদের নিকট হতেই কিছু সাহায্য পাওয়া যায়, তাহলে গ্রাম্য সমিতি বিশেষ চেষ্টা করে তা স্থাপন করে দেবে। সর্বত্র ভালো শিক্ষয়িত্রী দ্বারা শিক্ষা কার্য চালাতে হবে। শিক্ষয়িত্রীর নিতান্ত অভাবে শিক্ষক

রাখতে হবে।

আমাদের গভর্নমেন্টের মানসিক গতি হচ্ছে একটি কার্যের প্রস্তাবনা হলে সে বিষয়ের টাকার হিসাবটি প্রথমে খতাতে বসেন। অর্থাৎ উহার জন্য বড়ো বড়ো বাটী নির্মাণ ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের বাহ্যিক আড়ম্বরে বহু অর্থের প্রয়োজনীয়তা দেখান, তার ফলে সে কার্য সাধনে অনেক বিলম্ব হয়ে যায়, নয়তো একেবারে হয় না।

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে অর্থের অকুলানের দোহাই দিয়ে ব্যর্থ না হয় তাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। সেইদিকে গ্রাম্য সমিতিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। এমনভাবে কার্য পরিচালনা করতে হবে যে অর্থের আবশ্যক হবে না কিম্বা যৎসামান্য অর্থের দ্বারা কাজ চলবে।

প্রত্যেক গ্রামে কোনো ধনী গৃহস্থ কী গ্রামের জমিদারের কিংবা মোড়লের চণ্ডীমণ্ডপে প্রত্যহ দু-চার ঘণ্টার জন্য বিদ্যালয়ের কাজ চালাতে হবে। রৌদ্র বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য অবশ্য একটা আশ্রয় চাই। বর্ষার দু-তিন মাস ছাড়া গ্রামের মাঝখানে কারুর বাগানে বড়ো গাছের ছায়ায় বসেও ছেলেমেয়েরা পড়তে পারে। কোনো গ্রামে নিতান্ত কারুর চণ্ডীমণ্ডপ না পাওয়া গেলে একটি টিনের কিংবা খাপ্‌রুলের ছাউনি করতে হবে। গ্রামবাসী সকলের নিকট ওর জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে হবে। যে নিতান্ত গরিব তার নিকট পরিশ্রম সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। গ্রাম থেকে চাঁদা তুলেও যদি কিছু অকুলান হয় তো গ্রাম্য সমিতি প্রাদেশিক সমিতিকে আবেদন করবে। ওই ছাউনির জন্য তখন একটু জমির প্রয়োজন হবে। তা জমিদারের কিংবা গ্রামের সংগতিপন্ন চাষির নিকট থেকে জোগাড় করতে হবে। অনেক গ্রামে পতিত জমিও পাওয়া যায়।

আজকালকার এই ঘোর আর্থিক দুরবস্থার দিনে কারুর নিকট বিনা পয়সায় কাজ লওয়া উচিত বিবেচনা করি না। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই অমন অনেক স্ত্রী ও পুরুষ দেখা যায় যাঁদের বিশেষ কোনো অর্থাভাব বা পেটের চিন্তা নাই এবং তারা সর্বদাই গ্রামের মঙ্গলের বিষয়ে মনোযোগী। যাতে তাঁরা স্ব-ইচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে দেশ-হিতকর কর্মে ব্রতী হতে প্রস্তুত হয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, গ্রাম্য সমিতিকে সেই চেষ্টা প্রথমে করতে হবে। ওরূপ শিক্ষক যেখানে না পাওয়া যাবে সেখানে আমরা মুষ্টি ভিক্ষার ব্যবস্থা এবং ৫ বিঘা করে জমি শিক্ষকের জন্য ব্যবস্থা করতে চাই।

পল্লিগ্রামে টাকা পয়সার অনটন। চাষিরা যেখানে দুইটা পয়সা খরচ করতে

দু-বার ভাববে, সে স্কুলে তার চারগুণ মূল্যের ক্ষেত্রজাত দ্রব্য বিনা বাক্যব্যয়ে দান করে দেবে। সেইজন্য স্কুলের মাহিনা স্বরূপ প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ১ মুঠা করে চাউল কিংবা দাইল হপ্তায় একসের হিসাবে দেবে। উহা থেকে শিক্ষকের দৈনিক খরচের যোগাড় হবে এবং শিক্ষকের অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের জন্য আমরা ৫ বিঘা করে জমি জমিদারদের নিকট থেকে স্থির করে দিতে চাই। গ্রামের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক জমিদারেরই ওই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া চাই। তাঁরা প্রজাদের অর্থে শহরে বসে দিব্যি আরামে দিন কাটাচ্ছেন। প্রজাদের শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁদেরই প্রথমে করা উচিত। শিক্ষকের প্রতিপালনের জন্য বিঘা পাঁচ করে জমি যদি তাঁরা নিজের নিজের গ্রামে ব্যবস্থা করে দেন, তা হলে গ্রামের অনেক উপকার করা হবে। পূর্বে প্রজারা ধান চাল সাহায্য দিয়ে কত বড়ো বড়ো মন্দিরাদি নির্মাণ বিষয়ে জমিদারদের সাহায্য করেছে ; এখনও পল্লিগ্রামে ভিক্ষা না দিয়ে অনেকে জল গ্রহণ করেন না। গুরু মহাশয় কী মাস্টার মহাশয়-এর জন্য ঝুলিতে দু এক মুঠা চাল রাখতে কোনো গৃহস্থই ইতস্তত করবে না।

প্রত্যেক শিক্ষকের অধীনে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনার অধিক ছেলে থাকবে না।

গ্রাম্য সমিতির তত্ত্বাবধানের ভার প্রাদেশিক সমিতির উপর ; এই প্রতিষ্ঠানের সফলতা, গ্রাম্য শিক্ষা-সমিতির প্রত্যেক সভ্যের উদ্যম, স্বদেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগের উপর নির্ভর করেছে। তাঁরা গ্রামের লোক; সুতরাং গ্রামের সুখ দুঃখ অভাব অনটন সবই তাদের জানা আছে। এরূপ ব্যক্তিকে সমিতির অধ্যক্ষের পদে নির্বাচন করতে হবে, যাঁর গ্রামে বেশ প্রতিপত্তি আছে। ইহারা সকলে যদি গ্রামের অভাব মোচনে আত্মনিয়োগ করেন তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রত্যেক গ্রামের শিক্ষালয়ের জন্য কারুর মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

বঙ্গদেশের কথা বলতে গেলে আমার দুঃখের সহিত স্বীকার করতে হয় যে আমাদের পল্লিসমাজে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার বড়োই অভাব। গ্রাম্য দ্বন্দ্ব, হিংসা, দ্বেষ, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি কারণগুলির জন্য গ্রামবাসীরা আত্মোন্নতি বিষয়ে বড়োই উদাসীন। এইজন্য প্রাদেশিক সমিতিকে নানা উপায়ে, যেমন কাগজে লিখে, পুস্তকাদি বিতরণ করে, উহাদের স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে হবে,তাদের কাজে উৎসাহান্বিত করতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে গ্রামের মঙ্গলে দেশের মঙ্গল। ভারতবর্ষে শতকরা আশি জন গ্রামে বাস করে। দ্বেষ, হিংসা, স্বাস্থ্যহীনতায় গ্রাম উৎসন্নে গেলে সমগ্র জাতির বিনাশ আরম্ভ হবে। বিদ্যার অভাবে বুদ্ধির বিকাশ হয় না, বুদ্ধি কলুষিত হয় ; সেই বুদ্ধিকে মার্জিত করতে বিদ্যার আবশ্যক। ইহাতেই

সমস্ত জাতির উন্নতি হবে।

অবশ্য এ গুরুতর কার্যে অগ্রসর হতে গেলে কিছু টাকার প্রয়োজন নিশ্চিত। বিনা খরচে শিক্ষা বিস্তার করাই যদিও আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু অফিস রাখা, চিঠিপত্রাদি ছাপানো, প্রাদেশিক সমিতির সভ্যদের সময় সময় গ্রাম্য পাঠশালা পরিদর্শন, ইত্যাদি বহুপ্রকার খরচ আছে। এরূপ একটি দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানের নিমিত্ত অর্থের নিশ্চয় কিছু আবশ্যক আছে। প্রাদেশিক সমিতির প্রধান কর্তব্য হবে, দেশকে জাগিয়ে দেওয়া, গ্রাম্য সমিতি গঠন করা এবং অর্থ সংগ্রহ করা। আমার বোধ হয় আপাতত প্রত্যেক প্রভিন্সে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। প্রাদেশিক সমিতিকে, চিন্তা করে এই অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। আমার অনুরোধ এই যে, এই সামান্য অর্থের অভাবে এই মহান উদ্দেশ্যপূর্ণ কার্য নিষ্ফল না হয়। এই সৎকার্যের জন্য আমাদের ধনীগণ হাতের মুঠো খুলে দিতে অগ্রসর হউন। দেশের সমগ্র বালক বালিকাকে বিদ্যা দান করা রূপ মহোচ্চ কর্মে প্রত্যেক শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী ও নির্ধন সকলের যোগদান করা উচিত। পণ্ডিত মালব্যের একনিষ্ঠতা, ধৈর্য ও পরিশ্রমের ফলে কাশীর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম। বঙ্গদেশে তো অনেক সৎকর্মী আছেন। তাঁরা অগ্রসর হয়ে এই কর্ম আরম্ভ করুন। আমাদের এই মহান কাজে এক লাখ টাকারও যে প্রয়োজন হবে তা মনে হয় না। টাকার দিকে অধিক দৃষ্টি না রেখে সুব্যবস্থার উপরই মনোযোগ দিতে হবে।

আমি আমার সমস্ত সময় ও মানসিক শক্তি আমার দেশমাতৃকার কার্যে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি। কেবল কয়েকজন উৎসাহী কর্মীর সহায়তা লাভ করতে চাই। যদি দেশের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলে, পরস্পরের সহযোগিতায় দৃঢ় মনে সমগ্র জাতির কল্যাণের নিমিত্ত, এই কর্মে অবতরণ করা যায় তা হলে খুব সম্ভব আমরা এই কার্যে সফল হতে পারব। আমাদের সমস্ত মানসিক শক্তি এই শুভ কার্যের জন্য প্রয়োগ করে দৃঢ়তার সঙ্গে এ কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে তা হলে মঙ্গলময় পরমেশ্বরও নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন।

# আধুনিক ছাত্রজীবন

## স্বাস্থ্যাভাব

বর্তমানকালে বঙ্গদেশের ছাত্রজীবনে অজীর্ণ, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুঃসাধ্য ব্যাধির প্রভাব ও অকাল মৃত্যু দেশের সকলেরই ঘোর চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

শতবর্ষের পূর্বের বঙ্গদেশের লোকদের সেই দীর্ঘ ও প্রশস্ত সুস্থ সরল বলিষ্ঠ দেহ ও গৌরকান্তি, যাহার যথেষ্ট বর্ণনা ইংরেজ লিখিত গ্রন্থেও দেখা যায় , তাহা আজকাল চক্ষে পড়ে না। উহার পরিবর্তে, চক্ষে চশমা দেওয়া. বক্ষদেশ ভিতরদিকে প্রবিষ্ট, পৃষ্ঠ ধনুকের ন্যায়, একদল জীবের আবির্ভাব দেখা যায় ; ইহারা কি সেই বাঙালি আমাদের নিজেদের মধ্যেই যেন সন্দেহ উপস্থিত হয়।

আমরা অদৃষ্টবাদী হিন্দু জাতি, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ভগবান-প্রদত্ত বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে ভালোবাসি, কিন্তু বাল্যকালে একবার কথকতায় শুনিয়াছিলাম যে, দুর্যোধন দ্রৌপদীকে বাম উরুদেশ দর্শন করাইবার ফলে ভীম সভাস্থলে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে দুর্যোধনের সেই উরু ভগ্ন করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহা করিতে না পারায় তিনি নির্জনে বসিয়া বিলাপ করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তথায় আসিয়া ভীমের বিলাপের কারণ শুনিয়া তাঁহাদের কর্ম করিতে উৎসাহ দিয়া কহিলেন যে, তুমি কর্ম কর তবে আমি তোমায় সাহায্য করিব। শুধু রোদন করিলে তোমার কর্ম সিদ্ধ হইবে না! যে কর্ম করে তাহাকে ভগবান সহায়তা করেন। বাল্যকালে শোনা কথা হৃদয়ে গাঁথিয়া গিয়াছে। ইংরেজিতেও ওই একই প্রকারের একটি কথা আছে। আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের অবনতির জন্যও আমরাই অধিক দোষী এবং উহার সংশোধন আমাদেরই উপর অধিক নির্ভর করিতেছে। লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার পুত্রটি ভবিষ্যতে উপার্জন করিয়া সংসারের সকল অকুলান কুলাইয়া

দিবে, এই আশা করিয়া বঙ্গীয় মাতা, পুত্রের বাল্যকাল হইতে পুত্রকে পড়াইবার জন্য যেরূপ ব্যগ্র হন, যদি তাহার অর্ধেকও তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে বোধ হয়, সেই পুত্র উপার্জনকারী হইয়াও সকলকে কাঁদাইয়া অকালে পরলোকগমন করিত না।

ভগবানের এই বিস্তীর্ণ রাজ্যে প্রায় সকল জাতিই আত্মপ্রয়াসে নিজ নিজ দেশের স্বাস্থের উন্নতি করিয়াছে। মৃত্যুর হারও অনেক কমিয়া গিয়াছে। আমরা কিন্তু অদৃষ্টকে দোষ দিয়া দিব্য বসিয়া দেখিতেছি, নিত্য আমাদের শত শত শিশু, বালক ও যুবকগণ অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। ওলাউঠা ও প্লেগের ন্যায় কোনো একটা রোগ শহরে একবার দেখা দিলে হয়—তারপর দেশীয়দের মধ্যে দৈনিক শত শত মৃত্যু। শহরে প্রবাসী ছাত্রদের মধ্যে হুলস্থূল বাধিয়া যায়। প্রত্যহ অনুপস্থিতির বাহুল্যবশত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ অবশেষে বিদ্যালয় সকল বন্ধ করিয়া দিতে ব্যধ্য হয়েন।

দেশে সাধারণ দারিদ্র্যতা হেতু সব পরিবারেই অল্পবিস্তর অনটন আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বালক বালিকারা শরীর ও মনের পুষ্টিকর উপযুক্ত খাদ্য আহার করিতে পায় না। তারপর বহু ছাত্র বিদ্যাশিক্ষার জন্য শহরে আসিয়া ছাত্রাবাসেই থাকে। ওই ছাত্রাবাসগুলির খাদ্য সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়া আসিতেছি, তাহা খাইয়া পূর্ব হইতেই উহারা ভগ্নস্বাস্থ্য বা দুর্বলদেহ হইয়া থাকে ; পরে, দেশে কোনো একটি ব্যাধির আবির্ভাব হইলে উহাদের জীবনী শক্তি বাহিরের আক্রমণকারী শত্রুর সহিত যুঝিতে পারে না।

পূর্বে বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ খাদ্য আহার ও উন্নত নৈতিক জীবন যাপন দ্বারা দেশীয়গণ সাধারণত সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হইতেন। বর্তমান সময়ে বিশুদ্ধ খাদ্যের তো বিশেষই অভাব, তারপর, বারমাসিক ম্যালেরিয়া ছাড়িয়া দিলেও কোনো না কোনো মহামারি দেশে লাগিয়াই আছে। পূর্বে মহামারির প্রাদুর্ভাব এত সুদূরকাল ব্যবধানে ক্বচিৎ হইত যে কোনো গ্রামে কোনো মহামারির প্রাদুর্ভাব হইলে তথাকার লোকে মনে করিত যে তাহাদের নিজেদের কোনোও বিশেষ দোষেই ভগবানের কোপদৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আমাদের সুশিক্ষা ধর্মশিক্ষার অভাব, নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি উদাসীনভাব প্রভৃতি বহু কারণে এই বঙ্গভূমি আর পূর্বের সে দেশ নাই—নানাপ্রকার রোগের বাসভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেই হয়।

ভারতীয় ছাত্রদিগের সু বা সৎশিক্ষা কোথায়? সুশিক্ষা বলিলে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিই বোঝায় না। যে শিক্ষা দ্বারা নিজের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি, নিজের

সমাজের ও দেশের এবং সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল করা যায় তাহাই সুশিক্ষা।

ছাত্রজীবনে শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলি এই—

নৈতিক জীবন বা ব্রহ্মচর্যের অভাব ;

বাল্যবিবাহ ;

বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ;

পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শিক্ষার তাড়না ;

ব্যায়ামের অভাব ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস। আমরা একে একে এই কারণগুলি আলোচনা করিতে চেষ্টা করির।

দেড়শত বৎসর পূর্বে লন্ডনে হাজারে ৮০ জন লোকের মৃত্যু হইত। কিন্তু এক্ষণে ওই শহরের কত পরিবর্তন হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতরই মৃত্যুসংখ্যার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষিত বঙ্গবাসী তাহার উচ্চশিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান দ্বারা দীর্ঘায়ু হইবার পরিবর্তে শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীদের অপেক্ষা বহুপূর্বেই ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানবিৎদিগের মতে প্রায় শতকরা ৫০ জন ছাত্র যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগের বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত। বাকি প্রায় ৪০/৪৫ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া ৫০/৬০ বৎসরের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

## ব্রহ্মচর্য ও নৈতিক জীবনের অভাব

কলিকাতার শহরে যত ছাত্র আছে তাহার অধিকাংশ প্রায় মফঃস্বল হইতে আমদানি করা বলা যাইতে পারে।

মফঃস্বলের বালকেরা তথাকার হাই স্কুলের কার্য শেষ করিয়া কলিকাতার কোনো কলেজে প্রবেশ করিতে পারিলে জীবন সার্থক জ্ঞান করে। শহরে আসিয়া উহাদের প্রায় কলেজ সংলগ্ন ছাত্রাবাসেই থাকিতে হয়। পল্লীগ্রামের সরল-হৃদয় ছাত্রেরা শহরের ন্যায় কুটিল কুনীতিপূর্ণ স্থানে আসিয়া নিজেকে সামলাইয়া চলিতে পারে না। সঙ্গী বা বন্ধু নির্বাচনেও ভুল করে এবং অনেক সময়েই অসৎ বন্ধুদিগের সংসর্গে পড়িয়া জীবন বিষময় করিয়া তোলে।

শহরে অনেক দোষের মধ্যে বায়োস্কোপ দেখাটাও একটা দোষের মধ্যে গণ্য করা যায়। ইহা ছাত্রদিগের মধ্যে বিশেষ হানিজনক বলিয়া উল্লেখ না করিয়া

থাকিতে পারিলাম না। ছেলেরা জলপানির পয়সা বাঁচাইয়াও বায়োস্কোপ দেখিতে যাইবে। প্রত্যেক শনিবারে তো যাওয়া চাই-ই। তারপর থিয়েটার, সার্কাস প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের গৃহ যত আছে, সে সবই ছাত্রদের অর্থদ্বারা পরিপুষ্ট হয়। বায়োস্কোপের ঐতিহাসিক চিত্রগুলি বাদে স্ত্রীপুরুষের সংমিশ্রণ বা প্রেমের চিত্রগুলি অল্পমতি কিশোর বয়স্ক বালকদের দেখিবার একেবারেই অযোগ্য। অবশ্য আমরা ছাত্রদিগকে আমোদ-প্রমোদবিহীন, কিংম্বা 'সমস্তই কর্ম, খেলা মোটেই নয়' এ বাক্য মানিয়া চলিতে বলিতেছি না। নির্দোষ আমোদ শরীর ও মন উভয়েরই জন্য বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু যে বয়সে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া শরীর ও মনকে পবিত্র রাখা অতিশয় প্রয়োজনীয়, সেইকালে ওই সকল জীবন্ত চিত্রের লজ্জাকর আচরণ অল্পমতি ছাত্রদের চিত্ত দুর্বল করিয়া দেয় তাহাতে সন্দেহ নাই। তারপর বায়োস্কোপ দেখাটা চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিরও হানিকর।

আজকাল অভিভাবকগণ তাঁহাদের বালকদের কেবল পার্থিব বা অর্থকরী শিক্ষার জন্য লালায়িত হইয়া উহাদের ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় শিশুহৃদয়ে ধর্মবিশ্বাস, ধর্মের আচরণ ব্যবস্থাদি শিক্ষা দিতে যত্নবান। শিশুকালে যাহা শুনা যায়, যাহা শিক্ষা করা যায়, তাহা প্রায় চিরকাল আমাদের জীবনের উপর অল্পবিস্তর শক্তি পরিচালনা করে। আধুনিক সভ্যভাবাপন্ন অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্গীয় হিন্দুর গৃহে সন্তানের ধর্মশিক্ষার কোনো সুব্যবস্থা নাই।

ছাত্রদিগের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে প্রায় কোনো প্রকার আলোচনা হয় না। হিন্দুধর্ম যে কী বস্তু তাহা কেহই সঠিক বলিতে পারিবে না। রাজা বিদেশি ও বিধর্মী। কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন না বা কাহাকেও ধর্মশিক্ষা দানও করেন না। বিদ্যালয়ে যখন ধর্মশিক্ষা হইতে পারে না, তখন প্রত্যেক পরিবারে মাতাপিতার প্রধান কর্তব্য সন্তানদিগকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া ; উহাদের সহিত ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করা ; প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ঈশ্বরের পূজায় বসানো ; সত্য কথা কহিতে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া ; চৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাপুরুষদের চরিত্র কথা আলোচনা করিয়া উহাদের কোমল হৃদয়ে ভগবানের প্রতি প্রেম উদ্রেক করিয়া দেওয়া।

১৫/১৬ বৎসর বয়স কাল, যখন বালক অবস্থা হইতে যৌবনের সীমায় পদার্পণ করে সেই সময়টি বালকদিগের বড়োই পরীক্ষার সময়। ওই সময় অভিভাবকদিগের বিশেষ কর্তব্য উহাদিগকে অসৎ সঙ্গ হইতে রক্ষা করা, জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মচর্য

পালন করিতে উপদেশ দেওয়া। এই ব্রহ্মচর্য পালনের অভাব প্রধানত ছাত্রজীবন ধ্বংস করিতেছে তাহা সকলেই বুঝিয়াছেন।

বিদ্যালয় নৈতিক শিক্ষার প্রশস্ত স্থান। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা লাভ হইলে ভবিষ্যতে ছাত্রজীবনে মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিবে।

নীতিশিক্ষা উপদেশের সহিত কার্যে দেখাইলে আরও অধিক ফল হয়। ইহার জন্য ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় শিক্ষকের কথাবার্তা লেখা অবধি বালকগণ অনুকরণ করে। এই কারণেই মিশনারি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে পাশ্চাত্যভাবের একটু আধিক্য। উহারা নিজের ধর্ম অপেক্ষা বিজাতীয় ধর্ম সম্বন্ধে অধিক অবগত থাকে।

প্রত্যেক বালকের নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা এ দুইটিরই বিশেষরূপ প্রয়োজন। ইহার অভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে অবনতি হইতেছে। ভিত্তিহীন গৃহের ন্যায় ধর্মশিক্ষাবিহীন বিদ্যাশিক্ষা। ভগবানে ভক্তি ও অনুরাগ, মনুষ্যজীবনকে সর্বদা সৎপথে চালনা করে। তাহার অভাবে যাহারা আমাদের ভবিষ্যতের আশাভরসা, সেই ছাত্রদের মধ্যে অনেক অবনতি আনয়ন করিতেছে।

# শিক্ষার তাড়না

রায় বাহাদুর চুনিলাল বসু মহাশয় তাঁহার 'হেল্‌থ অব ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস্' পুস্তকে বলিয়াছেন যে, বঙ্গীয় ছাত্রদের ন্যায় দৈহিক অবনতি অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। ইহা একটি অকাট্য সত্য। ব্রহ্মচর্যের অভাব ও বাল্যবিবাহ এবং এই দুইটির সহিত আধুনিক পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শিক্ষার তাড়নাও যে ইহার আর একটি বিশেষ কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই।

পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বীয় নামটি উচ্চ স্থানে রাখিবার নিমিত্ত ছাত্রেরা মস্তিষ্ককে লইয়া যে ঘোড়দৌড় খেলায়, তাহার ফলে তাহাদের আজ এই শীর্ণ দশা উপস্থিত।

যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু কৃতকার্যতা দেখাইয়াছে ; তাহারা প্রায় অনেকেই ভবিষ্যৎ জীবন-যুদ্ধে আর সেরূপ সিদ্ধকাম হইতে পারে নাই। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ অতিশয় স্বাভাবিক। পাঠ্যাবস্থায় মস্তিষ্কের চালনায় উহার শক্তিক্ষয় খুবই হয়। ফলে মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইয়া যায় ; সেই সঙ্গে সমস্ত দেহের মধ্যেও এমন একটা অবসাদ আসিয়া পড়ে যে, যে শক্তি ও যে উদ্যমে পাঠ্যকালে ছাত্র এত সম্মানলাভ করিয়াছিল, সে শক্তি সে উদ্যম কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ছাত্রদের মৌলিক বা উদ্ভাবন সাপেক্ষ কর্ম করিবার শক্তিও লোপ পাইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে আপন জীবিকাবৃত্তি-উপায়কালেও প্রতিভা দেখাইতে পারে না।

শরীর রক্ষার জন্য অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় স্নান, আহার, নিদ্রা ও ব্যায়াম ইত্যাদিও অনেক ছাত্রের স্মরণে থাকে না অথবা নিয়মিত সময়ে করিতে অবহেলা করে। তাহারা প্রায় বদ্ধ ঘরে বদ্ধ হাওয়ায় দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় পাঠে ব্যস্ত থাকিয়া কাটায়। প্রকৃতি এই ঘোর অবহেলা কখনও নীরবে সহ্য করে না, সর্বদা

সুযোগ অন্বেষণ করে তাহার প্রতি এই অবহেলার প্রতিশোধ তুলিতে। এ জন্য যে উহার অধিক কাল অপেক্ষা করিতে হয়, তাহাও বোধ হয় না।

উচ্চ সম্মানাকাঙ্ক্ষী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয়তম যুবকবৃন্দ অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম দ্বারা মস্তিষ্কের বল ক্ষয় করিয়া ফেলে ; কিন্তু শীঘ্র দীর্ঘ বিশ্রাম, পুষ্টিকর আহার ও রসায়ন ঔষধের দ্বারা উহার জীর্ণ সংস্কার না হইলে চিরকালের নিমিত্ত উহা নিস্তেজ হইয়া যায়। দেহের মধ্যে মস্তিষ্ক প্রধান যন্ত্র। ইহা নিস্তেজ হইয়া পড়িলে অন্যান্য সমুদয় যন্ত্রগুলির মধ্যে গোলযোগ আসিয়া পড়ে।

এই ছাত্রজীবন শরীর ও মন উভয়েরই পূর্ণতা লাভ করিবার সময়—যাহাকে আমরা চলিত কথায় 'উঠতি বয়স' বলি। এই সময় ব্যায়াম, মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ, পুষ্টিকর খাদ্য আহার, নির্দোষ আমোদ ও নিয়মিত পাঠ অভ্যাস প্রভৃতি দ্বারা স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন রাখিয়া শরীর যাহাতে বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে তাহার দিকেও লক্ষ রাখা চাই। এইকালে পুস্তক ভারে প্রপীড়িত হইয়া স্বাস্থ্যকে অবহেলা করিয়া আমাদের উপস্থিত বংশধরগণ অল্পায়ু ও খর্বাকৃতি বামন অবতার হইয়া দাঁড়াইতেছে।

প্রত্যেক বিষয়েরই একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলেই গোল বাধিবার ভয়। কোনো একটি বিষয়ে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব না দেখাইয়া যদি প্রত্যেক ছাত্র দিবসের চব্বিশ ঘণ্টাকে পাঠ, আহার, নিদ্রা ও ব্যায়াম ইত্যাদির জন্য নিয়মপূর্বক বিভক্ত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে পরীক্ষাগুলি অনেক সহজ সাধ্য হইয়া আসে। অবশ্য প্রথমে এই নিয়মানুযায়ী দৈনিক কর্মগুলি সাধন করা একটু দুরূহ বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু "অভ্যাস মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব" এই বাক্যের সার্থকতা সপ্রমাণ হইবে যদি একটু ক্লেশ স্বীকারপূর্বক ছাত্রেরা এইরূপ নিয়মমতো কার্য করিতে অভ্যাস করে। উহা ক্রমশ এরূপভাবে প্রকৃতিগত হইয়া যায় যে, অন্যভাবে চলাফেরা ক্লেশকর হইয়া উঠে।

ছাত্রজীবনে আরও একটি দোষ আছে তাহা না বলিয়া থাকা যায় না । ওই দোষে যে বঙ্গীয় ছাত্রদের বহু অবনতি হইতেছে তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। সমস্ত বৎসরটি উত্তেজনা পূর্ণ উপন্যাস-পাঠ, বায়োস্কোপ ও থিয়েটার দেখিয়া এবং গল্প গুজবে কাটাইয়া দেওয়া হয়। পরে পরীক্ষা নিকটবর্তী হইলে আহার-নিদ্রা ত্যাগ ও হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়া কোনোক্রমে 'পাস' হইয়া যায়, কেহ বা 'ফেল' ও হয়। অবশ্য উত্তীর্ণ হইলে অনেক আস্ফালন করে যে, 'আমি দু-এক ঘণ্টার বেশি রোজ রাতে ঘুমাই নাই ; আর দু-বছরের পড়া বোধ হয় দু-মাসে পড়ে পাস হয়েছি' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের বিবেচনায় ইহাতে গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। ওইরূপ তাড়াহুড়ো ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বইয়ের পাতাগুলি উলটাইযা পালটাইয়া কোনো এক প্রকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাবটি ধারণ করিতে পারিলেই কি প্রকৃত বিদ্যালাভ হয়? তাহা তো আমাদের মনে হয় না। এইরূপ পাঠের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী যুবকগণের 'বি-এ, এম-এ পাস দিয়াও এক কলম ইংরেজি লিখিতে পারে না' ইত্যাদিরূপ সুনাম শোনা যায়; আর চশমার সঙ্গেও ছাত্রদের এত ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা দেখা যায়। বৎসরের প্রারম্ভ হইতে নিয়মিতভাবে পড়িলে পরীক্ষার সময় কখনই রাত্রি জাগিয়া পড়িতে হয় না। রাত্রি এগারোটার পর পড়া আপনার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাহারও আদৌ উচিত নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি, থিয়েটার বায়োস্কোপ প্রভৃতি সাধারণ আমোদ প্রমোদের স্থানগুলি ছাত্রজীবনে যেমন বিষবৎ পরিত্যাজ্য, সেইরূপ সংগীতচর্চা, টেনিস, ক্রিকেট, ফুটবল এবং দেশীয় বহু প্রকার খেলা কিংবা অল্প স্বল্প ব্যায়াম, সন্তরণ এবং নিজেদের মধ্যে উৎকৃষ্ট নাট্য অভিনয়াদি ও কাব্য পাঠরূপ নির্দোষ আমোদের দ্বারা শরীর, মন ও মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেওয়াও অতি অবশ্য কর্তব্য। ছাত্রগণ অতিরিক্তভাবে পাঠে নিমজ্জিত হইবার জন্য শুধু উহাদিগকেই দোষারোপ করা যায় না। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের পুস্তক-তালিকা দেখিলে শরীরে ঘর্ম উপস্থিত হয়! বাড়ির সামনে দিয়ে যখন বালকের দলকে একগাদা পুস্তক বগলে করিয়া বিদ্যালয়ে বিলম্ব হইবার ভয়ে দ্রুত যাইতে দেখি, তখন আমার হৃদয়ে মহাশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, কী করিয়া ওই শিশু মস্তিষ্কে অতগুলি বহির বিষণ্ণ সংকুলান হইবে? ছোটো ছোটো বালকদের ভিন্ন প্রকারের এত অধিক বিষয় পড়িতে হয়, আবার এক একটি বিষয়ে এত অধিক বহি যে, বাধ্য হইয়াই কোমল মস্তিষ্ক বালকদিগকে খেলাধূলা ত্যাগ করিয়া পুস্তকের কীট হইতে হয়। এইরূপ শিক্ষার তাড়নায় ছাত্রদের শিশুকাল হইতে দৈহিক অবনতি আরম্ভ হয়; সুতরাং এইরূপ শিক্ষার অতি শীঘ্র সংশোধন আবশ্যক তাহা সকলেই বলিবেন।

# বাল্যবিবাহ

মনুষ্য জীবনে বিবাহ-ব্যাপারটি এক অতি গুরুতর বিষয়। যে যুবা বিবাহ করিতেছে, সে ভবিষ্যতে স্ত্রী-পুত্র পালন করিতে পারিবে কি না, তাহার হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা হইলে উহারা কীরূপ অবস্থায় থাকিবে এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিবাহ করা উচিত। ভারতবাসী হিন্দু-দিগের ইহা আরও ভাবনার বিষয়, কারণ আমাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ নাই। পতি যেমন হউক না কেন, আজীবন স্ত্রীর তাহাকেই মানিয়া চলিতে হইবে। বিবাহ রাত্রেই বালক পতির মৃত্যু হইলে বালিকা পত্নীকে চির বৈধব্যে কাল কাটাইতে হইবে।

ছাত্রাবস্থায় বহু বালকের বিবাহ হইয়া যায় এবং অনতিকাল মধ্যে তাহাদের দু-একটি সন্তানের জন্ম হয়। আবার এই সময়ে অনেকেরই উপর সংসারের ভারও পড়ে। তখন তাহারা সংসারচিন্তায় এরূপ জড়িত হইয়া পড়ে যে, জীবনে উহাদের দ্বারা যে সব উচ্চ কর্ম সাধিত হইতে পারিত তাহা আর ঘটিয়া উঠে না।

বালক পিতার ঔরসে এবং বালিকা মাতার গর্ভে জন্মিয়া শিশুগুলি স্বভাবত ক্ষীণজীবী হয় এবং এই জন্য প্রায়ই বালিকা বয়সের মাতার প্রথম সন্তান বাঁচে না। যাহাদের নিজেদের দেহই পূর্ণতা লাভ করে নাই এরূপ পিতা-মাতার সন্তান যে অল্পায়ু হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী?

এই বাল্যবিবাহের কারণে আমাদের দেশে স্ত্রীলোক 'কুড়িতে বুড়ি' হয় এবং সমস্ত জাতিটার 'চল্লিশে চাল্‌শে' ধরে। 'বেনারস থিওসফিকাল্‌ গার্লস্‌ কলেজের' ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মিস্‌ ব্রাউনের প্রায় ৫৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল, যখন তিনি ওই কলেজের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সেই সময় দুই-চারিটি বালিকা তাঁহাকে 'বুড়ি মেম' বলিত। একদিন তিনি ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—'ওইখানেই পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। আমরা সত্তর বৎসরের পূর্বে নিজেকে অক্ষম

ও বৃদ্ধ বলে মনে করি না। আমার বয়সের লোকেদের আমাদের দেশে প্রৌঢ়া বলে—বৃদ্ধা নয়'। ইহার কিছুদিন পরে আর একটি বড়ো কর্মের ভার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে নিউজিল্যান্ড গমন করিতে হয়। তখন যুদ্ধের সময়। শত্রুর গুপ্ত 'ডুবি জাহাজ' অনেক যাত্রী জাহাজকে ডুবাইয়া দিতেছিল ; এই কারণে, সকল জাহাজেরই প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রীকে বিপদসূচক সাংকেতিক ডাকের ঘণ্টা পড়িলেই, ওই জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া ' জীবনপান্সিতে' নামিবার জন্য যাহাতে মুহূর্ত মধ্যে প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারে, সেই জন্য প্রত্যহ রীতিমত শিক্ষা (Drill) দেওয়া হইত। নিউজিল্যান্ড গমনকালে ব্রাউনও এই ড্রিল শিক্ষা হইতে অব্যাহতি পান নাই। আর আমাদের ওই বয়সে নিউজিল্যান্ডের মতো সুদূর প্রদেশের কথা দূরে থাকুক লক্ষ্ণৌ-দিল্লি যাইতেও দুই-চারিবার ভাবিতে হয়।

বাল্যবিবাহের জন্য এদেশে পিতামাতা বা অভিভাবকগণই দোষী। কন্যা নয়-দশ বৎসরের হইতে না হইতে, মাতার পেটে ভাত হজম হয় না উহার বিবাহের ভাবনায়, পুত্রেরও কুড়ি-বাইশ বৎসর হইতেই উহার ঘাড়ে বোঝা চাপাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন।

বিবাহের বয়স স্থির করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ছাত্রদের ছাত্রজীবন শেষ হইবার পূর্বে উহাদের বিবাহ দিয়া যে দেশে অনর্থ উৎপাদন হইতেছে, তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। আমাদের দেশে পিতামাতার যে-কোনো প্রকারে পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়াই যে চরম কর্তব্য। ঋণগ্রস্ত হইয়াও এই কার্য সম্পন্ন করিতে পারিলে তাঁহারা যেন একটা একটা মহাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন বলিয়া মনে করেন। দেশের কতিপয় ধনী ব্যক্তিদের ছাড়িয়া দিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের লইয়াই আমরা আলোচনা করিব। উহারা দেশের মস্তিষ্ক স্বরূপ। শারীরিক ও মানসিক বহু পরিশ্রম দ্বারা যাহাদের জীবিকার সংস্থান হয়, তাহাদের পক্ষে অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া সংসার-ভারগ্রস্ত হওয়া উচিত কিনা তাহা সকলের বিবেচনার বিষয়। শাস্ত্রে পঁচিশ হইতে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত পুরুষের বিবাহের প্রশস্ত বয়স বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, আর কন্যার দ্বাদশ হইতে ষোড়শ। কিন্তু আজকালে এরূপ রোগ ও ব্যাধির প্রভাব কালে কন্যার আরও দুই বৎসর বাড়াইয়া আঠার বৎসর করিলেও ভালো হয়।

পূর্বের ন্যায় এক্ষণে আর সেরূপ একান্নবর্তী পরিবার নাই। কেহ কাহারও প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ বা অন্যের কষ্টে সাহায্য করে না। এই নিমিত্ত প্রত্যেকের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত না হইয়া বিবাহ করা উচিত নহে। পঁচিশ বৎসর বয়সের

পূর্বে পুরুষের বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ এবং চরিত্রও গঠিত হয় না। যাহাকে বিশেষ কোনো কর্ম লইয়া জীবিকা সংস্থান করিতে হইবে তাহারও অল্প বয়সে বিবাহ করা উচিত নহে। এই সময় তাহার মস্তিষ্কর যথেষ্ট পরিচালনা হওয়াতে স্বাস্থ্যের উপরও আঘাত পড়ে ; তাহার উপর বিবাহ করিয়া শরীরকে নিস্তেজ করা একটা মহাপাপ বলিলেই হয়। হিন্দুশাস্ত্রে ছাত্রজীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিবার বারংবার উপদেশ আছে। ওই আদেশের বিশেষ প্রয়োজন চারি যুগের মধ্যে যদি কোনো যুগে হইয়া থাকে তো তাহা এই আজি-কালিকার যুগে।

এই বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে যথেষ্ট অবনতি আনয়ন করিয়াছে এবং করিতেছে। যে বয়সে ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশসমূহে স্ত্রী ও পুরুষেরা বিবাহের কথা একেবারে মনে স্থানই দেয় না সেই বয়সে আমাদের বালক-বালিকারা সন্তানের পিতা-মাতা হইয়া যায় ; ইহাতে সমাজের ও দেশের যে অনিষ্ট হইতেছে তাহা ভাবিয়া সকলেরই সাবধান হওয়া কি উচিত নয়?

# আমেরিকায় বেদান্ত ধর্মের প্রভাব ও সমাদর

শ্রীমতী সুষমা দেবী ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুররবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ তাঁর পিতা। জননী নীপময়ী দেবী। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ তাঁর বিবাহ হয় হাওড়া নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যোগেন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার ছিলেন। শিক্ষা ও নারী প্রগতির প্রতি সুষমা দেবীর আন্তরিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও প্রথম জীবনে তিনি গৃহকর্ম ব্যতিরেকে অন্য কোনো কর্মে মন দিতে পারেননি। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে পুত্রকন্যারা কিছুটা বড়ো হয়ে গেলে সুষমা দেবী 'বালিকা শিক্ষা সংঘ' নামে মেয়েদের জন্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এসময় তিনি বুঝতে পারেন ভারতে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন কত বেশি। তিনি ধীরে ধীরে উইমেন এডুকেশনাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ন্যাশানাল এডুকেশনে'র কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে আমেরিকা যুক্তরাজ্যে যাত্রা করেন। ১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকায় পৌঁছবার পর সুষমা দেবী আটত্রিশটি স্থানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দান করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল ভারতীয় নারীর আদর্শ, নারীর শিক্ষা, বিশ্বভগ্নীত্ববোধ ও ভারতীয় দর্শন। সুষমা দেবী আমেরিকায় যাবার কয়েক বছর আগে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমেরিকার বক্তৃতা সফরে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিচয় নিয়েই সুষমা দেবী সে দেশে পদার্পণ করেন এবং সর্বত্রই পৈত্রিক উপাধি ব্যবহার করতেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বক্তৃতা শোনবার জন্যে সকলেই আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সুষমা দেবী দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। ভারতে ফিরে সুষমা দেবী তাঁর অভিজ্ঞতাকে বিশেষ কাজে লাগাতে পারেননি। স্বামী ও এক কন্যার আকস্মিক মৃত্যু ও জ্যেষ্ঠপুত্রদ্বয়ের সন্ন্যাসগ্রহণ তাঁকে সমস্যার সম্মুখীন করে। ভারতের গ্রাম নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি নামে

একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে নারীশিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর সুষমা দেবীর মৃত্যু হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ তথা রামকৃষ্ণ মিশন ও সন্ন্যাসীবৃন্দের প্রতি সুষমা দেবীর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী পরমানন্দ, ভগিনী দেবমাতা ও ভগিনী দয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারতবর্ষের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকাবাস ও ভ্রমণ সম্পর্কে নানা রকম কুৎসা রটনা করেন। দু-একটি সংবাদপত্রও এব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইচ্ছে করেই এসব কুৎসাকে প্রশ্রয় দিলেও এই সংবাদ অধিকাংশ ভারতবাসীকে দুঃখিত করেছিল। সুষমা দেবীও দুঃখ পেয়েছিলেন। আমেরিকায় গিয়ে তিনি এই পূতচরিত্র বীরসন্ন্যাসীর মিথ্যা দুর্নাম সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করেন। সুষমা দেবীর অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়নি। ভারতে ফিরে তিনি এই ঘটনাটি প্রবন্ধ আকারে লিখেছিলেন। তার সামান্য অংশ ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'চতুরঙ্গে' প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে মূল প্রবন্ধটির প্রায় সম্পূর্ণ অংশ যা এখনো পর্যন্ত অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল, মুদ্রিত হল।

অতি প্রাচীন কাল হতে ভারতীয় আর্যগণ পৃথিবীর নানা স্থানে জলপথে ও স্থলপথে ভ্রমণ করতেন। বর্তমান যুগে যাতায়াতের এত সুবিধাজনক অবস্থায় কেহই যেন আর গৃহে আবদ্ধ থাকতে চান না, সুতরাং পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি প্রায় সর্বত্রই অন্তত দুই চারিটিও ভারতীয়কে দেখা যায়। বিগত শাসনকর্তাদিগের দেশে একরূপ বাধ্য হয়েই বহু ভারতীয়কে গমন করতে হত। তার কারণ বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলে তখন ভারতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিকট কোনো ভালো চাকরির আশা ছিল না। ইহা ব্যতীত ভারতীয় ছাত্রদের দোহন—অর্থাৎ অধিক খরচা দিয়া ভারতীয়গণ লন্ডনে কিংবা অন্যান্য শহরে থাকলে ব্রিটিশদের বেশ একটি আর্থিক সমাগমের উপায় হত। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নিজেদের স্বার্থেই ভারতীয়দের ইংলন্ডে গিয়ে লেখাপড়া, কাজকর্ম শিক্ষা অতি আবশ্যকীয় বলে স্থির করেন। বহু ব্রিটিশ ল্যান্ডলেডি ভারতীয় ছাত্রদের আপন আপন সংসারে রাখিয়া বেশ উপার্জনও করতেন।

বর্তমান কালে গভর্নমেন্টের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ, আর্থিক স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন সাধারণ লোক এবং রাজন্যবর্গ বিলাতে গমন না করলে যেন কোনো সুখ পান না। এই গরিব দেশের অর্থ তাহাদের হরির লুটের মতো ছড়াইতে দেখলে যেমন

ভয়ঙ্কর গাত্রদাহ হয়, সেইরূপ আবার গরিব ছাত্রগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিদ্যা শিক্ষার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করেছেন তা দেখলেও অত্যন্ত আনন্দ হত।

রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের পিতামহ)—এই দুই বন্ধুর একত্রে সর্বপ্রথম বিলাতযাত্রা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই একদিন গিয়াছে যখন সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ঘোর আন্দোলন চলেছিল। ইউরোপীয়ানদের ভারতে আগমনের বহু বহু পূর্বে যে আমাদের পূর্বপুরুষগণ সমুদ্রযাত্রা করে পৃথিবীর নানা স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন সে সমুদয় হিন্দুগণ বিস্মৃত হয়ে যান। অবশ্য ইহা নিশ্চিত যে সেকালে আর্য ব্যবসায়ীগণ নিজেদের জাহাজে স্বীয় রীতিনীতি বজায় রেখেই গমনাগমন করতেন ; সুতরাং অনার্য-ম্লেচ্ছদের দেশে গমন করলেও জাতিধর্মচ্যুত হতেন না। কিন্তু ক্রমশ মুসলমান ও অন্যান্য বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ প্রভৃতির দ্বারা জাহাজ নির্মাণ ও বিদেশির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য একরূপ বন্ধ হয়েই যায়। এই জন্য ব্রিটিশদের ভারতে আসিবার জন্য জাহাজেই আসিতে হয় মহাসাগরের উপর দিয়া, এইজন্য ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশে যাইবার জন্য ভারতীয়গণ উহাদের জাহাজেই গমন করিতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশদের জাহাজে আহারাদি অবশ্য হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ। সেইজন্যই বোধ হয় সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়। হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন আচার ও প্রথাকে আমাদের চিরস্থায়ী নিয়ম বলিয়া ধারণা করি, পরে দেখা যায় যে কালের করাল গ্রাসে কীভাবে কোথায় যেন সব অদৃশ্য হয়ে গিয়াছে। এই তো কালের খেলা। পুরাতনের পরিবর্তে নূতনের সৃষ্টি, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। রাতের পর দিন, দিনের পর রাত। এইরূপ লক্ষ লক্ষ বৎসরের পুরাতন সূর্য নিত্য নূতনভাবে যেমন আমাদের সামনে প্রকাশ হয়, ভারতের প্রাচীন গৌরবও নূতন সাজে যেন পৃথিবীর সম্মুখীন হতে চলেছে। ভারতে মুসলমানদের আগমন কাল হতে, জাতিধর্ম রক্ষার জন্য হিন্দুদের বজ্র আঁটুনির প্রয়োজন হয়। সেইজন্য হিন্দুসমাজকে কোমরের কাপড় কষে টেনে বাঁধতে হয়েছিল। এখন আর সে আবশ্যকতা নাই, সুতরাং সেই একই ভারতীয় নরনারী সব একই সজ্জায় সজ্জিত হয়ে পটে অবতীর্ণ হয়েছেন।

আজকাল যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক বস্টন প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরগুলি শুধু ভারতীয় নয় এশিয়ার অন্যান্য দেশের ছাত্রগণেরও শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। বাণিজ্য ও কৃষি-কর্ম সূত্রে ক্যালিফর্নিয়ায় শিখদের একটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। মাননীয় ভগবান সিং-এর দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে আমি প্রথমে স্যানফ্রান্সিস্কোতে যাই।

পরে গুরুগোবিন্দ সিং-এর জন্মোৎসব উপলক্ষে (Stockholm) নামে আর একটি বড়ো শহরেও গমন করি। সেখানে প্রায় ৪০০ শিখ জমা হয়। তাহারা অধিকাংশ শ্রমিকের কর্ম করত। যুক্তরাষ্ট্রে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম বেদান্তধর্মের ধ্বজা প্রোথিত করেন। কিন্তু তারও বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মাদাম ব্লাভাটস্কির থিওসফিস্ট মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে হিন্দুধর্মের মিশন নিয়ে সেখানে সর্বপ্রথম গমন করেন। মোহিনীমোহনের সম্বন্ধে দু-চারিজন মহিলা আমাকে বহু প্রশ্ন করেন ও বলেন যে মোহিনীমোহনের পূর্বে সাধারণ কোনো আমেরিকান 'হিন্দু'কে দেখেন নাই। মোহিনীমোহনের পরে শ্রীকেশবচন্দ্র সেনের সহকর্মী শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মধর্মের নিশান নিয়ে আমেরিকায় যান, আর ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধেও বক্তৃতাদি দেন। ইহাও বেদান্তধর্ম প্রচার কার্যে দ্বিতীয় সোপান বলা যায়। পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শিকাগোতে যে আন্তর্জাতিক ধর্ম মহাসভা 'The Parliament of Religion' আহূত হয়, সেখানে স্বামীজি বেদান্তধর্ম সম্বন্ধে যে সব অতি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন তা যেন একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার হয়। সেই মহাসভায় যাহারা উপস্থিত ছিলেন এইরূপ বহু লোকের নিকট শুনেছিলাম যে স্বামীজির সুন্দর ইংরাজিতে বেদান্ত ধর্মের প্রাঞ্জল ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এ মহাসভার শ্রোতাদিগকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। বড়ো বড়ো পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহার বক্তৃতা একাগ্রা মনে শ্রবণ করতেন, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারতেন না। এই ভারতীয় বক্তার বক্তৃতা শুনিবার জন্য মার্কিনদিগের এত আগ্রহ ছিল যে তাঁর বলবার সময় সভা লোকে লোকারণ্য থাকিত, আর এত নিস্তব্ধ যে একটা কাঁটা ফেলার শব্দও বোধ হয় শোনা যেত, পরে স্বামীজির বক্তৃতা শেষ হলে সভা একপ্রকার লোকশূন্য হয়ে যেত। এই ব্যাপার দেখে স্বামীজিকে সভায় অবশিষ্ঠ কয়েক দিন সব শেষে বলতে দেওয়া হত। তখন শেষ অবধি সভা লোকে পরিপূর্ণ থাকত। বেদান্তধর্মের ব্যাখ্যা শুনে বহু বাণী দার্শনিকগণ তাঁহার সহিত আলোচনা করতে আসতেন। স্বামীজি বুঝেছিলেন ওই মহাদেশে বেদান্তধর্মের বীজ বপনের উত্তম উর্বর ক্ষেত্র আছে, সুতরাং বেদান্তকে দেশ কালের উপযোগী নব সাজে সজ্জিত করে আমেরিকায় আনবার জন্য স্থির করলেন। ইহার পূর্বেও যে গীতা ও বেদান্তধর্ম সম্বন্ধে কেহ কিছুই জানত না তা বলা যায় না। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক এমার্সনের গ্রন্থ পাঠ করলেই জানা যায় যে তাঁর দার্শনিক মতামত তিনি কোথা হতে সংগ্রহ করেছিলেন। কোনো একটি মিটিং-এর পর কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির

একজন অধ্যাপক এবং নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির সংস্কৃত অধ্যাপক প্রোফেসর হ্যাবিজ্ এমার্সনের বিষয় বহু প্রকার আলোচনা করেছিলেন, সেই সময় প্রো: হ্যাবিজ্ আমায় বলেন যে এমার্সনের মৃত্যুর পর তাঁহার লাইব্রেরি সংস্কারের সময় দেখা যায় যে তাঁহার লেখবার ডেস্কের দক্ষিণ দিকে প্রথম আলমারির প্রথম পুস্তকটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। আলমারিটা সাংখ্য এবং বেদান্তদর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তকে পরিপূর্ণ ছিল, খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে একখানি পুস্তকও ছিল না। আমেরিকানদের মধ্যে এমার্সনের স্থান বহু বহু ঊর্ধ্বে। তাঁহার ন্যায় পাণ্ডিত্য আর কোনো আমেরিকান দেখিয়েছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি না। অনুসন্ধান দ্বারা বেশ ভালোরূপেই জানা গিয়েছে যে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র তাঁর চিত্তবৃত্তির পুষ্টিসাধন এবং বেদান্তদর্শনের প্রভাব তাঁর চিন্তাস্রোতকে চালিত করেছিল। হিন্দুদর্শনের উদার নীতিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি খৃষ্টান সাহিত্যকে তাঁর পুস্তকাগার হতে বিদায় দিয়াছিলেন। দিন দিন আমিও বুঝতে পারছিলাম যে আমেরিকায় খ্রিস্টধর্মের প্রভাব বেশ কম। যা কিছু আছে তা অধিকাংশই বাহ্যিক।

মহাসভার বৈঠক শেষ হয়ে যাবার পর স্বামীজি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচার কার্য আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম অর্থের জন্য তাঁর কিছু কষ্ট হয়। কিন্তু সে বেশি দিনের জন্য নয়। তাঁর তেজস্বী ও প্রাণস্পর্শী বেদান্ত ব্যাখ্যান তথায় শিক্ষিত সমাজে বেশ এক চাঞ্চল্য আনয়ন করে। স্বল্প কাল মধ্যে তথায় এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি যশঃতরঙ্গে মুখরিত হয়ে উঠল।

পৃথিবীর এই অর্ধাংশকে স্ত্রীরাজ্য বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এখানে নারীগণই সকল বিষয়ে অগ্রগণ্য ও অগ্রগামী। সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদি সকল বিষয়ে বক্তৃতা শুনিতে তাঁহাদের উৎসাহ অধিক। পুরুষগণ ডলারের পূজারি। ধন আহরণেই সর্বদা ব্যস্ত।

যেখানে স্ত্রীলোকগণ যথার্থ গুণ গ্রহণে সমর্থ সেখানে বিবেকানন্দর ন্যায় এক মহাপুরুষ কখনো অনাদৃত হয়ে থাকতে পারেন না। দলে দলে মার্কিন নরনারীগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে শুরু করলেন। তাঁহার বহু শিষ্যদের মধ্যে ভগ্নী নিবেদিতাকে কোহিনূর মণি বলা যায়।

শীঘ্রই নিউইয়র্কে একটি বেদান্ত আশ্রম স্থাপিত হয়। ইহাই ওই মহাদেশে বেদান্তধর্ম প্রচারের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্রস্থল। বেলুড় মঠ হতে একজন অতি সুদক্ষ প্রচারক স্বামী অভেদানন্দকে আনেন আর তাঁহার উপর আশ্রমের সকল কর্মভার অর্পণ করে দৃঢ়ভাবে ইহার ভিত্তি স্থাপন করে তিনি ভারতে ফিরে যান।

আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে স্বামীজির প্রভাব এত বিস্তৃত হয় যে গৃহস্থ ও সাধারণ প্রত্যেক পুস্তকাগারে তাঁহার বক্তৃতাবলি রাখা অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়। আর তুলনামূলক ধর্মশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাঁহার সব বক্তৃতা পাঠ্যপুস্তকরূপে পড়ান হত।

এইখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না। তাহা এই যে যখন স্বামী বিবেকানন্দ যুক্তরাষ্ট্রে এত সমাদৃত হচ্ছেন, তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের গাত্রদাহ হতে শুরু হয়। ব্রিটিশগণ সব সময় জগতের সম্মুখে ভারতীয়দের অশিক্ষিত, হেয় ও অসভ্য জাতি বলেই উল্লেখ করে এসেছেন। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দর যশ যখন এরূপভাবে চতুর্দিকে বিস্তার করতে লাগল, তখন যে উহাদের ভয়ঙ্কর গাত্রদাহ হবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী! অতি শীঘ্র এই জ্বলনের একটি ঔষধ উহারা বার করল।

একদিন প্রাতঃকালে দৈনিক সংবাদপত্রে ভারতীয় ব্রিটিশ সকলেই দেখলেন যে বড়ো বড়ো অক্ষরে স্বামীজির বিষয়ে লেখা। সংবাদপত্রের ওই কথা পড়িয়া ভারতীয়দের ভয়ঙ্কর খারাপ বোধ হল। কিন্তু ওই খবরটি স্বামীজিকে জগতের সম্মুখে অতি হেয় করে দেখাবার যে একটি কুচক্রান্ত তা ভারতীয়গণ তখন বুঝতে পারেন নাই।

আমেরিকায় গমন করে বহু আমেরিকানের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ পরিচয় হয়। স্বামীজিকে যাঁরা বেশ ভালোরূপে জানতেন এইরূপ বহু বয়োবৃদ্ধ লোককে তাঁর বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করি, সকলের নিকট হতেই একভাবের উত্তর পাই। ওই সময় একদিন নিউইয়র্কে একটি দশতলা বাড়ির একটি বড়ো কামরায় ৩০/৪০ জন শিক্ষিত স্ত্রী পুরুষ মিলে স্বামীজির সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। সেই সময় একজন মহিলাকে আমি ওই বিষয় প্রশ্ন করি। তাঁর বেশ বয়স হয়েছিল, আর তিনি স্বামীজিকে ভালোরূপে জানতেন। তিনি আমার প্রশ্ন শুনে উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, আপনারা ব্রিটিশদের চক্রান্ত বোঝেননি! ওরা কী পছন্দ করেছিল যে অত বড়ো এক মহাসভায়, যেখানে পৃথিবীর বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতের, শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ একত্রিত হয়েছিলেন, সেখানে এক অজ্ঞাতকুলশীল ভারতীয়র নিকট তাঁরা তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করবেন—এ কী ব্রিটিশগণ সহ্য করতে পারছিল। ওরা ব্রিটিশগণ ভারতীয়দের জগতের সম্মুখে অসভ্য বর্বর বলে দেখিয়ে এসেছিল তা যে সব মিথ্যা প্রমাণ হবে। জগতের সম্মুখে তাঁকে অতি তুচ্ছভাবে দেখানটি এক অতি জঘন্য কুচক্রান্ত।

Boston এ ও California-র La Crescenta শহরে স্বামী পরমানন্দর দ্বারা আরও দুটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিও যেমন সুবক্তা তেমনি সুলেখকও ছিলেন। সেখানে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিপত্তি আছে। গির্জারই ন্যায় প্রত্যেক রবিবারে ওই আশ্রমে বেদান্ত ব্যাখ্যা হয়। লা ক্রেসেন্টায় আমি কয়েকদিনের জন্য স্বামীজির আতিথ্য গ্রহণ করি। সেখানে ভগ্নী দেবমাতা, ভগ্নী দয়া প্রভৃতি কয়েকজন আমেরিকান সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। তাঁহারা সংসারের সব বিলাসিতা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে পরম শান্তি লাভের জন্য আশ্রমেই থাকেন। উহারা সকলেই বিশিষ্ট বংশের। সকলেই হিন্দু নাম গ্রহণ করেন এবং নিজেদের যথাসর্বস্ব আশ্রমকে দান করেন। Message of the East নামক মাসিক পত্রিকা ঐখান হতেই প্রকাশিত হয়। নিয়মিত সভাসমিতি বক্তৃতা ও পুস্তকাদির দ্বারা প্রচার কার্য চতুর্দিকে বিস্তারিত হতে লাগল। ভগ্নী 'দয়া' একজন অতি বিদুষী, সহৃদয়া ও অত্যন্ত কর্মী মহিলা ছিলেন। তাঁহার সুন্দর অমায়িক স্বভাব আমায় বিশেষ করে মুগ্ধ করে। ইনি আমেরিকার Congress-এর Senator Jones-এর কন্যা। হিন্দুধর্ম বরণ করে ওই আশ্রমের কার্যে স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন সংযুক্ত বেদান্ত আশ্রম ব্যতীত আরও কয়েকটি হিন্দু মিশন আধ্যাত্মিক শিক্ষা বিতরণ দ্বারা মাতৃভূমিকে পশ্চিম জগতের সম্মুখীন রেখেছিল। ইহাদের মধ্যে 'যোগোদা মিশন' উল্লেখযোগ্য। স্বামী যোগানন্দ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইনি রাঁচিতে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য বিদ্যাপীঠের একজন অধ্যাপক ছিলেন। এখন ক্যালিফর্নিয়ার লস এঞ্জেলো শহরে ওয়াশিংটন পর্বতের শিখরোপরি এক সুন্দর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে কাজ করছেন। স্বামী ধীরানন্দও তাঁর সহকারী হয়ে ওই আশ্রমের কার্যই করেন।

পূর্বেই বলেছি যে মার্কিন স্ত্রীলোক প্রধান দেশ। স্ত্রীলোকের কার্য ও প্রতিপত্তি এখানে অধিক।

তৃতীয় অধ্যায়

# নির্বাচিত ভাষণ

# My Pilgrimage to America

## The Vision of my Voyage

I was on a visit to a friend in one of the remotest parts in Central India.

It was April and the day was warm. The monotony of the long summer day and the heat of the Blazing Sun make one feel quite depressed and weaky specially so, when one has nothing particular to do.

I was invited by my friend to be present at one of the yearly spring festivals at the place of her birth. The day was uncomfortably warm in spite of the fact that the intensity of the heat was a bit lessend by a cool shower of the evening before.

The guest house was beautifully situated on the top of a hillock, commanding a glorious view of the surrounding places to a long distance. Here it not for the Summer Sun, that burnt most cruelly with its scorching heat, the place would be a paradise of the Gods and fit one for hermits to lead a secluded life.

I was glad to be away for a few days from the diu and bustle of Calcutta.

It was mid day and I was seated near the Bay-window of my room. I looked out and saw the waving fields of gold, red and blue. They looked like beautiful carpets of various dyes-spread all round. What a grand sight ! It is said that the carpet weavers of India take lesson from Mother Nature herself how to blend various colours. I do not suppose they can have a better instructress than nature.

Sitting at the window I heard the corring of doves and the rippling of the streamlet below, flowing down at its ease. But all those failed to stir my mind, which was wandering for far away.

From my childhood I had always been keen on travelling and even longed to take a trip round the world. My restless nature hardly allowed me to be contented with a quiet of peaceful home life.

As I was gazing out far away beyond the flowing sea of ripe wheat fields, I seewed to drop into a spell of dozling. There arose a vision before me. I felt I had gone on a pilgrimage to the New World. There appeared before me 'The Statue of Liberty' the hurry-kurry of the porters at the New York Piers star-razing buildings rising over the city and last of all the Golden Gate of California.

It was a wonderful vission, which impressed itself on my semi-conscious mind.

The chirping of a little black-bird over the window brought me back to my senses. I opened my eyes. The vission was gone. Was that a suggestion from Heaven ? I wondered.

The whole house was having its midday Sciesta. It was so intensely silent that one might have heard the proverbial pin drop. Quietly I went to my desk and drew out of it a bundle of unanswered letters, fastened together neatly with a silver ribbon. I unfastened the bundle, took out one letter after another and glanced at the contents, one correspondent particularly from America asked me to come and visit the wonderful. "Its wonderful progress in education, messal of industry throughout the states, its rapid development etc. are indeed worth studying by our people from India" says one letter, particularly pointing out the educational facilities in America.

I grew enthusiastic and at once made up my mind to start without delay for New York. I returned home rather earlier from my solitary retreat, thinking it was not yet time for me to take to a Vana-Prastha life, (a life of seclusion at old age) but there still remained some solid work to be done.

Almost with tears in my eyes I bade good-bye to that sweet little spot and thanked my dear friend for her charming hospitality.

At last my dream came to be realized and on 13th May of year 1926, I left the shore of my beloved Mother India for the long longed for Voyage to the West; to see with my own eyes the Home of European Civilization and materialistic activities. (Here put a verse from the Geeta). Instead of going direct to America I decided to go to England and see London, the first city in the British Empire. No, without a

look round at London, my pilgrimage to the West could not, I felt, be complete.

Sea-voyage appeared to have a great fascination for me. In order to be longer on the sea I sailed from calcutta instead of from Bombay or some other western ports of India.

My husband and friends saw me off. We all went together to see the cabin that was to be my floating home for a whole month. If a cabin can be comfortable at all, then this one was, with a small round little hole for a window, openning out into the sea. This little hole I was told, is called the 'Porthole'.

Just on the strike of five o'clock the bell rang to warn the visitors of the time of departure of the vessel from the port. Now my friends took leave of me. I saw them leave the boat. That was the moment when I felt the sense of loneliness in my heart in spite of hundreds of people moving about all round me. My two little girls with their brothers most reluctantly separated from me. They too at last left the boat, stood on the bank, gazing on their mother until she was vanished out of their sight !

I was on the desk, standing motionless ; a violent storm was blowing in my mind. I realized what a venture-some task I was going to undertake ! When was I destined to return home ! Shall I find my dearest ones hale and hearty when I come back—I went away, that question remained unanswered in my heart and I only asked Providence to protect them also to make me strong in body and mind.

I did not know how long I remained standing on the deck. One feeling was very much strong in my mind, that was, that henceforth, I was to wander about in this wide world, without a friend or a guide like a blind person groping about in the dark with the help of a stick. My stick was my God I leaved on Him more strongly, than I had ever done.

The dinner gong broke in upon my reflections. I went down to the dining saloon. I remember clearly the state of my mind during the dinner time, seated among strangers only.

At night the boat started for a little time and then it stopped again. Early next morning, looking through the little opening or the port hole, I found that the boat was still on the river Ganges waiting opposite the Sibpur Ghat—a little way beyond is my home.

My heart leapt up with joy at the sight of the old familiar surroundings. Ah, if only I could go ashore and run to my house for a few moments ! But who could say that 'a few moments' meeting with the nearest and dearest of my heart would not have put a quietus to my long yearning to see the world.

I felt a little indisposed for a day while crossing the Bay of Bengal. I was determined to overcome sea-sickness and at last got the better of our common energy.

For a whole week we were on the bocom of endless waters. No sign of land anywhere, it was all one vast expanse of water. On the eighth day the coast of Ceylon was visible. The sight of land-how I welcomed it !

We arrived at Colombo and after lunch, many of us went ashore. I paid a hurried visit to the Buddist temple, college and a few other places of interest and returned to the steamer in the evening.

It was a lovely evening of the East. The boat was busy loading and unloading its cargoes, making a terrible creaking noise. Three fourths of the loveliness of the evening was spoilt by this night-mare of the steamer. I sat on the deck, watching the moon and the little silvery waves playing hide and seek with her reflections upon them.

The old history of the island leaped to the memory; before me lay the historical Lanka dwip or the modern Ceylon—the queen of the East-hoary with its traditions of 5000 years. There reiqued one of the mightiest kings of the past—Ravana of the Rakshas race.

He was at once power an pride personified. There was no end of his tyranny over Gods and mortals. The whole universe trembled with fear at his name. But he was not afraid of any one in this world. His tyranny reached its Zenith-when he carried off the wife of Rama. Then the end came and down felt the most powerful monarch by the land of a man, the huband of his ... .

*Found unfinished*

# Advantages and disadvantages of Inter-marriage between Indo-Aryan's and Euro-Aryans.

I intend to treat this subject from a purely social point of view. I shall studiously avoid all reference to religion, not with-standing its close connection with the subject of marriage in India. It is not, after all, a very easy task to keep clear of religion altogether as all the social institutions of the different communities of India are intimately interwoven with it and so, in all discussions of social problems the first and foremost consideration which forces itself upon one's mind is that of religion. But I have absolutely no intention to bring it in here and as far as possible, I shall not give it any undue importance, although I may occassionally have to state some simple and undeniable facts, which are firmly embedded in religion and are actually related to our social life. The subject is doubtless, one of great sociological importance; nay, it touches the very foundation of the social organization or framework of a most ancient nation and contemplates the demolition of the mighty superstructure, which has stood firm and unshaken upon it through centuries of foreign domination and thousand and one influences, unfavourable to its existence. It is not to judge the merit of the work of the immortal builders of that superstructure and the marvellous skill displayed in its construction. It is well-known, our ancient Law-givers laid down all sorts of rules for the guidance of their contemporaries as well as for those that were to come after them; but whether they looked at the affairs of mankind theoritically or practically will become apparent as we proceed. We should however, in this connection, bear in mind that the law of incessant change operates quite as much in the social as in the physical and organic world. This is the supreme truth of science. The inevitable

affect of the violation of this law is seen in the dwarfing of the intellect and the physical inability of a race to preserve its liberty.

It has tended to isolate one class of race from another, although they have lived side by side for centuries past and are more or less identical in features, habits and thoughts and possess the same interest in the soil they inhabit. If the rules of social and moral conduct and those regulating our daily life which are still observed in our society, sanctified by religious sanction and crystallized by custom, were given the elasticity of secular legislation and not mixed up with matters purely religious and existing only in meta-physical speculations, India would have long ago revived her freedom and glory from centuries of quiet imanition; and she would have flourished in the united strength of a mighty nation under the proud appelation "India". But the term is now a vision-Chimera.

What India would have been—today America is already—there we find Germany, France, England, Holland, nay entire Europe in the blood of the Americans. Though a conglomeration of different units, having distinct characteristics, they are proud to call themselves a nation—American. I was struck during my visit there, with the infinite possibilities of such a country and such a people. The possibilities of India would equally have been endless, were the conservatism of her religious ordinances sufficiently relaxed to admit inter-marriage among her multitudinous races and consequent infusion of fresh blood into the Nation life. Now, let us consider some immutable laws of nature which the scientific researches of historians have brought to light. Let us also see how far those laws are applicable to the different conditions of life in this country and specially their effect on the future of our race.

"Every family" "every race or people", says Ribot a great French evolutionist, "is born with a certain measure of vitality, a given amount of moral and physical aptitude, which time and circumstances bring to light. The evolution process lasts until the family or the people or the race has accomplished its destiny. It is remarkable for many, brilliant for a few, obscure for the greater number. As soon as their stock of vitality or aptitude is exhausted, the deterioration of the family, the people or the race sets in and steadily augments, annihilation finally supervenes unless warded by some external cause. In this process of

decay, heredity acts indirectly, the direct cause is to be sought in climate and other physical conditions and the manners and customs and institutions of the community. Nations exhaust themselves like soil, that is not mannered, the product of their genius, not being returned to their common fund but being lost in a material sense.

The truth must be confessed that many a country which once occupied a prominent position in the man of the Old World has disappeared and is now represented by nameless tribes and undistinguishable villages. No amount of scholarly assiduity and perseverance will succeed in uncovering the kingdom of Old Sparta. Athens is a mass of broken monuments and edifices. Thebes live in the pages of History and of Egypt Syria and Media, we get no visible traces except in their Hieroglyphies and cuneiform inscriptions. The Saracens in the course of hundred years, subjugated Persia, Palestine, Egypt and Spain and but for the memorable battle of Tours would have established mosques in Paris and in Oxford and would have even set a Caliph on the throne of the people of Rome. They disappeared in the mist of time and oblivion. It is in vain, that we search in the pages of history for one nation at least, in which, deterioration having set in, has succeeded in putting an effectual check to its further decay and in surviving ultimately without having lost its identity. The ordinary physical explanation that a nation like an individual grows old and dies, is enough to account for this startling phenomenon. It is true that unless we are born again we cannot have a new start in the race of existence. A mighty river rushing from the hills goes swiftly and proudly through the valleys and plains, irrigating tracts and provinces, giving life and plenty to millions. It receives tributaries and sends forth the branches, but towards its junction with the sea, it loses its force becomes torpid and empties itself into the ocean with sheer effort. If it receives no tributaries it may disappear in the lands of the desert. Such a simile applies with great force to the history of a great people. At its commencement it is formed by the confluence of many tribes and races and then as it descends into the arena of active life, it receives fresh accessions of blood from other tributary races. But as it settles down firmly, it becomes more and more conservative and self-satisfied, one may say, even conceited in its ideas and gradually accession of fresh blood is stopped and it becomes stationary and before long it

disappears from the pages of History. So this accession of strength—this tributary of fresh blood to enable it to push forward is inevitably required by every nation. The History of Rome offers a pretty good instance of this. Where are those ancient Romans, who gave birth to Western Civilization and had established a mighty Empire, the grandeur and magnificience of which have hardly been surpassed even to the present day ? For twelve centuries Rome had been the mistress of the World; wise in statesmanship, omnipotent in arms, sagacious in council and successful in everything. But alas ! at the end of that period she was found a mess of hideous corruption and disease, paralysed by disasters, deprived of her internal strength and devoid of the least spark of life. Once the model of all that was good, she became now a by-word of contempt. The days of glory having now gone, she became an easy prey to the hordes of barbarions. They invaded the empire from all quarters. The power that subdued the world deserted the degenerated Roman's arms. The people had become effeminate and their conquerors pursued them like hordes of cattle. Terrible was the havoc which followed the invasion. Thousands were slaughtered and many more were reduced to slavery. First the Huns, then the Goths, then the Lambards, then the Franks and Germans one after another established their rough sway over the helpless inhabitants of Italy. Each new king or trible came accompanied by hundreds of thousands of soldiers. They settled in lands wrested from the people and after a stay of a few decades in that sunny climate, they themselves fell victims to its enervating influence. But whatever were the evils resulting from the barbarion invasions of Italy, good came out of them in a manner imperceptible. All these different races entered into relationship with the Romans; their blood mixed with that of the latter and the issue was the modern Italian nation. The mixture of their dialects with Latin resulted in the formation of the Italian language. "The first six centuries", says Sismondi, the historian of the Italian Republics, "which followed the downfall of the Western Empire, prepared, by the mixture of the barbarian races with the degenerated Romans, the new nation that was to succeed the Romans." We thus see that for a period of twelve centuries Rome was the mistress of the World. During that period she passed through all the restlessness of infancy, the buoyancy of youth, the calm heroism and sober wisdom

of manhood and the humiliation and imbecility of old age. Indeed, the nation is like and individual with this difference only, that the latter has only a few scores for his existence, while the former takes centuries to go through its cycle of life. It will thus appear that when the Roman empire expired the nation was in the last stage of its dęcay and it had to be born again to start a fresh career of activity. But for the indirect help of the barbarian conquerors, no traces of the ancient Romans would have been left in modern Italy.

Let us apply the moral to India. Here is a nation existing for many thousand years with a religion, literature and civilization strangely well preserved from change and decay. Revolutions of the most sweeping description have taken place, but they have never so much as touched the laws, the institutions and the custom, which have crystallised themselves under the pressure applied by the legislators. Hordes of other people in a very low state of civilization conquered the country from time to time, but they were all absorbed by it, only adding to the number of its numerous castes and creeds.

Wonderful indeed is the fabric of Hindu society in its scope conception and ingenuity. Like the Pyramids, it maintains its ground and reveals to succeeding generations the wisdom and the constructive ability of its first builders. But it would be claiming for human wisdom, the character of infallibility and permanence, if we were to say that our nation is in any sense endowed with the principle of indestructibility, even though its laws may have been framed with that view. To assert that human law can triumph over the laws of nature is absurd. In this sense it is idle to affirm that the social and religions institutions can maintain the people in a permanent growth and stability. The ancient Aryan legislators knew perfectly well that in artificial system of social distinctions might be prolonged over a long period; but it could not ultimately preserve the people from the operation of natural laws. I have already stated that a nation like an individual goes through the same cycle of changes from its birth to its final dissolution. They same thing can be said of the different races of India. They had their periods of childhood and youth. They had their days of liberty and glory. They startled the world with the products of their super-human intellectual activities in all sphere of life. When the whole world was steeped in barbarism and ignorance, it was in India that

the truths of science and philosophy were evolving. It is a matter of wonder that India has not already completely succumbed to the infirmity of its old age and to the degeneration of her children which had overtaken them long before the dawn of the modern civilization. The reason is that there were various influences at work which from time to time retarded the progress of disintegration of our national life. The secret is that its total annihilation has been kept in abeyance by the process of continuous mixture of blood which had gone on for centuries. The History of India shows that whenever the Hindu race lost its strength, whenever there were discussions and jealousies within a fresh horde of barbarians burst upon the country, from beyond the North Western Frontier and conquered it, if not the whole a greater part of the country. But in the long run it embraces the laws and the religion of the adopted country. It will not do for us to over look the problem of mixture of races. Orthodox feelings may be offended, but it is a factborne out by the indiputable testimony of history, that non-Hindu tribes from Central Asia did come at one time or another to settle in India and to assume the function of Royalty claimming and establishing relationship with the native population.

Their blood is coursing through the veins of perhaps every Hindu of the present day. Various records exist of these irruptions from the north from the first to the sixth century of the Christan Era. We need not go into unnecessary details; I may only mention in connection with this the Seythian-kingdom of Kaniksha who helo his Court in Kashmir and at whose capital the fourth great Buddhist Council was held at about 40 A.D. Various facts points to show, that the first five or six centuries of the Christan Era in the period when the modern races of India were forming. If we go back once more to past ages we shall be able to prove that whenever there was an inter-mixture of races and an evident violation of caste rules, whenever the laws of marriage were interfered with, we meet with periods of revival and prosperity. India has never prospered under the rigid system of artificial distinction. Her greatest religions, intellectual and moral revivals took place after certain convulsions in the midst of which the man-made laws were helplessly broken through. She can torpid, stagnated and deteriorated when she had allowed the same blood to flow through the veins of her people. —When the marriages were restricted to the

same clans or classes, she lost her stamina, but she revived and became great in arms and arts as soon as her children broke through the dominated custom. The first great Epoch in History of revivals is the period of the great war of Kurukshetra of Maha-Bharata. The Epoch of a great religious revolution. Of course there are people who always mock at any notable superiority of Hindu literature culture etc and do not count the Maha-Bharata as a great historical work. We know and we have to admit that there is considerable historical element in it. It also gives us a very good idea of the social condition of that time. We also come to know from this great Epic poem that at that time there was a considerable degree of intermixture of blood, more than was justified by the spirit of caste. The second Epoch of revival was contemporary with the movement of Buddhism which operated to some extent to soften the uninflexible rules of our society. The third is the most important era in the history of Hindu revival. It is important because it brings us face to face with modern India, with its many sided religion endless subdivision of castes, its various custom introduced according to the exigencies of the time and its political evolutions. After the fall of the ancient race of the warrior class–the Kshatrias, India was exposed to a race of adventurers. It is now that we hear of those hordes of barbarians that settled in the land. About half a dozen of those strange tribes, thus obtained a footing amongst the Hindu races, inter-marriages took place between the nations. It was out of such a process that the modern Rajputs came into being and filled up the gap left by the Kshatrias of old. The greatest of the many dynasties which sprang out of them—the only one that fought successfully for years with the enemy—was the Royal Race of Chitore of Udaipur. Tradition hints at the presence of foreign blood in this great dynasty. It was a race enriched with the best blood of kings that could contend with the victorious forces of Akbar. The Great Protap of Chitor, who had led the forlorn-hope of the country against the overwhelming hosts from Delhi—when all other princes had bowed to Akbar Badsah, had alone held out his rank and chivalry.

Thaoc tried so far to prove that no people could ever hope to rise from its fallen condition until by repeated inter-mixture with other races, it got itself reborn. But now it remains for us to see the disadvantage of inter-national marriage, i.e., marriage between Indo-

Aryans and Euro-Aryans. If India is once more to lift her head among the nations of the earth whether it will be necessary for her to enter into inter alliance with the western nations.

It must be mentioned that our ancient law-givers like the Great Manu did not quite overlook this problem of natural law.

Among the Hindus the marriage between first cousins is an unheard of thing ; but it is so very common among the Europeans. The Hindus cannot marry even second cousins. The rule of the law is, that there can be no marriage unless the connection between the husband and wife be of not less than five to six generations past. He can never marry a girl of his own Gotra or clan or class, even if the girl might not be related to him at all, except that both are descendents of the same ancestor, who lived on this planet—say a thousand years back or more.

The Hindus think that the relationship of the first cousins is, in fact, that of a brother and sister and hence marriage between them is an unheard of thing and strictly forbidden by Hindu Law, While among the Europeans, there is no such restriction and marriages between first cousins are very common.

That might have been one of the main reasons for the fall of the Euro-Aryans or the Romans within twelve centuries only, which certainly may be said to be a very short span of life for a nation. The Romans, having fallen into the lowest depths of corruption and degeneration took six centuries to invigorate themselves with the blood of the barbarians and the appeared in history as a new nation.

In India this strict law of marriage is perhaps, responsible for saving the Indo-Aryans from total annihilalion and so even to-day, after five or six thousand years of Aryan immigration into India, we find, great heroes, reformers, poets, artists and statesmen born to Mother India.

Perhaps we need not fear the repitation of semi-barbarian hordes establishing themselves in the midst of the people, adapting themselves to the circumstances of the land, receiving their custom, adopting their religion and speaking their language. In the past, foreign races of inferior civilization invaded India and afterwards they allowed themselves to be conquered in return. They not only settled in the land of their adoption but became Hindus themselves. It is the Sakyas that gave the Sakya-muni or Budhadeb and the Sakyas became Hindus. It was the same with every race or conqueror that preceded the

Mahommedans. When inter-marriage began they had put themselves under almost the same condition and circumstances of life as the Hindus themselves and thus imparted to the land of their adoption the strength and vitality of youth which they possessed.

With the advent of Mahommedan rulers, however, this condition of things disappeared. The new conquerors would not amalgamate with the people but chose to lord over them in their own style and hence arose an antipathy, an exclusiveness, a jealousy and distrust, which kept the two races apart and made them both weak.

The Mahommedans weakened and degenerated very soon. The reasons were many, which may be left out here. They lost their mighty sovereignty which had been established after a long and hard struggle.

The advantages of Inter-marriage are many, but the circumstances under which such union may be beneficial to the country must also be considered. From the preceding facts we gather that Inter-marriage led to good results only in those cases where the parties were under similar condition of life and surroundings.

Things as they are in India, at present, bear a marked degree of disparity to the features of western civilization. The Hindus are not only physically widely separated from the Europeans but there is also an inseparable gulf between the religions and social institutions of their respective civilization. The mode of living, habits, thoughts and custom of one people present such a degree of dissimilarity to those of the other that matrimonial alliances between them on a large scale are sure to lead misery and unhappiness on either side. If we are to have a peep into the married life of our English educated Indians married to European women we cannot but admit that—90 P.C. of such union is utter failure. Such union where vast inequalities in education, culture, tradition and environment predominate are calculated to result in degeneration to both the races. Individual instances may be overlooked, where the natural and artificial barriers have often been overcome by allowing similar condition of things to prevail. But even then when we study the home life of an Indian, rather an English educated Indian married to a European woman, we find it is most disappointing and hence a mixed blood of entirely different ideals and cultures makes a *brew of evils such as we find in the new races–as the Mexicans, the* Negroes of America, the issues between the Chinese and the white

people in the United States of America and the Eurasians or the so called Anglo-Indians of India. The Anglo-Indians are the descendents of the various early European settlers and low-class Hindu mothers. Among all these, we find again, they cannot escape the dark side of the heritage of such mixed marriages. Then again no advantage can be expected of an alliance with a European girl when the husband has no western education. His habits of life and ideas of comfort are absolutely in disagreement with those of his wife and vice versa. If we take it for granted that an English educated Hindu can make himself happy in his matrimonial life, but then he will be obliged to live a life of exclusiveness from society and that exclusiveness might deter him from doing his duty to his country as a member of that society. And then if the most enlightened individuals of a community cut themselves off from all contact with their less fortunate brethren where are we to find reformers who by force of examples—personal influence and acts of sympathy will work to improve the moral and material condition of the masses and especially that of the women? It is needless to point out that our social regeneration depends solely upon the status given to the women of our country and unless, that is improved; i.e., unless the Hindu women are educated by hundreds of thousands there is hardly any hope of effecting any real good in the national life. Of-course by education I do not mean talking and speaking a few words in foreign language or oeven expressing ones ideas in a foreign language or becoming a Film Star is real education. But we may leave out this subject here for the present and to come back to the point, I suppose along with the regeneration of the feminine side of India the well-being of the country lies in the union between the people of its different provinces. India is a vast country or a sub-continent. There are various groups of people from one end to the other. From Punjab to Cape Comorin and from Bengal to Bombay and Sindh. If the people of one place are wanting in good physique the people of another place can fill up the deficiency. Then again this union will heighten the intellectual power and refine the culture of the one who is behind the other. In spite of the fact that there are different races in different parts of India—our tradition being similar and our religion, habits and custom being identical it will not at all be difficult for a man or a woman to get himself or herself adjusted to the homelife of the other. One great benefit of such unions will be that the country will be united into one

whole inspite of the unceasing propaganda of the third party to cut up Mother India into pieces and thus to bring disruption and distrust among the people of different parts of the country. We should have our guard against that. —We all belong to our mother country the great Hindustan or Bharatvarsa. No splitting up of our Motherland. Let us be united and let our body and soul be uplifted. We must carry on propaganda work all over the country and be in real earnest and help to popularize such inter provincial marriages.

# Presidential Speech in Girls' Physical Culture

I am thankful to you for the honour you have done me by asking me to preside over this function. I feel that you have not made a right choice by asking me to preside this evening, as I am not an athlete nor medical man to decide the sort of physical training a girl ought to have. I am a woman and I could only refer to the subject like a woman.

I suppose, physical culture or proper and exercise of the body, which will keep us fit in the daily walk of life is one of the greatest importance for everyone. It is as important for the girl as it is for the boy. But alas! nowhere it is less realized than it is in India of present day.

Personally I believe that every female child as the mother of the future race should be given full training both physically and mentally. Practically we find that when sowing seeds in a field, no matter if the seed is of the best quality, the crop is not of the best type if the soil is bad. Where the field is not properly ploughed and furrowed, where it is not cleared of weeds and shrubs, where the soil is not strengthened and well-nourished with good manner it yields an unpleasant stuff. The same in animal life and with humanity. One can never expect a good race of people from women who are the age of 9 or 10 yrs. of their life kept confined within enclosure of 4 walls. Their body and mind shattered and narrowed by constant living in the same atmosphere and not coming out and mingling with the outer world.

By mental culture, of course, we do not mean, that cultured person must necessarily be unusual in their thinking and feeling and willing, nor by physical culture, even for women, need we mean anything out

of the way or anything very extra-ordinary. As in the absence of proper cultural development of the mind, we fail to understand a thing! Similarly it appears to me that we can neither enjoy life nor prove useful to the society at large, if we do not developes by culture or exercise, our body along with our mind. Lately there have been a world-wide recognition and demand for education of women. And there have been establishment several school and colleges for girls all over the country, although they are not at all sufficient to requirement. Unfortunately, the mode of teaching and the proper subjects for women education, why even for ours boys, have not yet been correctly decided. What has been absolutely wanting in the curriculum is the physical training for the girls. It seems that educational authorities of U.P. have no where thought out to solve the problem. It is therefore a matter of great credit for the Mahila Vidyapitha at Allahabad that the authorities are effectively drawing attention of the public by this function. But at the same time I hope the authorities will not blindly imitate and follow things either from foreign countries or from things that are prescribed for our boys. We must certainly improve things and go forward with the ever progressiveness of the world but perhaps in accordance with the receptive contribution of the receiver.

Physical culture as I said before is a matter of great importance both to men as well as women. But we have to proceed carefully and as regards girls, we must chalk out a right course for them. Manly woman and effeminate man are surely not needed for the world.

We may enjoy a thrill to see women in circuses performing the acrobatic feats and competing wonderfully with the other sex. But that does not mean that we should get the same sort of pleasure to see our daughters and sisters doing the same, we may spare just a few to be circus girls, but we do not want to see women in general becoming circus girls.

Physical training which a girl should have, is that, which will enhance her power of mental ability-that, which will make her healthy, happy and contented. Consequently along with the mental culture, physical culture is also essential. Why! I should say proper exercise of the body is absolute necessary to retain the God given beauty of a woman's physique. There may be other causes, but sedentary habit and absence of physical exercise of any sort among the women of well

to do families in our country are the chief reasons for the disfigurement of their bodies.

For exercise, however, women in general need not take vigorous manly exercises like polo, football, cricket, hunting and such other manly games, which sometimes, even do not suit women of different climate. There are long breathing and open-air exercises like walking and swimming also moderate riding and other light games.

In the house keeping itself there are healthy and pleasant exercises for educated and well to do women. Only if they did not think that it was below their dignity to do any domestic duty.

We expect much from our girl students, but it is a matter of regret, that our College and High School girls, infact, care more their physics than for their physique. While on a visit to some college hostels and boarding houses in Calcutta, to my great amazement, I found several girls taking by doctor's advice Ray-mali scott's emulsion or kalzana–some stimulating and body-building stuff to keep them fit. It is because very few of them take any interest in games or sport that is any recreation for the brain or body whether out-door or indoor. They prefer to be let alone with their books only.

The increase in pulmonary deseases among male and female students is too much conspicuous at present time to be overlooked.

Then there is also another side of physical training for women. That is for self-defence their muscle must be made strong. If such training as the other gets, is not suitable for the girls' requirements, to certainly in need of that which will make women ready to fight at any moment against a cowardly attack on them by mean minded people. It is indeed sad that one rarely hears of such dastardly and disparaging display of masculine strength in any other part of our planet–than in this country.

What are the causes of this national downfall ? The negligence towards womanhood is the main cause, may be the answer. The despotic mile of one towards the other is, no doubt, another reason of the degeneration of our mother country.

To improve things there should be complete regeneration of Indian womanhood. They must breathe a new and that vigorously. Let parents in every home see that their daughters get the same training regarding the development of their body and mind side by side to their brothers. Let every Indian school and college make special and compulsory

arrangement for physical excercise for girls student that may be appropriate to the requirement of woman's limbs. Not one, but we must have dozen of this Mahila Pithas in villages and towns where girls from their early age may get training mental as well as physical, both, so that, they may have a sound strong and healthy body and mind and that may not be a burden some dependent on men.

We hope to see the time, when the Indian women would stand side by side with man in their daily walking of life and not be a submissive machinery of idealistic blusterers or a play toy of predaciously into sex. I thank again the M.V. Pith people in the namesake the womanhood of India for the benevolvent service they are doing to the motherland.

*Read at the Mahila Vidyapitha, U.P*

# সেবক সঙ্ঘের সভায় প্রদত্ত ভাষণ

হে প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ,

যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া এই সেবক সঙ্ঘ কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সফলতা লাভ করিতে পারে তা হলে আমাদের দেশের কত যে উপকার সাধিত হবে তা বলা বাহুল্য মাত্র।

আমি কোনও নতুন কথার আলোচনা করতে আসি নাই। যা দুই একটি বলব তা পুরান কথা। কেবল আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই মাত্র।

গত দশ বছরের মধ্যে দেশের ভিতর স্ত্রী শিক্ষার যে সাড়া পড়ে গিয়েছে, তা বাস্তবিকই অতি শুভ চিহ্ন। কিন্তু যখন আমি দেখি যে নারীশিক্ষা বলতে, বালিকাদের শিক্ষা, অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বটতলার গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি পড়াতেই সাঙ্গ হয়, তখন দুঃখের আর সীমা থাকে না।

সারা জীবনই মানুষের শেখবার সময়। এটি আমরা চীনবাসীদের কাছ থেকে শিক্ষা করতে পারি। চীনা ভাষায় অক্ষর নাই। ওদের ভাষা বর্ণমূলক চিহ্ন দ্বারা লেখা হয়। ঐ চিহ্ন প্রায় ৪০/৪৫ হাজারের আছে। সুতরাং ঐ চিহ্ন পড়ে স্বীয় আয়ত্তের মধ্যে আনতে জীবনের কতটা সময় ব্যয় হয় তা সহজেই বোধগম্য। কিন্তু চীনা পণ্ডিতরা অসাধারণ অধ্যবসায় সম্পন্ন। কেউ কেউ ৬০/৬৫ বৎসর বয়সেও পরীক্ষা দিয়া উচ্চ সম্মান লাভ করেছেন শুনা যায়।

স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইটি নিয়া সংসার। এইখানে সংসারকে একটি ক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ক্ষেত্রে বীজ যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন, ক্ষেত্র ভালরূপে কর্ষিত না হলে, ক্ষেত্রকে আগাছা শূন্য না করলে, ক্ষেত্রে ভালরূপে সার না দিলে, উত্তম শস্য কি উৎপন্ন হবে? কখনই না। তবে অকর্ষিত, আগাছারূপ কুসংস্কারে পরিপূর্ণ আমাদের স্ত্রীক্ষেত্র, সেখান হতে কি করে আমরা ভাল ফসলের আশা করতে

পারি? আজ আমাদের এই জাতীয় ঘোর দুর্দশা স্ত্রীলোকের প্রতি অবহেলা, অযত্ন, তাদের এক কোণে ঠেলে ফেলে রাখারই ফল।

শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আমরা অনেক কথা বলে নিশ্চিন্ত থাকতে ভালবাসি। শাস্ত্রে আট বৎসরের কন্যার বিবাহের বিধান আছে ও সেই দানে দানকর্ত্তার মহাপুণ্য হবে। ঐ গৌরীদানের ফলের আকাঙ্ক্ষা শিশুকন্যার বিবাহ দিয়ে তার বৈধব্য দশার জন্য কি পিতামাতাই দায়ী হলেন না? আর্য ঋষিদের বংশধর বলে আমরা অত্যন্ত অহংকার করি বটে; কিন্তু সে গৌরবের উপযুক্ত কাজ আমরা কি করছি? তাঁদের বংশধর বলে জগতের শ্রদ্ধা নিতে যাওয়া বরং তাঁদের সুনামে কলঙ্ক অর্পণ করা মাত্র।

বিদ্যাতে বুদ্ধির বিকাশ প্রাপ্তি হয়। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি নয়। কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থাতে নিজেদের সঙ্গত করবার জন্য আপন শক্তির সংযোগ বা পরিণতি করাও নয়। বস্তুত শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের চতুর্দিকের অন্ধকারকে দূর করবার জন্য আলোক আনা—বিশ্বের চির উন্নতির পথে অগ্রসরবর্তী হওয়া। উত্তম শিক্ষার দ্বারা আমরা চিন্তা ও কার্যকে স্ববশে আনয়ন করে আমাদের অন্তর্নিহিত প্রতিভা, প্রজ্ঞা, মনুষ্যত্ব, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে পারি।

প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে দেখেছি যে, নারীহরণ, নারী নির্যাতন প্রভৃতি স্ত্রীলোকের প্রতি নীচ ব্যবহার গুণ্ডাদের দ্বারা বঙ্গদেশে যত সাধিত হয় তত আর ভারতের অন্য কোনও প্রদেশেই হয় না। খবরের কাগজে চোখ বুলালে বোঝা যায় যে আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদের প্রতি গুণ্ডাদের অত্যাচার কত বৃদ্ধি লাভ করেছে। বহুকাল ধরে শিক্ষাবিহীন উহাদের বৈধব্য যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে পেটের জ্বালায় আত্মীয় স্বজনের উপর ভারগ্রস্ত হয়ে পড়লে কি ঘোর নির্যাতন না সহ্য করতে হয়।

মেয়েরা বিশেষ করে বিধবারা যদি নিজের ভরণপোষণ চালিয়ে দেন ও পরের গলগ্রহ না হন তা হলে তাঁরা অনেক আরামে ও স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন। কিন্তু এ সকল শিক্ষার প্রয়োজন। কেবলমাত্র অক্ষর পরিচয় হলে হবে না। অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে Vocational বা জীবনযাত্রা উপযোগী শিক্ষারও প্রয়োজন।

আমাদের theoritically সবই আছে। সমস্ত বিষয়ই শাস্ত্রে বিহিত আছে। আর ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হোয়ে ঠাকুর ঘররূপ লোহার সিন্ধুকে বন্ধ আছে। যখন নিতান্ত দরকার পড়ে তখন তাকে টেনে টুনে বার করা হয়। যেমন কচি ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় তার সামনে কালিকলম টাকা পয়সা পুস্তকাদি রেখে পরীক্ষা করা হয় তার ভবিষ্যৎ জীবন কোনদিকে বইতে পারে। অর্থাৎ সে যদি কালি-কলমটা প্রথমে টেনে

নেয় ত সে লিখিয়ে হবে, টাকা পয়সা নিলে অর্থ রোজগারী এই রকম। কিন্তু শিশুটি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার ঝোঁকের দিকে আর কারোর দৃষ্টি থাকে না। তাকে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে সর্বদা পড় পড় করা হয়। তাতে সময় দেখা যায় যে বালকটির পড়ার উপর বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে, যে সুযোগ পেলেই পড়ায় ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে মা বাবাকে লুকিয়ে। এতে বালকের আর একদিকে স্বভাবও খারাপ হয়ে যেতে লাগল অর্থাৎ সে মা বাবাকে প্রতারণা করে নিজেকেই মিথ্যার দিকে নিয়ে গেল। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশে ভারতবর্ষ হতে শিক্ষার পার্থক্য এই যে অন্নপ্রাশনের সময় শিশুকে পরীক্ষার এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যদিও ওসব দেশে স্কুলে গবর্ণমেন্ট বেশ ভাল করেই সাহায্য প্রদান করে। যাহাই হোক এসব বিষয় পরমুখ প্রত্যাশী হয়ে না থেকে আমাদের নিজেদের এখন থেকে সাবধান না হলে খুবই ঠকতে হবে। তাই প্রত্যেক বিদ্যালয় ও পাঠ্যালয়ে গীতা ও উপনিষদ পড়াবার ব্যবস্থা করান চাই।

# পরিশিষ্ট

১. মনীষা দেবীর অগ্রন্থিত রচনা

# স্বদেশের উন্নতিকল্পে মহিলাদিগের কর্তব্য

মহামান্যা নাটোরের মহারাণির সভাপতিত্বে মহিলা সমিতির ২রা আশ্বিনের অধিবেশনে এই প্রবন্ধ লেখিকা কর্তৃক পঠিত হয়। মহিলা সমিতির জন্য লিখিত। সন ১৩১২ সাল ২৮ ভাদ্র।

মহিলা সমিতি হইতে আমাকে কিছু বলিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, যে আমার লিখিবার শক্তি তেমন নাই। যদি কোনো দোষ দেখেন তাহা হইলে তাহা সংশোধন করিয়া দিলে ও ত্রুটি মার্জনা করিলে বাধিত হইব।

লিখিতে আরম্ভ করিয়াই আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে মনে পড়িতেছে। তিনি আমাদের ছেলেবেলা হইতেই সাধ্যমতো স্বদেশি ও বিদেশি দুই রকম শিক্ষাই দিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। গৃহস্থালি রান্না হইতে, গান বাজনা ও ঢাল তরোয়াল খেলা, তির ধনুক .......মুগুর ভাঁজা এবং বাংলা ও ইংরেজি সব দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল, তিনি মাকে ও আমার বড়ো ভাই-বোনেদের প্রায় যত রকম দেশি বাজনা করতাল, বাঁয়া, তবলা, বেহালা, সেতার, এসরাজ, সারঙ্গ, বীণ্ প্রভৃতি এবং আরেক দিকে পিয়ানো বাজনা, ছবি আঁকা, ডাক্তারি শিক্ষা, হার্প ও ইংরেজিতে স্বরলিপিতে হিন্দি গান স্বরলিপিবদ্ধ করা প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষা বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতিও তাঁহার যেরূপ টান ছিল ইংরেজি সেকসপিয়র, মিলটনের প্রতিও তাঁহার সেইরূপ টান ছিল। আমি আমার পিতার কাছে পড়া শিখিতাম ইহা আমার বেশ মনে আছে। কিন্তু তখন আমি খুব ছোটো । মাকে ও বড়ো ভাই-বোনদের যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন তাহারই ছায়াতে আমরা যাহা অল্প কিছু শিখিয়াছি। পিতা আমাদের দেশি ভাব বরাবর বজায় রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইবার জন্য বিদেশি শিক্ষারও দরকার বোধ করিতেন। স্বদেশি ভাব

আমাদের গৃহে বরাবরই আছে। স্বদেশ আর কী স্বগৃহ বলিলেই চলে।

কিন্তু আজকাল রাজশক্তি প্রভাবে ও রাজনীতির আন্দোলনে বঙ্গদেশের প্রায় সর্বস্থানেই স্বদেশি স্বদেশি একটা হৈ-চৈ পড়িয়াছে। দেশের উন্নতি ও দেশীয় শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে। আজ এখানে, কাল সেখানে পুরুষদের মধ্যে আলাপ ও মেলামেশা চলিতেছেই আবার মেয়ে মহলে ও সমিতি ও মিটিংয়ের অভাব হইতেছে না। কিন্তু খালি সমিতিতে কতকগুলি মেয়ে কী পুরুষ একত্র হইলেই কি উন্নতি হয়? দেশের কাজ করিতে হইলে সর্বাগ্রে স্বার্থত্যাগ ও ধর্মবল চাই। ভগবানকে সহায় চাই। আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ বোধ হয় কেহই একবার ভুলিয়া ভগবানকে ডাকি না আবার আমরাই দেশের উন্নতি লইয়া ব্যস্ত। আগে হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা ছিল প্রাতঃস্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়া জপ আহ্নিক করিয়া তারপর বৈষয়িক বিষয়ে লাগা। এখন বেশির ভাগ দেখা যায়, বিছানা হইতে উঠিয়াই বিলাতি আদবে আগে চা পান করা চাই নইলে কোনো কর্মই সিদ্ধ হয় না। আমাদের দেশে কোনো জাতিতে মিল নাই। আগে ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আর আজকাল এক ব্রাহ্মণ থেকেই বোধ হয় পঞ্চাশ রকম শাখা বাহির হইয়াছে। কেহ কাহারও ভালো দেখিতে পারে না—সকলেই আপনি সেরা হইব এই চেষ্টায় মত্ত। ইহাতে কি দেশের মঙ্গল হয়? একটা কাজ করিতে হইলে একতা চাই, আর কতটা স্বার্থত্যাগ করিতে হয় ইহা কি কেহ মনে ভাবিয়াছেন? এই যে কথা উঠিয়াছে 'বিলাতি জিনিস ব্যবহার করিব না, দেশি জিনিস কিন্তু সাধ্যমত করিব।' 'কিন্তু সাধ্যমতোর' আবশ্যক কী? মহিলা সমিতির ভিতর এমন অনেকেই খুব বড়োলোক আছেন যাঁহারা ইচ্ছা করিলেই সমস্ত বিলাতি জিনিস ত্যাগ করিয়া দেশি জিনিস ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু বিলাতি সখের জিনিস, কাপড়ের ভালো রংটুকু ফাইন মসলিন, কাহারও ত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই। কী দেশি কী বিলাতি সব জিনিসেই সস্তা, মাগ্গি আছে। আমাদের কল নাই, কাজেই দেশি কাপড় বিলাতি কাপড় অপেক্ষা সস্তা হইবার জো নাই। বড়ো বড়ো বাবুরা টপ টপ করিয়া রবরটায়র ল্যান্ডো গাড়ি চড়িয়া হওয়া খাইয়া আসিতেছেন, আর ঘরে বলিতেছেন তোমরা বিলাতি জিনিস ব্যবহার করা ছাড়, দেশি জিনিস ব্যবহার ধরো। ভাবিয়া দেখিলে সেই আস্ত তৈয়ারি গাড়িখানি এবং তাহার যাহা কিছু মালমশলা সবই বিলাতি। প্রকৃত স্বদেশি হইতে হইলে গাড়ি ঘোড়া, ট্রেন, ট্রাম, গভর্নমেন্টের চাকরি, ইংরেজি শিক্ষা, পিয়ানো বা হারমোনিয়াম বাজনা, সাহেবি হোটেলে খাওয়া, বিলাত যাওয়া, বিবি বিয়ে করা এ সকলই ছাড়িতে হয়। যেমন

মুসলমানদের আমলে আমরা একরকম অন্ধ অবস্থায় ছিলাম—এখন আবার সেই ধানভাঙা অবস্থায় আসিতে হয়।

ধানটি ভাঙি খুদটি খাই,
চালটি রাখি ঘরে
তাও নিয়ে যায় চোবে
আমি যাই সাত পেয়াদার তরে।

কেহ মতলব করিয়াছেন কেরোসিন আলো পরিত্যাগ করিয়া আগের ন্যায় মাটির প্রদীপ জ্বালা হউক, আচ্ছা —ভগিনী ভাবিয়া দেখুন এই যে আজ কলিকাতা শহরে প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক আলো ও পাখা চলিতেছে, ইহা কি আপনারা পরিত্যাগ করিয়া সেই মাটির পিদিম ও হাতে হাতে সব তালপাতার পাখা ও দিশলাইয়ের পরিবর্তে চকমকি ব্যবহার করিতে পারেন? আর তাহা করিলেই কি ভালো হইবে। আধ ঘণ্টা ধরিয়া একটি চকমকি ঘষিয়া যদি আলো জ্বালিতে হয় তাহা হইলে এই বুঝিব যে 'সময় যে অমূল্যধন' তাহার ব্যবহার এখনো আমরা শিখি নাই।

এইজন্যই বলিতেছি, বিদেশকে একেবারে এতটা কুৎসিৎ ঘৃণা করা স্বদেশের মঙ্গলজনক নয়। এই বিলাতি সভ্যতা ও বিজ্ঞানের ফলে আমাদের দেশে কত উপকার হইয়াছে। সকল দেশের শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি লইয়া তবে একটা দেশ বড়ো করিতে হয়। বাণিজ্য, ব্যবসা, দেশবিদেশে চলাচল না হইলে সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, কথাতেই আছে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'। মনে করুন, আজ এই হুজুগে ইংরেজরা তাহাদের দেশের যাহা কিছু আমাদের এখানে আনা বন্ধ করিয়া দিল, তাহা হইলে আমাদের কী দুর্গতি হয়? স্বদেশকে কে না ভালোবাসে? স্বদেশ মানেই হইতেছে, আপনার দেশ। আপনাকে যেমন ভালোবাসা কাহাকেও শিখাইতে হয় না সেইরূপ স্বদেশকেও ভালোবাসিতে কাহাকেও শিখাইতে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া স্বদেশকে ভালোবাসিব আর বিদেশকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব, ইহা হইতে পারে না। বিদেশও যে সকল বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা উন্নত তাহা তাহাদের কাছে শিক্ষা করিয়া স্বদেশের করে উপহার দিতে পারিলে তাহাতে দেশের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। যেমন তুমি চাও কেহ তোমাকে অথবা তোমার দেশকে ঘৃণা না করে, তেমনি তোমারও বিদেশকে ঘৃণা করা উচিত নয়। আমাদের শাস্ত্রে আছে 'অসাধুং সাধুনা জ্যপে' সাধুতা দ্বারা অসাধুতা জয় করিবে। এই মন্ত্র জপিলেই বোধ হয় দেশের ও দেশীয়দের মঙ্গল হয়। এ মন্ত্র

সব দেশেই আছে। একটা কথা আছে ' Honesty is the best policy.'

দেশকে উন্নত করিতে হইলে আপনাদের আগে উন্নত হইতে হইবে। বিলাতি জিনিস ছাড়িয়া দিশি জিনিস ব্যবহারেই উন্নত হইবে না। আজ আমাদের দেশ মদ্য ও চুরুট ইত্যাদি নেশায় ছারখার হইয়া যাইতেছে, কত লোকের সর্বনাশ হইতেছে, কত পয়সা বিদেশে যাইতেছে। ভগিনীগণ, পুণ্যব্রতের দিকে লক্ষ রাখো। আজ যদি আমরা ঘরে ঘরে 'মদ্যমপে মদ্যমদেবং, মদ্যমগ্রাহ্যং' এ মন্ত্র ভাই, বন্ধু, পিতা, পুত্র, সকলকে জপাইতে পারি তবে অনেকটা দেশের কাজ হয়।

দেশের লোকের মন কিসে অধঃপাতে যাইতেছে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। আমাদের মন উন্নত করিতে হইবে। এই নেশাটা ছাড়াইতে পারিলে অনেক উপকার হয় তাই বলিয়া আমি বিলাতি মদের বদলে দেশি মদ বা গাঁজা, গুলি, আফিং ইত্যাদি ধরিতে বলিতেছি না—সব রকম নেশাই ছাড়িতে হয়। এই যে আজ ছোকরা মহল 'বিলাতি কাপড় পরিব না' বলিয়া চিৎকার করিতেছে—এই সঙ্গে বিদেশি সিগারেট ত্যাগ করিয়া যুবকেরা অধিকতর মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু কোনো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি সিগারেট ছাড়িয়া দেশীয় বিড়ি ধরিবার পরামর্শ দিয়াছেন—ইহা উচিত হয় নাই। এই সময় মহিলাদিগের সামান্য উৎসাহ পাইলে তাহারা এতটা বল পাইতে পারে যে বিড়ি বা সিগারেট বা কোনোরূপ ধূমপানে তাহাদের অভিরুচি হইবে না।

বিদেশি দ্রব্য পরিহারের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি কাপড় পরিত্যাগ করিবার কথা বড়ো প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু দেশি বস্ত্র ব্যবহারেও আমরা প্রকৃতপক্ষে বিলাতেরই অধীন। যখন আমাদের কাপড়ের সূত্র অনেক পরিমাণে বিদেশে রহিল তখন কী করিয়া বিদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ সূত্র ছিন্ন হইবেক? তবে স্বদেশির ভাণ্ডার হৌক, একটার বদলে দশটা ভাণ্ডার হৌক, বিলাতি কাপড়ের ন্যায় স্বদেশীয় কাপড় সস্তা হৌক গরীব দুঃখী সকলে যাহাতে ব্যবহার করিতে পারে, এমন করা হউক—তাহা হইলে এক্ষণে আমরা দু-চার জনে যাহা করিতে সমর্থ তখন তাহা সর্বসাধারণে সুখের সহিত স্বদেশীয় জিনিস ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে।

সংসারের অন্দরমহল ও বাহিরমহল আছে—ভাবিয়া দেখিলে সকলই মেয়েদের উপর ন্যস্ত। স্বভাবত মেয়েদের ধর্ম কী? যাহা কিছু রক্ষা করা ও পালন করা। মেয়েরা যদি একটু বুদ্ধিপূর্বক কাজ করেন, তাহা হইলে পুরুষরা তাঁহাদের মতেই চালিত হন। দেখিতে গেলে সকল বিষয়ের অন্দর মহল আগেই আছে। শরীর ও মন—মনটা যেন অন্দর, শরীর বাহির। আগে মন কাজ না করিলে শরীরে

কাজ হয় না। সেই জন্য মনে হয়, অন্দরের মেয়েরা যদি কোনো বিষয়ে লাগিয়া পড়িয়া উঠিতে পারেন,তাহাতে পুরুষদের কোনোই আপত্তি থাকিতে পারে না। চেষ্টা করিলে মেয়েদের দ্বারা অনেক কাজ হয়। শিল্প বিষয়ে আমরা দেশের উন্নতিকল্পে অনেকটা সহায়তা করিতে পারি।

এই মহিলা সমিতির সভ্যদের উদ্দেশ্য করা চাই, শুধু মেয়ে বন্ধুদের না, আপনার ঘরের পুরুষেরও যাহাতে উন্নতি হয় সেই চেষ্টায় ব্রতী হওয়া। দেশের উন্নতিতে অনেক স্বার্থত্যাগ চাই। আজ আমাদের বাঙালিতে সেই ত্যাগস্বীকার করিতে চেষ্টা পান। নেশার পয়সা অন্য কাজে লাগান যাউক। কোনো যুদ্ধের সময় কতকগুলি ধনী ইংরাজ মহিলা চায়ের সঙ্গে চিনি খাওয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা সকলেই শুনিয়াছেন। ইহা শুনিতে সামান্য কথা, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে ইহা সামান্য স্বার্থত্যাগের কথা নয়। দেশের কার্যের জন্য কত লোককে কত রূপে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়।

দেশের উন্নতিতে সকলে একমন, একপ্রাণ হওয়া চাই। আমি বড়ো হব করিতে গেলে চলিবে না—দ্বেষ, হিংসা, নেশা প্রভৃতি যাহা কিছু খারাপ সব ত্যাগ করিয়া উন্নতমনা হইয়া কাজ করিতে হইবে। দেশ বিদেশের প্রতি হিংসা দ্বেষ পরিহারপূর্বক অন্তরের সঙ্গে সৎকার্যে ব্রতী হইতে হইবে। ইহাতে ভগবান আপনিই সহায় হইবেন। প্রথম হইতে যদি আমরা সকল দিক বজায় রাখিয়া—স্বদেশের যাহা ভালো তাহা সংরক্ষণ পূর্বক এবং বিদেশের যাহা ভালো তাহা আহরণ করত সাবধানে চলি এবং ধর্মের কেন্দ্র হইতে পরিভ্রষ্ট না হইয়া পুণ্যপথে অগ্রসর হই, তবেই মঙ্গল।

এসো, আজ আমরা সকলে মিলিয়া এক সুরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এই কল্যাণজনক কাজে উদ্যম ও চেষ্টা সফল করেন ও মহিলা সমিতির সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন।

## ২. শোভনাসুন্দরী দেবীর অগ্রন্থিত ভ্রমণকথা

## ক. য়ুরোপে মহা-সমরের পরে

সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চল্লাম, সূয্যিমামার দেশে—সুদূর বিলাতে ; সূয্যি মামা চাঁদা মামির এখন দেখা পেলে হয়। রাবণের গর্ব—ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ আদি-দেবতারা তাঁর সিংহদ্বারে বাঁধা থাকত—

পবন ঢুলাত মৃদ্যু মলয় চামর
সর্ব্বকালে নিত্য বরুণ ভরতি জল
স্কন্ধে ভার ভারী যথা! ইন্দ্র দৈনন্দিন
যোগাইত ফুল-মালা-মন্দারের দাম
মালিরূপে! যম-দৌবারিক দণ্ডধারী!
চন্দ্র পূর্ণকলা-ভাতিত কৌমুদী-জালে
চারু লঙ্কাপুরী প্রতিনিশি সশঙ্কিত!
নলিনীবল্লভ ভানু হিরণ কিরণে
জাগাত নলিনী মাত্র তার দীর্ঘকায়,
প্রতি প্রাতে,—ভয়ে সদা প্রাংশু অংশুমালী।

ব্রিটেনদিগেরও গর্ব—সূয্যিমামা সোনার টোপর পরে, অরুণ রথে চড়ে তাঁদের রাজ্যে রাজ্যে আলো বিলি করে বেড়ান। তাঁর বেচারী সাতটি ঘোড়া একবারও আস্তাবলে ঢুকতে পায় না—চব্বিশ ঘণ্টা মুখে লাগাম লেগেই আছে। এত দূরে *দূরে বিস্তৃত ব্রিটিশ রাজ্যগুলি যে, অরুণ রথটি এক রাজ্যে নামছে, আর এক* রাজ্যে উঠছে।

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে সূয্যিমামা অস্ত যান না বটে, কিন্তু ব্রিটিশ রাজলক্ষীর পুরী-ব্রিটিশ রাজ্যের কেন্দ্র খাস লন্ডন নগরে সূয্যিমামা উদয় হন কি শপথ করে বলা

শক্ত। সর্বদাই আকাশ ঘনঘটাছন্ন। সর্বদাই যেন মেছুনির ভিজে জাল থেকে টিপ্ টিপ্ করে জল পড়ছেই। বাংলাদেশের সেই বৃষ্টির ছড়াটা মনে পড়ে—'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান।' বিলাতে টাপুর টুপুর বৃষ্টিও পড়ে না, নদীতে বানও আসে না—এই যা প্রভেদ। সূয্যিমামা চাঁদা মামিকে দেখবার জন্য সেখানকার লোকরা চাতক পাখির মতো উর্ধ্বমুখে আকাশ পানে তাকিয়ে থাকে! রাজপুতানায় সময়ে সময়ে টাকায় 'কটোরা-পানি' বিক্রি হত, বিলাতেও সূয্যিরশ্মি ধরে বোতলে করে বেচতে পারলে বেশ লাভ হতে পারে, মাড়োয়াড়িদের এবিষয়ে ধ্যান করা উচিত। সেখানে 'স্যন-সাইট' এক্ট বা আইন আছে—গ্রীষ্মকালে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়ে সকাল সকাল দোকান-অফিস কল-কারখানায় কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হয়, আলো থাকতে থাকতেই কাজও হয়—তৈল-বাতির খরচটা বেঁচে যায়। সারা বিলাতের 'তেল-বাতি' গ্যাস ও বিজলি ছাড়া আর কী? আমি সেই গ্যাস ও বিদ্যুৎ-বিভাসিত সাগর কল্লোলিত ব্রিটিশ রাজলক্ষীর পুরী লন্ডন নগরে চল্লাম 'যেখানে উপরে জাহাজ চলে, নীচে চলে নর' আমি সেই কোলাহলময় কলকারখানার দেশে চল্লাম যেখানে বসন্তে পিক ডাকে না। 'ট্যাক্সির' বাঁশিতে কর্ণ বিদীর্ণ হয়, যেখানে কৌমুদীর পরিবর্তে বিজলির আলো রাজপথ আলো করে, যেখানে সূর্যমুখী সতী ও নলিনী সতীন সূর্যদেবের সেবা করতে পান না, যেখান হতে কী ছুঁচ কী লজ্জা নিবারণের বস্ত্র জাহাজ ভরে ভরে এদেশে চালান করা হয় আমি সেই কোলাহলময় কলকারখানার কেন্দ্র ভারতের ভাগ্যবিধাতার ভূবৈকুণ্ঠ লন্ডন নগরে চল্লাম। বম্বে বন্দরে জাহাজে চড়ব। ৯ই তারিখে ভাসব। শনিবার একটায় দিনে দিনে। 'বিদায়' বা 'যাই' কথাটা বলতে নেই তবে আসি।

## ২

'আসি'

হায়! 'আসি' কথাটা কী কঠোর। বাংলা ভাষায়, বাংলা অভিধানে এর চেয়ে কঠোর কোনো শব্দ আছে কী সন্দেহ। হায়! কত যাত্রী 'আসি' বলে যায়, আর আসে না। কত বন্ধু-বান্ধব 'এসো' বলে আসিলেও আর দেখা হয় না। 'আসি' ও 'এসো' শব্দের ভিতর কী ভয়ঙ্কর tragedy-ই না নিহিত আছে—কৃষ্ণ ব্রজ ছেড়ে মথুরায় গেলেন, আসি বলে শ্রীরাধার কাছে বিদায় নিলেন কিন্তু হায়! আর ফিরিলেন না! কত না গান এই ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে।

একটা মনে পড়িল রাধিকা বিলাপ কচ্চেন—

ক্রুর অক্রূরের সাথে যাবে শ্রীমুরারী
ত্যাজি গেল হায়! যমুনার পার
যাত্রাকালে বলে গেল 'হে রাধে পিয়ারি!
বসন্ত আসিলে ব্রজে আসিব আবার'।
কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জরিছে ভ্রমরের দল—
মুহুর্মুহু ডাকে পিক নীল নভস্থল।
কোথা কালা! বসন্ত যে এল ব্রজধামে!
আবার আসিব বলে এলে নাকো আর।
না না এ বসন্ত নহে— বৃথা গঞ্জি শ্যামে
অকালে এ পিক-ডাক ভ্রমর ঝঙ্কার,
নীল নভস্থল! মন কোর না সংশয়—
বসন্ত আসিলে হরি আসিবে নিশ্চয়।

সুদুর অতীতে কোনো পৌরাণিক যুগে অগস্ত্য ঋষিও আর্য-ভ্রাতৃবর্গের নিকট চির কালের মতো বিদায় নিয়ে দক্ষিণাত্যে আর্য-ধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন আর ফিরলেন না! বিন্ধ্যাচল তখন রবি-শশীর গতি-ভাতি বোধ করে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অগস্ত্য বলিলেন 'হে বিন্ধ্য! তুমি অবনত হও। আমি তোমার উপর দিয়ে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করব আমার পথ আটকিও না।'

বিন্ধ্যাচল তৎক্ষণাৎ তাঁর পদতলে মাথা অবনত করলে এবং অগস্ত্য বিনাক্লেশে তাহার উপর দিয়ে দাক্ষিণাত্যে গমন করলেন। যাত্রাকালে বললেন 'হে বিন্ধ্য। যতদিন ফিরে আমি না আসি তুমি লক্ষীটি এই অবস্থায় থেকো'।

যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়েছে, কত রাজ্যের উত্থান পতন ও পুনরুত্থান হয়েছে, কত পুরাতন জাতি কালের কবলে পতিত হয়েছে, কিন্তু আজও বিন্ধ্য অবনত মস্তকে অগস্ত্যের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করছে। হায়! বিন্ধ্য! তোমারই মতো ভারতের আর্য সন্তানদিগেরও মাথা আজও অবনত আছে।

পুরাকালের কথা থাক সেদিন উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব ভাগে একাধারে ভারতের ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষার আদি সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় তাঁহার রোরুদ্যমান স্বজাতির নিকট বিদায় নিয়ে বিলাত যাত্রা করলেন। শেষ মোগল সম্রাট ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিকট থেকে 'ভাতা' বাড়াবার জন্য 'রাজা' খেতাবে ভূষিত

করে তাঁকে বিলাত পাঠান! হায়! আকবরের বংশধরের কী মহাপতন। সসাগরা ভারতের অধীশ্বর হয়ে শেষে কিনা একমুঠা ভিক্ষার জন্য হাঁটু গাড়া মাথা খোঁড়া।

ওমার খইয়ামের সেই রুবেইয়াৎটা মনে পড়ে 'ললাট পরে নিয়ত দেবীর ভাগ্যলিপির হস্ত ছাপ উঠবে না সে চেষ্টা বৃথা এসব মনস্তাপ। দীর্ঘ নিশ্বাস উঠুক না হয়, কলজে ফাটা অশ্রুধারা ভাগ্যদেবীর হস্তটি না ধরবে লেখন পুনর্বার।' প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার যেমন মিলন রাজা রামমোহন রায়েরও জীবনে তেমনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গুণরাশি একত্রে সম্মিলিত ছিল। সমগ্র মানব জাতির উন্নতিই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মতো স্বাধীন চিত্ত প্রেমিক দ্বিতীয় ছিল না বললে অতুক্তি হয় না। স্বাধীনতা হীনতা কোন্ মহাত্মার হৃদয়ে না আঘাত করে? যখন তাঁহার জাহাজ মাঝসমুদ্রে, দূরে আর একটি জাহাজ দেখা দিল—এটা কি কোনো প্রেত জাহাজ? জাহাজটি ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হল, এটা ত্রিরঙরঞ্জিত পতাকাধৃত প্রজাতান্ত্রিক ফরাসি জাহাজ ; পতাকায় 'স্বাধীনতা' 'সাম্য' ও 'মৈত্রী' প্রকট করা ছিল, তিনি কাপ্তেনকে জাহাজ থামাতে অনুরোধ করলেন। কাপ্তেন মুহূর্তেকের জন্য জাহাজ দাঁড় করাইল। রাজা রামমোহন রায় তৎক্ষণাৎ সেই স্বাধীনতা দ্যোতক ফরাসি পতাকাকে অভিবাদন করে, যেমন জাহাজে পা দিলেন, অমনি দড়াদড়িতে পা জড়িয়ে পড়ে গেলেন, হায়! যাবজ্জীবনের জন্য খোঁড়া হলেন। এত বড়ো স্বাধীনতাপ্রিয় মহাত্মা জগতে দুর্লভ।

হায়! তিনি সুদূর ব্রিটেনের ব্রিস্টল নগরে 'আরনোজ ভেলে' আজ শায়িত আছেন। স্বাধীন ব্রিটনরা তাহার সমাধি-ভস্ম যত্নের সহিত সংরক্ষা করেছে। এই সমাধি ভস্মের উপর পূজ্যপদ প্রপিতামহদেব (ঁ দ্বারকানাথ ঠাকুর) একটি মনোরম ছত্রী স্থাপন করে গেছেন।

ভারতে এখন স্বাধীনতার মলয় সঞ্চার হতে আরম্ভ হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় জীবিত থাকলে আজ তার কী আনন্দ হত। রাজা পরীক্ষিত যেমন মৃত সর্পকে উত্তোলন করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়ও তেমনি এই মৃত জাতিকে উত্তোলন করে গেছেন। তাঁহার আত্মা আজ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে ভারতের ভাগ্য সংরক্ষণ করছেন—

আরনোজ-ভেলে' রম্য উপতাকা ভূমে
চির-নিদ্রাগত তুমি বঙ্গের উজ্জ্বল মণি।
আনিব দেশের বারি। সুদূর ব্রিস্টলে
শ্যাম ধরণীর কোলে, (মায়ের অঞ্চলে

যেন), রহেছ শায়িত হে স্বাধীন চিত!
কিন্তু তব পুণ্য নাম পুণ্যশ্লোক!—লবে
গৌড়বাসী চিরদিন তব পুণ্যবাণী
নাদিবে সমাধি ভেদি দিক-দিগন্তর!
ধন্য বঙ্গ তব জন্মে! ধন্য ভূ-ভারত!

হায়! মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দশ বৎসর না হতে হতেই আবার পূজ্যপাদ প্রপিতামহদেব ঁদ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত যাত্রা করলেন। তিনি তখন স্বনামখ্যাত তৎকালীন Union Bank এর সর্বেসর্বা Director ছিলেন এবং তাঁহার 'Patience' নামক জাহাজ দেশদেশান্তরে এমন কী মার্কিনেও ভারতীয় রেশমের কাপড় জোগাইত। তিনি যখন বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের নিকট বিদায় নিলেন কে ভেবেছিল যে তিনি মহাত্মা রামমোহন রায়ের ন্যায় সুদূর ব্রিটেনে দেহ ত্যাগ করবেন?

ইংলন্ডে পা না দিতে দিতেই কী রাজা কী প্রজা সকলেই তাকে লুফে নিলেন। ভোজের পর ভোজ চলতে লাগল। হায় এই ব্রিটিশ আতিথ্যই তার কাল স্বরূপ হল, তিনি লন্ডনে টেমস নদীর সন্নিকটে Kensal Green নামক 'All Souls Cemetry' তে অনন্ত শয্যায় শায়িত আছেন। —হায়!

কোথা ছিল দারাসুত সেকাল প্রবাসে?
স্বাধীন ব্রিটেনে করে অনল সংস্কার!
স্বাধীন-ব্রিটেনে স্বাধীন-ব্রিটন পাশে
স্থাপিলা সমাধি স্মৃতি যতনে তোমার
চিতাভস্ম পরে—কিন্তু-হায়! (সুধাই বা কারে?)
কে মিটাল মৃত্যু তৃষ্ণা সাত সমুদ্র পারে?
জ্বলে কি দেউটি তব সমাধি মন্দিরে?
হায়! সেথা নাহি জ্বলে জোনাকীর বাতি!
নাহি পরে নিশি ভালে তারকা সিঁন্দুরে!
নাহি শশী নাহি হায় কৌমুদীর ভাতি!
কে সেবে সুরভি-পুষ্পে তোমার চরণ?
কেবা দেয় ধূপ ধুনা, অগুরু চন্দন?
হে জাহ্নবী! তব কুলে যুগ যুগান্তর

বঙ্গের সন্তান কত পেয়েছে মুকতি
কিন্তু মা ঘুমায়ে আছে যোজন অন্তর
সহস্র যোজন-তব পুত্র ধনপতি
বঙ্গের পঙ্কজ রবি দ্বারিকা ঠাকুর।
কেন মা হইলি তুই এতই নিঠুর?
কি কাজ সঞ্চয়ে হায়! রজত কাঞ্চন?
দান-ধ্যান-যাগ-যজ্ঞে হায়রে কী ফল?
কী ফল সৌন্দর্যে? হায়! হায় কী ফল সৌজন্যে?
কিবা ফল গুণগ্রামে? হায়রে সকল
আছিল হে দেব! তব—এই কী ধরম?
অকালে হরিল তোমা হায়! কাল যম।
কী ফল সঞ্চয়ে বল, রতন সম্ভার?
তব ধনে ধনপতি তোমার সন্ততি,
কিন্তু নাহি করে কেহ কবর সংস্কার।
কেহ নাহি রাখে হায় তোমার স্মিরিতি!
তব সে কবরে নাহি হায়রে! সৌন্দর্য!
নাহি 'তাজ'-শোভা!—নাহি ভাস্কর-চাতুর্য।
করো না করো না শোক এই অযতনে!
ঘুমাও ঘুমাও তব কবর বিবরে
যে কবরে শুয়াইল স্বাধীন ব্রিটনে।
ঘুমাও ঘুমাও—শ্মশানে কে উচ্চে তরে
মশানে কে শত্রু-মিত্রে করে গো বিভেদ?
মরণেই হয় লয় ভেদাভেদ।
ঘুমাও ঘুমাও সেই সুদূর কবরে।
দেবতারা শান্তিবারি করিবে বর্ষণ
নিশির শিশিররূপে তব শিরপরে!
ঘুমাও ঘুমাও—ভোল হে এ অযতন
কিন্তু হায় এ সংশয়—হায় সুধাইব কারে?
কাঁদে কি হে তব আত্মা সাত সমুদ্রের পারে"

হায়! তিনিও 'আসি' বলে গেলেন আর আসিলেন না।

হায়! সে যে কালকের কথা—স্মরণ করিলে চক্ষে জল আসে—লক্ষ লক্ষ ভারত সন্তান, যাহাদের হাসিতে ঘর আমোদিত হত—আজ তারা কোথায়? পিতা মাতা বন্ধু বান্ধবের নিকট হতে বিদায় নিয়ে ভারতের Coral Strand ছেড়ে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে য়ুরোপের মহা সমরের মুখে যাত্রা করিল। তারা কি ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে গেল? তারা কি দেশবৈরী দমন করিতে গিয়েছিল—

দেশ বৈরী নাশে যে সমরে
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীর প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক তারে।

আমাদের সেই যোদ্ধা ভ্রাতৃগণ কি ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে গিয়েছিল? হায়! তাহা নয়—ভারতের স্বাধীনতা কোথায়? ইংলন্ডেরই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সে মহা আহবে জীবন বিসর্জন করতে গিয়েছিল, কি মহান নিঃস্বার্থতা। এইসূত্রে 'একিলিসের' কথা মনে পড়িল।

গ্রিসের 'হেলেন' সুন্দরীকে ট্রয়ের যুবরাজ 'প্যারস' হরণ করে নিয়ে গেলে গ্রিসপতি 'আগামেমনন্' অন্যান্য রাজন্যবৃন্দের সহিত 'ট্রয়ে' 'হেলেনের' উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন, এই রাজাদিগের মধ্যে 'একিলিস' একজন প্রধান যোদ্ধা ছিলেন। 'ট্রয়ের' যুদ্ধক্ষেত্রে আগামেমনন্ একিলিসকে অপমান করলে একিলিস তাঁহাকে ভর্ৎসনা করে একচোট শুনিয়ে বললেন—

'কী হেতু ধরিব মূঢ়! খড়গ খরশান
রে এট্রাইডিস! তোর রণে? সুদূর 'ট্রোজান'
কী ক্ষতি করেছে মোর কহ রে বর্বর
আক্রমিল রাজ্য মোর ধ্বংসিল শহর?
দেশবৈরী নহে তারা—কেন তবে মরি
তোর ভ্রাতৃবধূ তরে বৃথা হেথা লড়ি
কী কাজ রুধির পাতে? একি পুরস্কার?
রে 'এট্রাইডিস'। তোর এই চরণ প্রহার।'

হায়! আমাদের সেই সব যোদ্ধা ভ্রাতৃগণ আজ কাথায়? প্রতিধ্বনি ক্রন্দন করেছে—'হায়! কোথায়?' জিজ্ঞাসা কর 'ফ্রান্স' ও 'ফ্লান্ডারের' যুদ্ধক্ষেত্রকে! জিজ্ঞাসা করো 'আফ্রিকা' ও 'ইজিপ্টের' রণভূমিকে! জিজ্ঞাসা করো 'প্যালেস্টাইন' 'মেমপট' ও বাগদাদের শ্মশানকে! হায় বাগদাদেই আমার স্নেহের ভাসুর পুত্র প্রাইভেট সতীশ চন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুপুরীর বিশাল পথের ছায়ায় ভারতের লক্ষ লক্ষ গৃহ আজি একেবারে আঁধার হয়ে গেছে। পৃথিবীর চার মহাপ্রদেশে বা Continent-এ এই ভারত যোদ্ধাদিগের স্তূপীকৃত অস্থিরাশি পড়ে রয়েছে।

হায়! কে প্রেরিলা বীরেন্দ্র বৃন্দে কালের
কবলে অকালে? অসংস্কৃত অনাবৃত
মৃত বীর দেহে হায়! শকুনি গৃধিনী
শৃগাল কুক্কুরে মিলি তীক্ষ্ণ নখদন্তে
ছিন্ন ভিন্ন করি অন্ত্র পুরিলা উদর।

প্রাচ্য যোদ্ধৃগণের অস্থি প্রতীচ্য যোদ্ধৃগণের অস্থির সহিত সম্মিলিত হয়ে কী মহা সাম্য ও মৈত্রী ঘোষণা করছে। এতদিনে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সম্মিলন হয়েছে—মহাশ্মশান রণক্ষেত্রে গোরা-কালা—পীত-তাম্র সর্ব বর্ণের সৈনিক একত্র শায়িত আছে সর্ব বর্ণের লোপ সেই শ্মশানে।

ছি ছি! কিপলিং! ছি ছি!— তবে কেমন করে তোমার 'ভারতী' এখানে গাচ্ছে—

East is east and west is west and ne'er the twain shall meet.

প্রাচ্য সে প্রাচ্যই, প্রতীচ্য প্রতীচ্য রবে—
এ দোঁহার সম্মিলন কখন না হবে।

## খ. রণক্ষেত্রে বঙ্গমহিলা (মহাযুদ্ধের পর)

বুধবার, ১ ডিসেম্বর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ। আজ দিনকতকের জন্য লন্ডন ছাড়লুম। ভিক্টোরিয়া স্টেশনে এসে নিউ হেভেনের (New Haven) দিকে ট্রেনে করে যাত্রা করলুম। নিউ হেভেন একটা বন্দর। এখান থেকে প্যারি যাত্রীদের ইংলিশ (English Channel) চ্যানেল পার হতে হয়। ফেরী স্টিমার চলে। আমিও ফেরী স্টিমারে চড়লুম। চ্যানেলটার অবস্থা সেদিন বড়ো ভালো ছিল না। স্টিমারটা খুব দুলছিল। ডেকে বসা এক রকম অসম্ভব। আমি তো একটা বেঞ্চে শুয়ে পড়লুম। আড়াই ঘণ্টার ব্যাপার—পার হতে। শুরুতেই এই রকম। যা হোক আমি বমির হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলুম। অন্যান্য যাত্রীরা বমি করে ভাসিয়েছিল। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হলুম, তাতেও যাত্রীদের সামুদ্রিক পীড়া এত হয়নি, কিন্তু এই চ্যানেলে এ পীড়া কিছু বাড়াবাড়ি দেখলুম।

ঘণ্টা আড়াই বাদ নিউ হেভেন (New Haven) বন্দর থেকে দীপ্পে (Dieppe) বন্দরে স্টিমারটি পৌছাল। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। এইখানে আমাদের 'পাসপোর্ট' (ছাড়পত্র) দেখাতে হয়। এই পাসপোর্ট সম্বন্ধে একটু বেশি কড়াকড়ি দেখলুম। এ কড়াকড়ির কারণও ছিল। তখন আয়ারল্যান্ডে ডাবলিন (Dublin) প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক গোলযোগ চলছিল। সিনফিনরা (Sinfein) বিদ্রোহ পতাকা তুলেছিল। পাছে কোনো সিন্‌ফিন্‌ জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করে, সেই কারণে পাসপোর্টগুলি কড়া নজরে দেখত। প্রত্যেক পাসপোর্টে ফ্রেঞ্চ কন্সালের (French Consul) 'ভিসে' (Vise) বা স্বাক্ষর থাকা চাই।

আমার পাসপোর্ট দেখতে চাইলে, কিন্তু ঘটনাক্রমে উহাতে ফ্রেঞ্চ কন্সালের স্বাক্ষর ছিল না। 'পাসপোর্ট' সম্বন্ধে আমার ভালো রকম জানা ছিল না। আমার ছাড়পত্র দেখে বল্লে, এ ছাড়পত্র দস্তুর মতো নয়। যাত্রীদের মধ্যে একটা হুলস্থুল

পড়ে গেল। কেউ বল্লে প্যারি (Paris) তে যেতে দেবে না, ওই খানেই আটকে রাখবে। কেউ বল্লে যে পরের স্টিমারেই লন্ডনে ফিরে যেতে হবে। সেদিন আর কোনও লন্ডনে ফিরে যাবার স্টিমারও ছিল না। তাহলে আমাকে একরাত্রি ওই দীপ্পে (Diepee) তে কাটাতে হবে ভাবলুম। এরকম আটক আমি পছন্দ করলুম না। তখন দেখলুম তর্জন গর্জন ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। রেগে বল্লুম ভিসের সম্বন্ধে কী বলছেন? আমি এর সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানিনে। ইন্ডিয়া অফিস থেকে এই ছাড়পত্র পেয়েছি। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না ব্রিটিশ পাসপোর্ট অফিসার মিস্টার স্কটের জ্বলন্ত দস্তখত রয়েছে? আমাকে যদি প্যারিতে যেতে না দেন তো আপনারাই এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হবেন।

তখন এই অফিসারটি নাকের ডগায় চশমা এঁটে মিস্টার স্কটের দস্তখতটা পুঙ্খানু- পুঙ্খরূপে দেখতে লাগলেন। দু-এক মুহূর্ত পরে ছাড়পত্রখানি আমার হাতে দিয়ে ফ্রেঞ্চে আমায় ধন্যবাদ দিয়ে অন্য যাত্রীদের কাছে গেলেন। আমিও ইংরেজিতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলুম। আমি জয়লাভ করলুম।

'কে বলে বীরত্বহীনা ভারত রমণী
কে বলে এদের দেহে বহে না ধমণি?'

যাত্রীরা আমার জবাব শুনে ও সহজেই রেহাই পাওয়াতে, আমার সঙ্গে এসে আলাপ করতে লাগলেন। বলাবাহুল্য এরা অধিকাংশই মহিলা। একজন মহিলা তো আমাকে সেখানেই তার প্যারী ভবনে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন—শুক্রবার বিকেলে। আমরা কার্ড পরিবর্তন করলুম ও পরস্পরের ঠিকানা নিলুম। এই মহিলাটির নাম ম্যাডাম নিকোলিটে। জাতিতে ইংরাজ কিন্তু একজন ফ্রেঞ্চ ডাক্তারকে বিবাহ করেছেন।

স্টিমারে একজন বয়স্ক ম্যাডমোয়াজেল্ (কুমারী) ছিলেন। তিনি আমার কাছে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করে বল্লেন প্যারিতে নামবার সময় যদি আপনাকে স্টেশনে নিতে কেউ না আসে, তাহলে আমি আপনাকে আপনার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেব। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলুম।

আমরা স্টিমার ছেড়ে সকলেই 'প্যারি' অভিমুখে যাত্রা করলুম। সন্ধ্যার সময় প্যারি স্টেশনে ট্রেন পৌঁছিল। স্টেশনে ম্যাডমোয়াজেল কার্পলের (Mademoi-selles Karpel) এক কাজিনকে (বোন) আমাকে অভ্যর্থনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই ম্যাডাম কার্পলে ও তাঁর দুই কুমারী মেয়ের সহিত আমার বড়ো ভগ্নীপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরীর বাড়িতে আলাপ হয়েছিল। কিছুদিন তাঁরা বোলপুর

'শান্তিনিকেতনে' **রবিকাকার অতিথি হয়েছিলেন**। লন্ডন থেকে আমি ম্যাডাম কার্পলেকে লিখেছিলুম যে আমি প্যারি যাচ্ছি, আমার জন্য একটা হোটেলের বন্দোবস্ত করে রাখবেন। তিনি আমায় লিখলেন 'আপনি স্টেশনে নেবে দেখবেন একটি মহিলা সাদা রুমাল দোলাচ্ছেন, জানবেন তিনিই আপনাকে নিতে গেছেন'।

আমি স্টেশনে নেমেই দেখি একটি ফ্রেঞ্চ মহিলা সাদা রুমাল দোলাচ্ছেন। আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি ফ্রেঞ্চে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনি কি হিন্দু' আমার অল্প স্বল্প যা লরেটো ইস্কুল থেকে ফ্রেঞ্চে বিদ্যে হয়েছিল সেটা এখন কাজ দিল। আমি বল্লুম 'হ্যাঁ'। তখন তিনি আমার জন্য ম্যাডাম কার্পলে যে হোটেলের বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন সেইখানেই পৌঁছে দিলেন। হোটেলটির নাম Hotel Beausejour। এ ফ্রেঞ্চ মহিলাটি ফ্রেঞ্চ জানেন, কিন্তু ইংরেজি জানেন না। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলুম। রাত্রি হয়েছে—কিছু খেয়েই একেবারে শুয়ে পড়লুম। হোটেলটিতে ঠান্ডা ও গরম জলের কল ছিল। হোটেলটির ভিতর বেশ গরম ছিল কিন্তু বাইরে ভয়ানক ঠান্ডা। ডিসেম্বর মাস কিনা।

পরদিন বৃহস্পতিবার 'ছোটো হাজরি' খেয়ে হোটেলেরই একজন কর্মচারীকে সঙ্গে করে ম্যাডাম কার্পলেদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সমস্ত দিন সেখানে আটকে পড়লুম। তাঁরা ছাড়লেন না। **একটি ফ্রেঞ্চ ম্যাগাজিনে রবিকাকার সম্বন্ধে প্রবন্ধ বেরিয়েছিলি**। ম্যাডাম কার্পলে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, 'পড়ুন তো শুনি'। আমি পড়লুম ও ইংরেজিতে উহার মর্ম বুঝিয়ে দিলুম। তিনি আশ্চর্য হয়ে বল্লেন 'আপনার ফ্রেঞ্চ উচ্চারণ দেখছি আমাদেরই মতো'। আমি এই বাহাদুরীটি পেলুম। ম্যাডাম কার্পেলের বড়ো মেয়ে ম্যাডমোয়াজল্ আন্দ্রে কার্পলে বেশ ছবি আঁকে। 'গ্র্যান্ড প্যালেতে' (Grand Palais) ম্যাডমোয়াজেল আন্দ্রে কার্পলের চিত্রিত রবিকাকার ছবি (অয়েল পেন্টিং) রক্ষিত আছে। সমস্ত দিনের পর ডিনার খাইয়ে আমাকে আমার হোটেলে পৌঁছে দিলেন।

**পরদিন শুক্রবার সকালবেলায় দেখি স্যার জগদীশ ও লেডি বোস আমারই হোটেলে আড্ডা নিয়েছেন**। দেখে বেশ আহ্লাদ হল। আমাকে নির্জনতা অনুভব করতে হয় নি। আজ বিকেলে ম্যাডাম নিকোলিটের ওখানে চা। কী দুর্যোগ। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। নেমন্তন্ন রাখার জন্য একটি ট্যাক্সি করে তাঁর ওখানে গেলুম। ফ্রেঞ্চ মহিলারা সংসার কর্মে কী রকম পটু সেটাও আমার জানবার ইচ্ছে ছিল। ডাক্তার নিকোলিটে একেবারেই ইংরেজি জানেন না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ইংরেজ। চায়েতে ম্যাডাম ও কপে ও তাঁর মেয়ে ম্যাডাম ডেলমা ও তাঁর ননদ (নাম ভুলে

গেছি) ও ডাক্তার নিকোলিটেও উপস্থিত ছিলেন। এই মহিলারা ম্যাডাম নিকোলিটেরই বন্ধুবান্ধব।

চা খেয়েই আবার এক জায়গায় চা-পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হল। ম্যাডাম ড মনজিয়াররলি (Madame be Monziarly) একজন রাশিয়ান মহিলা, কিন্তু তাঁহার স্বামী ফরাসি। ম্যাডাম ড মনজিয়াররলি সংস্কৃত খুব ভাল জানেন। তিনি বেদান্ত. হিতোপদেশ, উপনিষদ প্রভৃতি সংস্কৃত হইতে রাশিয়ান ভাষায় তর্জমা করেছেন। তিনি আমাদেরই মতো জন্মান্তর মানেন এবং ভারতবর্ষকে আন্তরিক ভালোবাসেন। তাঁর ধারণা, পূর্বজন্মে তিনি ভারতবাসী হিন্দু ছিলেন। ইনি ম্যাডমোয়াজেল কার্পলেদেরই একজন বন্ধু। টেলিফোন যোগে ম্যাডমোয়াজেল কার্পলে প্যারিতে আমার অবস্থিতির কথা জানিয়েছিলেন, তাই তিনি আমাকে চায়ে বলেছিলেন। তাঁর মেয়ে তৎকালীন বিখ্যাত ওস্তাদের রাশিয়ান বাজনা পিয়ানোতে বাজালেন। খুব চমৎকার লাগল। ম্যাডাম মোঘ্যামও (Medame Maugham) চায়েতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত Harp Player (হার্পযন্ত্র বাদিকা)। তিনি আমাকে হার্প শোনাবার জন্য বৃহস্পতিবারে নেমন্তন্ন করলেন, কিন্তু সেই দিনই Rhiews এ যুদ্ধক্ষেত্র দেখবার জন্য Cook দের সঙ্গে পূর্বেই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তাই সেদিন আর তাঁর হার্প শোনা হয়নি। তারপর দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি হার্প শোনালেন। কী সুন্দর বাজালেন, আমি বর্ণনা করতে পারিনে। না শুনলে ধারণা হয় না। ভাগ্যে গেলাম তা না হলে অমন স্বর্গের বীণা শুনতে পেতুম না। ম্যাডম ড মন্‌জিয়াররলির ওখান থেকে চা খেয়ে বাড়ি ফিরলুম। এ শুক্রবারের বিকেলের কথা। সাড়ে আটটার সময় স্যার জগদীশ ও লেডি বোস ও আমি ম্যাডাম কার্পলেদের ওখানে ডিনার খেতে গেলুম। ডিনারের পর লেডি বোস আমাকে মিস্ ইজাবেলা ডানকান নামক একজন বিখ্যাত নর্তকীর ভাবভঙ্গিপূর্ণ নৃত্য দেখাতে নিয়ে গেলেন। একটি গ্রিক ট্রাজেডিকে নাচে ও ভাবভঙ্গিতে হুবহু প্রকাশ করলেন। গ্রিক ট্রাজেডিখানি আমার পড়া নেই, কিন্তু তাঁর নাচে আমি মর্ম বুঝে নিতে পেরেছিলুম। কত নতুন বিষয় দেখা গেল।

৪ ডিসেম্বর, শনিবার স্যার জগদীশ বসুর সেক্রেটারি মিস্টার নাগের সঙ্গে Madelion দেখতে গিয়েছিলুম। বিকেলে Bastille দেখতে গেলুম।

যে ক-দিন আমরা প্যারিতে ছিলুম, রাত্রের ডিনার ম্যাডাম কার্পলের ওখানেই আমাদের খেতে হত—আমাদের মানে স্যার জগদীশ, লেডি বোস ও আমি।

৫ ডিসেম্বর, রবিবার Pantheon দেখতে গেলুম। দেখে বেশ আনন্দ পেলুম।

LaPantheon সুবিখ্যাত রোমান প্যান্থিয়নের অনুকরণে নির্মিত। লন্ডনের 'ওয়েস্ট মিনিস্টার এবির' ন্যায় ফরাসি জাতির বিখ্যাত লোকেদের সমাধি মন্দির। তাই এর নাম 'LaPantheon' হয়েছে।

৬ ডিসেম্বর, সোমবার ম্যাডাম ডেলমার ওখানে চা ছিল। ম্যাডাম ডেলমার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। তিনি ফরাসি গান গাহিলেন ও আমি বাংলা গান 'শুধু যাওয়া আসা' গেয়েছিলুম।

৭ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার Louvre -এ শিল্প মন্দির দেখতে গিয়েছিলুম। বড়ো বড়ো বিখ্যাত আর্টিস্টদের সারি সারি ছবি টাঙান ছিল। ভারতবর্ষে বড়ো বড়ো আর্টিস্ট আছেন, কিন্তু এরকম শিল্পমন্দির নেই।

৮ ডিসেম্বর, বুধবার পুনরায় Louvre-এ গিয়েছিলুম। এত বড়ো শিল্পমন্দির একদিনে দেখে শেষ করা যায় না। বিকেলের দিকে Musee de Guimet দেখতে গিয়েছিলুম। এর সেক্রেটারি হচ্ছেন ম্যাডমোজেল সুজান কার্পলে। এখানে Artficial Ruby (কৃত্রিম মাণিক) যা প্রথম তৈরি হয়েছিল তাও রাখা আছে।

৯ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার রিমসের যুদ্ধেক্ষেত্র দর্শন। এখন Harp বা বীণা সব ছাড়লুম। এখন মহাযুদ্ধক্ষেত্র যা তোপ কামানের দ্বারা বিধ্বস্ত সেই যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন করতে বের হলুম। সকাল ছ-টার সময় হোটেলের একজন Valet টিউব বা পাতাল রেলে করে Gare delest স্টেশনে নিয়ে গিয়ে ট্রেনে চড়িয়ে দিলে। যেমন চড়লুম অমনি ট্রেন ছাড়ল। Cook -এর লোক ওই ট্রেনে ছিল। রিমস-এ পৌঁছে 'কুক'রা মোটর বাস করে আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করলে। আমরা সবশুদ্ধ এগারো জন ছিলুম। বাসটা শহরের ভিতর দিয়ে চলতে লাগল। কুকের গাইড আমাদের সব বুঝিয়ে দিতে লাগল। কী ভয়ানক যুদ্ধ। শহরের একটিও বাড়ি আস্ত ছিল না, কারো ছাত ভাঙা, কারোর দেয়াল ভাঙা, কোথাও সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হয়েছে, এই রকম ভীষণ ব্যাপার দেখা গেল। 'রিমস' -এর ক্যাথিড্রাল জগৎবিখ্যাত। সেখানে আগেকার রাজাদের রাজটীকা হত। সেই Cathedral বা গির্জাটিও চূর্ণ ও বিচূর্ণ। এই ক্যাথিড্রাল ভাঙাতে ফরাসিদের বুকে খুব আঘাত লেগেছিল। ক্যাথিড্রাল-এ যখন বোমা পড়ে কতকগুলি আহত জর্মান সৈন্য সেখানে ছিল, গলিত সীসা তাহাদের মধ্যে পড়াতে অনেকে পুড়ে মারা যায়।

রোম্যান অধিকারের পূর্বে রেমি রাজার রাজধানী ছিল, যাঁর নাম থেকে এই রিমস নামের উৎপত্তি। দশম শতাব্দীতে এই নগর সভ্যতা ও জ্ঞান-শিক্ষার কেন্দ্রস্থল

ছিল। রোম্যানদের সময়কার কতকগুলি 'জয়তোরণ' (Triumphal Arch) ও বিজয় স্তম্ভ (Monument) এখনো মজুত আছে। ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ জার্মানরা এই নগর অধিকার করে। নগরের উপর গোলাগুলি বর্ষণ করেছিল আর বিখ্যাত Gothic Cathedral যা তেরশো শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল এবং যা ফরাসি দেশের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলে প্রসিদ্ধ তাও ধ্বংস করে দিয়েছিল। এ গির্জার মাথার উপর দিয়ে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে অগ্নির দ্বারা একবার ছাত ও চূড়া ধ্বংস হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রায় বারো লাখ টাকা খরচ করে ইহার সংস্কার করা হয়। সেইসময় এই গির্জাটি নানারকম কারুকার্যের দ্বারা সুশোভিত হয়। এখানে রিমস নগরের প্রধান প্রধান বিশপদের মূর্তি খোদিত আছে ; আর যিশুখ্রিস্টের একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি আছে। জর্মানরা রিমসকে যে তোপ দিয়ে 'বোম্বার্ড' করলে তার কারণ হচ্ছে যে উত্তর দিকের 'প্যারি'র পথ রোধ করা।

টিফিন খেয়ে বারোটার সময় রিমস-এর চতুপার্শ্বের স্থানগুলি দেখতে গেলাম। চারিদিকের গাঁ সব ভূমিস্যাৎ হয়ে গেছে। বড়ো বড়ো দু-একটা 'ট্রেঞ্চের' চিহ্ন রেখে দিয়েছে। এই ট্রেঞ্চগুলি এক একটি ছোটো পাতালপুরী বল্লেও চলে। এইখানে ২৬ এপ্রিল ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে দশ হাজার জর্মানকে ইলেকট্রিক যন্ত্রের দ্বারা হত্যা করা হয়। একটি চকহিলের নীচেতে গর্ত করে জর্মানরা একটি গুপ্ত প্রাসাদ তৈরি করেছিল। একদিন যখন তারা আমোদ আহ্লাদে মত্ত, ফরাসিরা হঠাৎ তাদের অস্তিত্ব জানতে পারলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিদ্যুৎ আঘাত করে মেরে দিলে। কী ভয়ানক ব্যাপার। স্বচক্ষে না দেখলে কেউ ভাবতে পারবে না কী সাংঘাতিক যুদ্ধ হয়েছিল। বড়ো বড়ো বাগানের গাছগুলো গোলাগুলি খেয়ে মরে কয়লার গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং। মান মন্দির বা Observatory-র দূরবিন দিয়ে চাঁদের দিকে তাকালে যেমন বড়ো বড়ো গহ্বর দেখা যায়, তেমনি চারিপাশে পাহাড়গুলি তোপের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। দেখলে মনে হয়, যেন পুরাকালের দেবাসুরের যুদ্ধ এখানেই হয়েছিল। এই কয়লার গাছ ও পাহাড়গুলির সংস্কারের ভার ফরাসি কৃষকেরা ভয়ে নিতে চায় না। বড়ো বড়ো গোলাগুলি গাছে ও ভূমিতে এখনো আবদ্ধ আছে। সেগুলি সহসা ফেটে গিয়ে জীবন হানি করতে পারে। ফরাসি গভর্নমেন্ট স্বয়ং এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। পুনঃ সংস্কারের জন্য টাকাও কম পায়নি। তাতে হিতে বিপরীতও হয়েছিল। এই টাকাটার আমদানি হওয়াতে ফরাসি France-এর দর কমে গিয়েছিল। খাদ্যদ্রব্য তৎপরিমাণে মহার্ঘ্য হয়েছিল।

ফরাসিরা জর্মানদের কী ভয়ানক শত্রু ভাবে দেখে তা ধরা যায় না। বলাবাহুল্য এই যুদ্ধেতে ফরাসিরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ইংরেজদের তত ক্ষতি হয়নি। অথচ যুদ্ধেতে ইংরেজদের লাভ বিশেষ হয়েছে।

আমরা যে এগারোজন যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে গিয়েছিলুম তার একটা তালিকা দিচ্ছি। দু-জন ফরাসি ও তাহাদের স্ত্রী আমাদের সঙ্গে ছিল। তাছাড়া একজন ইংরেজ ও চারজন আমেরিকান ও আমি একমাত্র বাঙালি ছিলুম। Cook-এর পরিদর্শককে নিয়ে সবশুদ্ধ এগারোজন।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরবার সময় ফরাসি ও আমেরিকান যাত্রীদের মধ্যে একটি ভয়ানক তর্ক আরম্ভ হল। ফ্রেঞ্চরা আমেরিকানদের বলতে লাগল, যে আমরা খালি লড়াই করেই মরলুম, কিন্তু লাভ বড় একটা হল না। লাভ যা কিছু ইংরেজরাই করলে আমরা কী পেলুম? ইংরেজরা তো জর্মানি কলোনিগুলো সব দখল করে নিলে। আমরা ফাঁকি পড়লুম। ওদের কলোনি আছে, ওদের নৌ-বল আছে, তাই ওরা গর্ব করে বলে, আমাদের জন্যই তো যুদ্ধে জয় হল, লাভ করবো না? আমেরিকানরা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল বটে, কিন্তু শেষকালে—যুদ্ধ জয়ের কিছু পূর্বে। এখন তারা Versailles এর সন্ধিতে দস্তখত করতে ইতস্তত করছে। হায় হায় আমরাই খালি দুঃখের ভাগী হলুম। এই একশত বৎসরের ভিতর পাঁচবার জর্মানরা আমাদের আক্রমণ করলে। এখনো যুদ্ধ হেরেও বলছে 'আমাদের একটু মাথা তুলতে দাও আবার তোমাদের দেখে নেব।' আমাদের দেখছি কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। সত্য যদি তারা কখনো আমাদের ফের আক্রমণ করে, তখন কি আমাদের কেউ সাহায্য করতে আসবে? তখন আমরা কী করবো?

আমেরিকানরা বলে উঠলেন, 'ভয় কী ভগবান আছেন। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখো, তিনিই তোমাদের রক্ষা করবেন। তিনিই অসহায়ের সহায়।'

তখন সে ফরাসিটি উত্তেজিত হয়ে গর্জে বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলতে খুব সহজ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখো। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসেই যদি কাজ চলত তাহলে সৈন্য সামন্তের প্রয়োজন হত না। আমি বলছি আমাদের কিছু যদি না দেওয়া হয় 'আমি নাস্তিক হয়ে পড়ব'। আমার ভয় হল ওদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধ না হয়। তর্কটা মাত্রা ছাপিয়ে উঠেছে। আমি একজন ভারতবাসী এই সব দেখছি—এরকম তর্ক হতে হতে হাতাহাতি না হয় তাই ইংরেজ যাত্রীটি আমেরিকানের পিছনে এসে বসলেন, আর তাঁর কাঁধ চাপড়ে থামিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বাসের একটা 'টায়ার' বজ্রনাদ করে ফেটে গেল। স্টেশন এখনো দেড়

মাইল দূরে। ট্রেন ছাড়বার বেশি দেরি নাই। আমরা তখন সকলে কুইক মার্চ করে স্টেশনে এসে পৌঁছলুম। ট্রেন তো এসে পৌঁছল। স্টেশনে চা খেয়েই ট্রেনে চড়লুম। রাত্রি সাড়ে আটটায় প্যারীর হোটেলে ফিরে এসে ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়লুম।

# গ. মহাযুদ্ধের পর 'প্যারী' নগরীতে

১০ ডিসেম্বর, শুক্রবার আবার 'লুভ্‌র' (Louvre) দেখতে গেলুম। লুভ্‌র কি একদিনে শেষ করা যায়?—পিকচার গ্যালারিতে (Picture Gallery) দেখলুম 'রুবেন্স' (Rubens), 'র‍্যাফেলস্' (Raphaels), 'কোরো' (Corot) 'ডেশ' (Deschamps), 'ভ্যাচি' (Vinci) ইত্যাদি বিখ্যাত শিল্পকার বা Artists দের বড়ো বড়ো ছবি—সে সব চমৎকার। আমাদের দেশে কেউ শিল্পানুরাগী মহৎলোক এই রকম একটি চিত্রশালা খোলেন তো দেশের মহোপকার হয়।

১১ ডিসেম্বর, শনিবার, 'ফন্টেন ব্লো' দেখতে গেলুম। কুক কোম্পানিরা আমাদের মোটর বাস দিয়েছিল। তাতে আমরা এগারোজন ছিলুম। এই এগারোজনের মধ্যে 'আইল অব ম্যান' (Isle of man) থেকে দুজন ইংরেজ মহিলা—মা ও তার মেয়ে ছিলেন। তাঁরা আমাকে তাঁদের সঙ্গে আলাপ হবার পর কফি খাওয়ালেন। আমাদের গাইড্ বা পথপ্রদর্শক একজন 'স্কচম্যান' (Scotchman) ছিলেন।

এই 'ফন্টেন ব্লো' (Fontaine Bleau) নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তি আছে—'ফরাসি সম্রাট নবম লুই অত্যন্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন। একদিন দলবল নিয়ে এই 'ফন্টেন ব্লো'র জঙ্গলে শিকার করতে আসেন। কিন্তু তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। সঙ্গীদের খুঁজতে খুঁজতে তিনি অত্যন্ত পিপাসা-ক্লান্ত হন কিন্তু কোথাও জলাশয়ের চিহ্নমাত্র নেই। শেষে অনেক অন্বেষণের পর একটি নির্ঝরিণী দেখতে পেলেন, এর জল অতি সুস্বাদু ও কাক-চক্ষুর ন্যায় উজ্বল। তিনি সেই জল পান করে চিৎকার করে বললেন 'কেল ফন্টেন ড বেল ও' (Quelle Fontaine de belleeau) কী সুজলা নির্ঝরিণী! এবং তার পরই এইখানে সম্রাট নবম লুই একটি দুর্গ স্থাপন করলেন। নাম দিলেন 'ফন্টেন ড

বেলও' (Fontaine de belleeau) Fountion of beautiful water. তারপর এখন সেই 'ফন্টেন ড বেলওই 'ফন্টেন ব্লো' নামে পরিণত হয়েছে।

এখানে শিশু 'নেপোলিয়ঁ- বোনাপার্ট' যে দোলনায় ঘুমুতেন সে দোলনা এখনও রক্ষিত আছে। 'ফন্টেন ব্লোর' সঙ্গে ফরাসি দেশের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত আছে। সে সব লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাইনে। তবে 'ফন্টেন ব্লো'র বিখ্যাত 'ফরেস্ট' বা বন সম্বন্ধে দু-এক কথা না বল্লে চলে না। এই সব বন ভারতবর্ষের 'তরাই' (Terai)-এর জঙ্গলের মতো নয়, কিন্তু সুশোভন বৃক্ষাদির দ্বারা পূর্ণ। ফরাসি দেশের মধ্যে এমন সুন্দর জঙ্গল নেই বল্লেই চলে। কত পুরুষ জন্মাল ও লোপ পেল তখন থেকে আজ পর্যন্ত বিখ্যাত বিখ্যাত প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকিয়েরা এখানে এসে ছবি আঁকেন ; এই জঙ্গলটি উহাদের বড়োই প্রিয়। 'ফন্টেন ব্লো' প্যারী নগর হইতে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

১২ ডিসেম্বর, রবিবার নেপোলিয়াঁ-র 'টুম্ব' বা সমাধি স্থান দেখতে গেলুম। সে স্থানটিকে 'এ্যাঁভালিদ' (Invalides) বলে। 'এ্যাঁভালিদ'-এ সৈন্যদের 'ব্যার্যাকস' (Barracks) আছে। এই ব্যার্যাকস-এর মধ্যে 'রয়েল শ্যাপেল' (Royalechapelle) বা রাজ গির্জা অবস্থিত। 'সেন্ট হেলেনা' থেকে নেপোলিয়ানের কবর এখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই রাজ গির্জাটি আগে ফরাসি সম্রাটদিগের উপাসনার স্থান ছিল। এক্ষণে ইহা নেপোলিয়ানের সমাধি স্থানে পরিণত হয়েছে। একটি প্রকাণ্ড গম্বুজ আছে ; সেই গম্বুজের ভিতরে রাজ গির্জা ; তাহার মেঝের কয়েক ফিট নীচে নেপোলিয়নের কবর রাখা আছে। আর এর চারপাশে তাঁরি 'বিজয়লক্ষ্মী' মর্মর প্রস্তরে নির্মিত রয়েছে। ইউরোপের যুদ্ধে তিনি যে সকল পতাকা জয় করেছিলেন সে সকলও দেয়ালের চারিদিকে রক্ষিত আছে। একটি গোলাকার 'ব্যালাস্টেড' বা বারান্ডা আছে। কবর দেখতে গেলে সেই বারান্ডার রেলিং-এ ঝুঁকে মাথা নীচু করলে তবে কবর দেখতে পাওয়া যায়। যখন 'সেন্ট হেলেনা' থেকে তাঁর দেহ আনা হয় তখন বড়ো বড়ো 'আর্কিটেক্টদের' তাঁর কবরের নক্সা করতে হুকুম দেওয়া হয়। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন নক্সা করেন। কেউ Obelisk কেউ বা উচ্চ মনুমেন্ট প্রেরণ করেন। কিন্তু কাহারো নক্সা মনোনীত হল না। শেষে একজন স্বদেশি প্রিয় 'ফরাসি আর্কিটেক্ট' নাম 'ভিকঁন্টে' এই নতুন নক্সা প্রেরণ করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল এই নক্সার মতলব কী? তিনি গম্ভীর স্বরে বলেন 'যখন সম্রাট-নেপোলিয়ন জীবিত ছিলেন তখন জগতের সমস্ত জাতিই তাঁর পায়ে মাথা অবনত করিত ; এখন তাঁর মৃত দেহকেও যাতে সকলে মাথ নুইয়ে সম্মান

দেয় তাহারই জন্য আমার এই নক্সা'। ১২ ডিসেম্বর, রবিবার আমি মাথা অবনত করে মহা সম্রাট ও মহাযোদ্ধা 'নেপোলিয়ঁ'র কবর দেখলুম। এই মহাপুরুষের অন্তিম দশা স্মরণ করে কার চোখে না জল আসে!

১৩ ডিসেম্বর, সোমবার, 'ব্রিটিশ কন্সালের' ওখানে আমার 'পাসপোর্ট' দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম এই 'পাসপোর্টেই আমি লন্ডন ফিরে যেতে পারব? কোনও গোলমাল হবে না তো?' তিনি বললেন যে 'এই পাসপোর্টেই চলবে।'

মিসেস সরোজিনী নাইডু, মিসেস ফারেল নাম্নি একজন মহিলার কাছে পরিচয় পত্র দিয়েছিলেন। এই মহিলাটি শ্রীমতী নাইডুর কবিতায় সুর বসিয়েছিলেন ও স্বরলিপি করেছিলেন। বিকেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। সেখানে মি. সিমসন বলে একটি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তিনি মিসেস 'ফারেলের সুর দেওয়া ও 'হারমনাইজ' করা শ্রীমতী নাইডুর দু-একটি কবিতা গান করে আমায় শোনালেন ও চা খাওয়ালেন। যদিও বাঙালি লেখিকা, কিন্তু কথাগুলি ইংরেজি যখন, তখন তার উপযুক্তই সুর হয়েছিল। আমাদের ভারতবর্ষের গানে যেমন 'মেলোডি' থাকে ইংরেজদের গানে তেমনি 'হারমনি'ই বেশি থাকে, ইহারও তাই ছিল।

১৪ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার এবার আমি স্মৃতিপুঞ্জ নিয়ে 'প্যারি' নগর ছাড়লুম। সকাল দশটার সময় ট্রেনে উঠলুম, সন্ধ্যার সময় লন্ডনে 'ভিক্টোরিয়া' স্টেশনে এসে পৌঁছলুম ও আমার লন্ডনে যেখানে বলা ছিল সেইখানে গেলুম। এসেই দেখি কতকগুলি চিঠি আমার নামে রয়েছে। তার মধ্যে একখানি মিসেস মরউডের কাছ থেকে এসেছিল। তিনি আয়ারল্যান্ডের উত্তরে 'বেলফাস্ট' নগর থেকে লিখছেন—'তুমি লন্ডন পর্যন্ত এসেছ, এখানে এসে আমার সঙ্গে না দেখা করে গেলে ভারি দুঃখিত হব।' আমি মনস্থ করলাম দেখা করেই যাব। কারণ আমার আয়ারল্যান্ডের Capital ডাবলিন নগরের 'রাথফারনাম কনভেন্ট' দেখতে বড়োই আগ্রহ ছিল। আমার যেখানে প্রথম হাতে খড়ি হয় 'লৌরেটো কনভেন্ট', ইহা আয়ারল্যান্ডের 'রাথফারনাম্ কনভেন্টে'রই branch বা শাখা। এই অবসর বুঝে আমি একেবারে তারপর দিনই সকালবেলায় মেসার্স টমাস কুক এর ওখানে গিয়ে 'বেলফাস্টের' টিকিট কিনে নিয়ে এলুম। আমি 'হেশ্যাম' হইতে 'বেলফাস্টের' টিকিট নিলুম। এখানে যেতে গেলে 'বারমিংহাম্', লিডস', 'শেফিল্ড' ইত্যাদি হয়ে যেতে হয়। বেলা তিনটার সময় 'সেন্টপ্যানক্রাস' স্টেশন থেকে ছাড়লুম, রাত দশটার সময় হেশ্যাম-এ গিয়ে পৌঁছলুম। সেখানে কাস্টমস ইনস্পেকসানের একটু কড়াকড়ি ছিল। আমার বাক্স প্যাঁটরা খুলে দেখলে কোথাও অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখে

নিয়ে যাচ্ছি কিনা। কিন্তু ওদের বৃথা পশুশ্রম হল, কিছুই পেলে না। আবার গুছিয়ে বন্ধ করে 'লন্ডন ডেরি' স্টিমারে ওঠা গেল। রাত এগারোটায় স্টিমার ছাড়ল। দিব্যি ঘুম দিলুম। শেষে বেলা দশটার সময় আইরিশ চ্যানেল পার হয়ে বেলফাস্টে পদার্পণ করলুম। দূর থেকেই কর্নেল মরউড ও তাঁর দুই ছেলে, উইলিয়ম বছর এগারো ও জেমস বছর আট, দাঁড়িয়ে। আমি দূর থেকেই চিনেছিলুম। একটি ব্রুহ্যাম গাড়ি করে তাঁর বাড়িতে গিয়ে ওঠা গেল।

এখন যাঁদের বাড়িতে আমি অতিথি তাদের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার—কর্নেল 'মরউড' একজন আইরিশ I.M.S. ডাক্তার। তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন আমেরিকান। ক্যালিফোরনিয়ার মেয়ে, 'টুরিস্ট' পার্টির সঙ্গে আসেন ; তারপর ডাক্তারটির সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ে হয়ে ভারতবর্ষে এসে শাজাহানপুরেই বেশিদিন ছিলেন তারপর বেনারসে বছর দু-তিন থেকে পেন্সন নিয়ে আয়ারল্যান্ডে এই বাড়ি কিনে বসতি করেন। বাড়ির নাম 'মেলোনপার্ক' ; বেশ সামনে ছোটোখাট ফুলের বাগান সুশোভিত, এমন কী ডিসেম্বর মাসের শেষে গেছি তখনো গাছে গোলাপ দেখেছি ও সব গাছের পাতাও আছে. আমাকে দেখে গৃহিণী তো খুব খুশি। তিনদিন ছিলুম, রোজই তাঁর বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন ; শুধু আইরিশ না আমেরিকানদেরও—তার ভিতর 'এমেরিকান কনসাল ফর আইয়ারল্যান্ড' ছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যবশত 'ডবলিন' এ যাওয়া ঘটে উঠল না—যদিও বেলফাস্ট থেকে মোটরে মোটে ছয় ঘণ্টার রাস্তা। সে সময় বিদ্রোহীদের জন্য 'বেলফাস্টে' কারফিউ ছিল। মানে সন্ধ্যে ছ-টার পর আর রাস্তা ঘাটে কারোর বেরোবার হুকুম ছিল না। আর 'ডাবলিনের' তো কথাই নেই ; বিশেষত ক্যাথলিকদের 'কনভেন্ট' সব পুড়িয়ে ছারখার করছিল। সেই জন্য কর্নেল ও মিসেস মরউড কিছুতেই আমার যাওয়া সম্বন্ধে রাজী হলেন না। বল্লেন তোমাকে হয়তো ইচ্ছে করে তারা মারবে না কিন্তু গোলাগুলি যখন ছোড়ে তখন দৈবাৎ এসে তো লাগতে পারে। কাজেই আমার আর যাওয়া হল না সেই দিন। আবার ক্রিস্টমাস—তাই।

খ্রিস্টমাস-উপহার আমার লেখা 'অরিয়েন্টাল পার্লস' নামক গল্পের বই কিনে, আমাকে দিয়ে তাতে লিখিয়ে বিতরণ করেছিলেন। আমি ২৬ ডিসেম্বর লন্ডনে ফিরবো বলে তিনি এক্সমাস দিনে ও তারপর দিনে কতকগুলি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন কিন্তু লন্ডনে আমাকে কার্যোপলক্ষে ২৪ মানে এক্সমাস ইভে সন্ধ্যে সাতটার সময় বেলফাস্ট ছেড়ে যেতে হয়েছিল, সেদিন বড়োদিনের ছুটি বলে মোটে একটা ট্রেন ছিল। সেই জন্য বসে বসে 'লিডসে' একটা ট্রেন ধরলুম সেটা

সন্ধ্যে সাতটায় 'পেনক্রাস' স্টেশনে এসে পৌঁছাল। সেখানেও গাড়ি বা ট্যাক্সি কিছু পাইনে, শেষে অনেক কষ্টে একটা গাড়ি পাওয়া গেল, বাড়ি পৌঁছতে সন্ধে সাড়ে আটটা হল। বেলফাস্টের সঙ্গে ও কলকাতার সঙ্গে একরকম তুলনা করা যেতে পারে। কলকাতায় যেমন মাড়োয়াড়ি, গুজরাটী, ইহুদি ও ইংরেজ জাতিরা কলকারখানা ও ব্যবসা একচেটে করে নিয়েছে—যেন কলকাতা বাঙালিদের নয়। তেমনি বেলফাস্টে এত স্কচমেন ও ইংলিশম্যান কলকারখানা ও ব্যবসাদি করে সমৃদ্ধশালী হয়েছে, খাস আইরিশবাসীদের স্থান প্রায় নেই বল্লেই হয়।

## ৩. সুদক্ষিণা দেবীর অভিভাষণ

# স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে কথা

বিগত ১৯ এপ্রিল উক্ত সভার বার্ষিক অধিবেশন এলাহাবাদে হইয়াছিল। সাজাহানপুরের পরলোকগত শ্রদ্ধেয় জ্বালাপ্রসাদ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সুদক্ষিণা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী এবং ˚হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা। সভায় গণ্যমান্য অনেক সভ্য ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। অস্পৃশ্য-জাতিসমস্যা, শুদ্ধি, জাতিভেদ, অল্পবয়সে বিবাহ, বিধবাবিবাহ ও পর্দা এই কয়েকটি বিষয় লইয়া আলোচনা হয়। জাতির উত্থানের সঙ্গে এই কয়েকটির যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। উক্ত সভায় যে মন্তব্য স্থির হয় তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। পরিশেষে সভানেত্রী যে বিনয়পূর্ণ সারবান অভিভাষণ পাঠ করেন তাহা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আমরা তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। তিনি বলেন—

**'আমি সভানেত্রীপদের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও আপনারা যখন আমাকে সভানেত্রী নিয়োগ করিয়া আমার ভিতর দিয়া সমগ্র স্ত্রীজাতিকে সম্মান দিতে উদ্যত, তখন আপনাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় দেখি না। কিন্তু তাহা হইলেও আজ আমি আপনাদিগকে শিক্ষা দিতে আসি নাই, শিক্ষা লাভ করিতে আসিয়াছি। আমার কথা এই—সামাজিক উন্নতি বলিলে পুরুষজাতি ও স্ত্রীজাতি উভয়েরই উন্নতি বুঝায়। একটিকে ছাড়িয়া অপরটিকে ধরিলে চলিবে না। এই দ্বিবিধ উন্নতি পরস্পর অভিন্ন হইলেও আজ আমি স্ত্রীজাতির উন্নতির সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীজাতি আমরা, এদেশে দুটি পর্দার মধ্যে অবস্থান করি ; একটি দৈহিক পর্দা অপরটি মানসিক পর্দা। প্রথম পর্দা আমাদিগকে জানানার আঙ্গিনার ভিতরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়। দ্বিতীয় পর্দা আমাদিগকে অজ্ঞান-**

অন্ধকারের মধ্যে প্রছন্ন করিয়া রাখে। বলিতে কী, এই দ্বিতীয় পর্দা প্রথম পর্দা অপেক্ষা ভীষণতর। এই অবরোধ প্রথা উন্নতির বিশেষ প্রতিরোধক। ইহা আমাদিগকে বাহিরের আলোক ও বায়ু হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে। এই অবরোধ প্রথা স্বাস্থ্য ও বললাভের বিরোধী। ইহা আমাদের ঔৎসুক্যকে প্রদমিত করে, ভূয়োদর্শনের পথকে রুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহারই কারণে কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার চাপ রহিয়া যায়, সমাজের উপরে স্ত্রীজাতিকে স্নিগ্ধ ও পবিত্র ভাব প্রতিফলিত করিবার অবসর দান করে না। অন্যদিকে পুরুষ জাতির সমক্ষে পাপের পথ, কলঙ্কের পথ উন্মুক্ত হইয়া থাকে। পর্দারই কারণে অজ্ঞতাবশত অপরিমিত ব্যয় সংসারকে উৎসন্ন করিয়া দেয়। নিরক্ষর অবলাদিগকে পর্দারুদ্ধ স্ত্রীজাতিকে পাইলে তাহার কর্মচারীবৃন্দ দুই হস্তে লুণ্ঠন করিবার ও প্রতারণা করিবার শুভসুযোগ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কত পরিবারের সর্বনাশ সংসাধিত হইয়াছে। যে পরিবারের ভিতরে নানাকারণে পর্দা প্রথা বিদূরিত করা অসম্ভব—সেখানে জানানা-শিক্ষা প্রবর্তন করিলেও কতক পরিমাণে কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা বিদূরিত হইতে পারে। আমরা স্ত্রীজাতির অন্তর্গত ; পরস্পরের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে। আমাদিগকে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না, জ্ঞানের বর্তিকা ধারণ করিয়া আমাদিগকে নগর ও গ্রামের মধ্যে অসহায় ও দরিদ্রের ঘরের মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে

বালিকাগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আর একটি বাধা আছে। বিবাহ হইলেই কন্যাগণ পরগৃহে গমন করে। এরূপ অবস্থায় তাহাদের জন্য অর্থব্যয়ের সার্থকতা অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, পুত্রকে শিক্ষা দিলে সে ভবিষ্যতে কৃতী হইবে এবং সংসারে অর্থাগম হইবার সুবিধা হইবে ; বিবাহের সময়ও যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। কিন্তু কন্যাকে শিক্ষাদান করিলে নিজ সংসারের কোনো ফলোদয় হইবে না ; এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া অনেকে কন্যাগণকে ব্যয়সাধ্য শিক্ষাদান করিতে সংকুচিত। সংসারে পুত্র জন্মিলে পিতামাতা আনন্দিত হন, কিন্তু কন্যা জন্মিলে বিষাদের ভাব পরিলক্ষিত হয়। এদেশে লোকে কন্যা চায় না, পুত্র চায়। কিন্তু ইংলন্ডের ভাব ঠিক তার বিপরীত। ইংরেজিতে একটি কবিতা আছে, তাহার অর্থ এই যে, 'আমার পুত্র, আমারই পুত্র, যে পর্যন্ত না তাহার বিবাহ হয় ; কিন্তু আমার কন্যা, সে আমারই কন্যা, যতদিন সে জীবিতা থাকে।'

কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা ইহার মীমাংসা আনিয়া দেয়। কন্যাগণকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য সময়ের আহ্বান আসিতেছে। স্ত্রীজাতির ভিতরে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা

সেকালের মতো রুদ্ধ ও আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। তাহারা বাহিরে আসিবার জন্য ব্যাকুল ; তাহারা তাহাদের স্বামী, তাহাদের ভ্রাতা তাহাদের পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া বাহিরের বড়ো বড়ো কর্তব্য-সাধনের জন্য সমুৎসুক ; তাহাদিগকে শিক্ষা হইতে বহির্জীবন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখো, দেখিবে জাতির অর্ধেক জীবন বিশুষ্ক হইয়া পড়িবে। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য রমণীদিগকে শিক্ষাদান করিবার জন্য অগ্রসর হওয়া ও তাহার বিশেষ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ রাখা।

বিবাহে পণপ্রথা স্ত্রীশিক্ষার আর একটি অন্তরায়। পুত্রের বিবাহে কন্যার অভিভাবকের উপর যেরূপ পেষণ চলিতেছে, তাহাতে বিবাহ ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য অর্থ-সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। পিতার কন্যাকে সুশিক্ষিত করিবার উপযোগী অর্থসামর্থ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা পণের চাপে নিষ্পিষ্ট হইয়া বাধ্য হইয়া সুপাত্র সংগ্রহের জন্য অন্য জাতিতে বিবাহ দিতে বা কুলশীলের গণ্ডি প্রশস্ত করিয়া লইতে প্রস্তুত, তাঁহাদের ঈদৃশ আচরণের নিন্দা করা যাইতে পারে না, বরং প্রশংসা করিতে হয়।

এই পণপ্রথার আর একটি কারণ আমার মনে হয়, কন্যা সম্বন্ধে দায়াধিকারের অসমীচীন ব্যবস্থা। হিন্দুর ব্যবস্থা অনুসারে পুত্র সত্ত্বে কন্যা একটি পয়সাও পিতৃধনের উত্তরাধিকারী নহে। যে পর্যন্ত এই আইনের সংশোধন না হয়, ততদিন পণপ্রথা কমিবার সম্ভাবনা অল্প।

অল্পবয়স্ক কন্যার বিবাহ দান আর একটি অনিষ্টকর প্রথা। ইহার ফলে পুত্রকন্যাগণ জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। আজ যদি ইংরেজরাজ এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন আর একটি সবল ও দুদ্ধর্ষ জাতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে। যদি আমরা সবল সন্তান দেখিতে চাই, বিবাহের বয়স বর্ধিত করিতে হইবে। শাস্ত্রানুশাসন বা লোকাচার-ভয়ে এত ভীত হইলে চলিবে না। এদেশের প্রায় চার কোটি অসহায়া স্ত্রীলোক রহিয়াছেন, যাঁহারা একরূপ অনশনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন এবং অভাবের তাড়নে নিতান্ত অসময়ে তাঁহাদের পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হইতেছেন।

বাল্যবিবাহজনিত বালবিধবার সংখ্যা এদেশে অল্প নহে। একটু অধিক বয়সে বিবাহ দিলে বালবিধবার শোচনীয় দৃশ্য আমাদিগকে দেখিতে হইত না। নয় বা দশ বৎসরের কিংবা তাহা অপেক্ষাও অল্পবয়সের বিবাহ এদেশে যথেষ্ট রহিয়াছে। অনেক সময়ে কুলীন ব্রাহ্মণের ভিতরে অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধের সহিত বালিকা কন্যার পরিণয় হয়। বাল্যবিবাহ রোধ করো, বালবিধবার সংখ্যা কম হইয়া আসিবে,

পতিতার সংখ্যা হ্রাস পাইবে। যাহারা পদস্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষা ও আশ্রয়দান করিবার জন্য আশ্রম স্থাপন করিতে হইবে এবং জীবিকানির্বাহের জন্য তাহাদিগকে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা যদি অন্য উপায়ে বালবিধবার জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি, পতিতার সংখ্য হ্রাস হইয়া যায়।

স্বামী জীবিত থাকুন আর মৃতই হউন, তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা হিন্দু-স্ত্রীর অনন্য সাধারণ সৎগুণ। এই কারণেই বিধবাবিবাহ এদেশে প্রীতির চক্ষে পরিলক্ষিত হয় না। বিধবাবিবাহের যে আইন বিধিবদ্ধ আছে তাহার ভিতরে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে ; কেন না, এই আইন অনুসারে বিধবা পুনর্বিবাহকালীন তাঁহার পূর্ব স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। এতৎ সম্বন্ধে প্রচলিত আইন পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক।

এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, যে-সমস্ত স্ত্রীলোক কলকারখানা ও খনি প্রভৃতির ভিতরে কার্য করিয়া জীবিকানির্বাহ করে ও ঈদৃশ কার্য করিতে গিয়া কেবলমাত্র তাহাদের নিজেদের স্বাস্থ্যহানি হয়, তাহা নহে, তাহাদের সন্তান-সন্ততিও হীনবীর্য হইয়া পড়ে। অবশ্য সমাজ-সংস্কারকের হস্তে ইহার ততটা প্রতিবিধান হইতে পারে না, রাজার আইনে যতটা প্রতিকার হওয়া সম্ভবপর।

জাতির অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে যতই শুনি, ততই লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া যায়। এই অস্পৃশ্যতা লইয়া ট্রাভাঙ্কুর অঞ্চলের যে কাহিনি সংবাদপত্রে বাহির হইতেছে, যাহারা অস্পৃশ্য তাহাদের প্রতি উচ্চজাতীয় হিন্দুর বীভৎস ব্যবহারের যে চিত্র প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে কবি Wordsworth -এর মানুষের প্রতি অমানুষোচিত আচরণ—এই কথাই মনে পড়িয়া যায়। তাহারা আমাদেরই ভ্রাতা অথচ দেবমন্দিরে যাইবার তাহাদের অধিকার নাই, রাজার রাজপথে বেড়াইবার তাহাদের স্বাধীনতা নাই! আমাদের ধারণা যে, তাহারা আমাদিগকে স্পর্শ করিলেই আমরা অপবিত্র হইয়া যাইব! এমনকি, তাহারা আমাদের ২০/২৫ ফুট এবং কোনো কোনো অস্পৃশ্য জাতি আমাদের ৪০/৫০ ফুটের মধ্যে আসিলেই তাহারা আমাদিগকে অপবিত্র করিয়া দিবে। এই অস্পৃশ্য ভাব এই কুসংস্কার দূর করিবার একমাত্র উপায় সাধারণের অর্থে পরিপুষ্ট বিদ্যালয়ে জাতিনির্বিশেষে সকলকে প্রবেশ অধিকার প্রদান করা। হিন্দু বালকদিগের সহিত এইরূপ মিলিত হইতে দিলে ক্রমে ক্রমে অস্পৃশ্যভাব বিদূরিত হইয়া যাইবে।

হিন্দু-মুসলমান মিলন চেষ্টার ভিতরে কতক পরিমাণে রাজনৈতিক ভাবের সংমিশ্রণ থাকিলেও, আমরা বলি, পরস্পরের মেলামেশার জন্য সভাসমিতিতে

ক্রীড়াশালা প্রতিষ্ঠিত হউক। যে-সকল জনপদে হিন্দু-মুসলমানের বাস, সেখানে উভয়জাতির লোক লইয়া মধ্যস্থ সভা বিগঠিত হউক, পরস্পরকে সম্মান করিতে এবং পরস্পরের ধর্মের উৎসবকে উদারভাবে নিরীক্ষণ করিবার ভাব জাগিয়া উঠুক। সভাসমিতিতে কেবলমাত্র প্রস্তাব উপস্থিত ও তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিবার অভিনয় করিলে চলিবে না, কিন্তু প্রকৃত আন্তরিকতার সহিত পরস্পরের মিলন চেষ্টায় হাতেকলমে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির ভাবকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য কার্যকর সভার প্রয়োজন। ইহাই আমার শেষ উক্তি।'

বলাবাহুল্য, শ্রীমতী সুদক্ষিণা দেবীর প্রত্যেক বাক্য আমাদের নিকট সমর্থন পাইবার যোগ্য। আমাদের লেখা শেষ হইবার পরে দেখিলাম, প্রবাসী পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীমতী সুদক্ষিণা দেবীর এই অভিভাষণটির সারাংশ কল্যাণীয়া শ্রীমতী শক্তি দেবী কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমতী সুদক্ষিণা দেবীর পিতামহদত্ত আদরের নাম পূর্ণিমা দেবী। বাড়ির বাহিরে প্রধানত এই নামেই তিনি অধিক পরিচিত। প্রবাসী পত্রিকায় উক্ত নামেই তাঁহার অভিভাষণটি মুদ্রিত হইয়াছে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ভূতপূর্ব মন্ত্রী এবং লিডার-পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিররাভরী যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি প্রয়াগের উক্ত সমাজসংস্কার সভার সভানেত্রী শ্রীমতী সুদক্ষিণা দেবীর সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার তাৎপর্য প্রবাসী হইতে অংশত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

> শ্রীযুক্তা জ্বালাপ্রসাদ সাংখ্যধর-জায়ার পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। তিনি শিক্ষাবিস্তার কল্পে অনেক কাজ করিয়াছেন এবং ইহা উল্লেখ করা খুব দরকার যে, শাহজাহানপুর জেলায় তিনি বৈষয়িক কার্য পরিচালনে সুদক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম, তখন আমাকে শাহজাহানপুর জেলার একজন ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা দেবীর মতো জমিদার তিনি আর কখনো দেখেন নাই, তাঁহা অপেক্ষা প্রজাদের প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন জমিদার আর কেহ নাই। তাঁহার বিদ্যাবত্তা, অন্যান্য নানা গুণ, উক্ত চরিত্র এবং বিনা আড়ম্বরে ও নিঃস্বার্থভাবে সাধিত নানাবিধ সর্বজনসেবার কার্যের বিষয় চিন্তা করিলে বলা যায় যে, তিনি সেই ভবিষ্যৎকালের অগ্রদূতস্বরূপ, যখন হিন্দু মহিলারা জাতীয় জীবনের নানাক্ষেত্রে মুক্তি ও স্বাধীনতালাভের সহায় হইবেন।

*উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সমাজ সংস্কার সভায় সুদক্ষিণা দেবীর অভিভাষণ U.P. Social Conference*

## ৫. প্রাসঙ্গিক কয়েকটি পত্র

C/O, Thomas Cook & Son
585 Fifth Ave
8 / 4 / '27

ওঁ

স্নেহের লোকেন

তোমার চিঠি পেয়ে সব জানলুম। তোমার শরীরটা খারাপ যাচ্ছে শুনে আমার মন বড় উদ্বিগ্ন হয়ে গেছে। কোনও কিছুতে মন লাগছে না। inflammation of the bowels তোমার ছোট বেলা থেকে হচ্ছে। প্রথম একবার খুব আমাশার পর মোটা মোটা ২ পরোটা খাও তখন থেকে আরম্ভ। এখন আখের সময়, আমার বোধহয় আখের রস যদি খেতে পার ত ভাল হয়। রোজ একটা করে আখ চিবিয়ে খেতে থাক। টাকার জন্য ভাববে না। ও রোগ বড় ভাল নয়, ওতে শ্বাসবন্ধ হয়ে লোকে মারা যেতে পারে। তোমরা আমায় চিঠি লেখ না লেখ তাতে আক্ষেপ নেই তোমরা ভাল থাক কাজ কর্ম করছে ত আমি নিশ্চিন্ত। তুমি আমায় যেতে লিখেছ এতেই বুঝছি যে তোমাদের নিতান্ত কষ্ট নইলে আর আমায় ভাবতে না। কিন্তু বাবা, এবার এখানে বাঁধা পড়েছি আমার প্রায় সব ফুরিয়েছে। কতদিন আধপেটা খেয়ে রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। তোমার বাবাকে ও তোমাদের কষ্ট দিয়ে ফের টাকা (যাবার ভাড়া) চেয়ে পাঠাতে কিছুতে মন সরল না। হাতে ৫০/৩০ পাউন্ড যা আছে তার দ্বারা সেই মরণ কামড়ের মত শেষ চেষ্টা করে দেশে ফিরব মতলব করে Lecture Bureau প্রভৃতি গুলিতে সব চেষ্টা করতে লাগলুম। এখন New York Times-এ আমার সম্বন্ধে কে একজন মেয়ে লেখে। সে আমায় বলে নি যে সে ওতে আমার বিষয় লিখবে। এমনি এসে আমার সঙ্গে গল্প গুজব করত তারপর অনেক জানিয়ে টানিয়ে অত বড় করে Article

লিখেছে। সেই লেখাটা আমায় খুব সাহায্য করল। Times-এর পর ধাঁ ধাঁ করে ৭/৮টা কাগজে আমার বিষয় লিখল। ছবি দিয়ে দিয়ে। তখন Lecture Bureau কর্তাদের মন আকৃষ্ট হল। আমায় Charles I Reid বলে একজন manager ....

ইতি

তোমার মা

SOUTHERN PACIFIC STEAMSHIP LINES
"MORGAN LINE"
ON BOARD S.S. COMUS

২৩শে জুলাই '২৭

স্নেহের ভাস্কর,

আমি কোথায় দেখছ। ফের জলে ভাসছি। আমি প্রায় মেক্সিকোর কাছাকাছি গিয়েছিলুম। নিউইয়র্ক হতে ৩০০০/৪০০০ মাইল দূরে। আর একটু গেলে পানামা কেনাল দেখতুম কিন্তু তা আর হল না তা হলে নিজের টাকা খরচ করতে হোতো। জীতেনকে বোলো আমি কোথায় গিসলুম। gulf of Mexico পার হতে হল, এখানে অনেক flying fish দেখি। ভোর সকালে জলের উপর পাখির মত উড়ে বেড়াচ্ছে। কাল একটা উড়ে ডেকের উপর আসে captain মহাশয় তাকে ধরে আমাদের এনে দেখান ডানা দুটি পাখীদের মত চোখ লাল। আজ শেষ করি। তোমরা সব ভাল ত? আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

ইতি

তোমার মা

WILLIAMS BROS
OPERATORS
HOTEL EASTON
EASTON, PA
১৫.২.২৮, Newyork

মা সুমিত্রা,

তুমি কেমন আছে। অনেকদিন তোমাদের কারর চিঠি পাই নি। আমিও ভয়ঙ্কর কাজের ভীড়ে ব্যস্ত। তাই বোধহয় দু হপ্তা তোমাদের কোন চিঠি লিখতে পারিনি।

এই মাসটা আর মার্চ মাস হয়ে গেলেই আমি এপ্রিলের গোড়া কি মাঝে ছাড়ব।

আজ এখনি মানে ২॥ টার গাড়ীতে Detroit যাচ্ছি। ওখানে ১০০ ডলার মানে ২৭১্ পাব কিন্তু যেতে আসতে ৪০/৪৫ ডঃ খরচ হবে, তারপর হোটেলে থাকা খাওয়া ইত্যাদিতে কিছু বাঁচছে না। যাক্ এইবারে যাবই। এরূপী বাঁদরদের দেশে আর মন টেঁকে না। কি কুহকে পড়ে আমাদের হিন্দু ছেলেগুলা এখানে পড়ে থাকে তা বুঝতে পারি না। তবে আমি এসে এদেশে অনেক কাজ হয়েছে দেশের মঙ্গলে।

আজ শেষ করি। সময় পাই নি বলে ভোর ৫ টায় উঠে তোমাদের লিখছি।

আমার আশীর্বাদ সকলে জেনো। ভাস্করকে ভাল করে পড়তে বোলো যাতে Scholarship-টা পায়।

ইতি

তোমাদের মা

112 Gower Street
India Students Union
London W.C.I.

পূজনীয়া মা

অনেক দিন আপনার কোন চিঠি পাই নাই—এবং আমার চিঠি লেখায় আলস্যের জন্য চিঠি দিতে পারি নাই। আমি মাস তিন London-এর বাহিরে ছিলাম—উপস্থিত আবার London-এ ফিরিয়া আসিয়াছি। এখন এখানকার আকাশ বাতাস বেশ ভাল—প্রতিদিনই রৌদ্র এবং পরিষ্কার আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—সপ্তাহে দু'একদিন সামান্য বৃষ্টি হয়। এখানে শীতকালটা অত্যন্ত খারাপ লাগে। এখন সবই ভাল কেবল আমার ভাল লাগে না রাত্রি দশটার সময় দিনের আলোর আলো থাকে বলে—রাত্রের খাওয়ার সঙ্গে অন্ধকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমাদের ভারতবাসীর কাছে আবহমানকাল থেকে—কাজেই দিনের আলোতে Dinner খেয়ে তৃপ্তি হয় না।

আশা করি আপনার শরীর ভাল আছে এবং বাড়ীর সকল রকম কুশল। আমার কাজকর্ম ভালই হইতেছে। আমি যদি আর কিছু না পড়ি এবং এক chance-এ পাশ হতে পারি তাহ'লে এক বছর বাদেই ফিরিতে পারিব। পরিশ্রম ভাল করে করিলে P.H.D. নেওয়া অসম্ভব কিছু নয়—আমি এখন আশ্চর্য্য হই আমরা কত

অল্প পড়ে M.A. পাশ করি — এই অল্প পড়ার শাস্তি এখন ভোগ করিতে হইতেছে—তবে এখনকার পরিশ্রমের মধ্যে এই আনন্দ যে জ্ঞানের পিপাসা বেড়ে যাচ্ছে। সুমিত্রার চিঠি প্রতি সপ্তাহেই পাই। সে খুব টক্ আর ঝাল লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছে আবার বলে মেজদাকে ঘুষ দেই পাছে বলে দেয় বাবাকে অথচ হাতের জন্য কষ্ট পাচ্ছে—আমাকে বিশদ বর্ণনা করে লিখেছে কি করে টক্ ঝাল্ খাওয়া কারবার গুপ্তভাবে চালাচ্ছে। এতদূর এখানে আবার Exhibition খুলেছে। এবারে শুনছি আর বারের তুলনায় কিছুই হয় নাই। আমার দেখিবার তত কৌতূহল নাই বলিয়া অবসর করিতে পারিতেছি না—তবে দু একবার অবশ্য যাইব। গত সপ্তাহে Tower of London-এর কাছে দিয়া যাইতে ছিলাম—অল্প সময় ছিল কাজেই দুইটা ঘর দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম—একটা ঘরে ঢুকিয়াছিলাম তার নাম Jewel House সেখানে আদি কাল থেকে রাজারা যে মুকুট ব্যবহার করেছেন, সব আছে—দিল্লী দরবারের মুকুট দেখিলাম এবং কোহিনুর কত বড় ও কি অবস্থায় আছে তাহাও দেখিলাম—কোহিনুর টী Mary-র মুকুটে, আমার মনে হল দু টুক্রা করা হয়েছে—সাদা কাঁচের মত, কোহিনূর না বল্লে কাঁচ বলেই ভ্রম হয়—একটী কোহিনূরের Model তৈরী করে রেখেছে তার সঙ্গেও আমি কোন তফাৎ বুঝিলাম না—দুইটা টুকরো প্রত্যেকটি একটি পয়সার মত বড়।

এখান থেকে সুমিত্রার টক্ খাওয়ার সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়, তবে আপনার অনুপস্থিতিতে ও যে ভাঁড়ারে আধিপত্য বিস্তার করেছে এতে আর সন্দেহ নাই।

আমি গত সপ্তাহে কলিকাতায় চিঠি দিতে পারি নাই—বেলেঘাটায় বা শিবপুরে কোথাও চিঠি দেই নাই তাহার কারণ আমি দুই দিনের জন্য Cambridge গিয়াছিলাম। আপনি কত দিনে কলিকাতায় ফিরিবেন। আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি

প্রণতঃ - বিমল

৭ই ডিসেম্বর ১৯৩১

শ্রীচরণেষু মা,

এর আগের বারের চিঠিতে আপনাকে হিসেব পাঠিয়েছি। কিন্তু total করা হয় নি। total করে নেবেন। ৩০৫/৬ টাকা হবে। আপনি এবারে যে টাকা

পাঠিয়েছেন, তাতে কুলবে বলে ত মনে হয় না। যাক্ আপনি ত বাবার কাজের আগে আসবেন। আমি আপনার কাছে বেশী চাইতে ভরসা করিনি। তা না হলে যদি ১০০্ দেন ও আর একটা মেশিনওলার কাছ থেকে মাখন কিনে পাইকারি বিক্রী করি। ২/৪টে ভাল ভাল দোকানদারের সঙ্গে ৩ বছর কারবার করে আলাপ ও জানাশুনা হয়েছে। তারা বলেছে যে আমার মাখন পেলে অন্য কারো মাখন কিন্‌বে না। ছালিটিও তারা কিন্‌বে। পাইকারি বিক্রীটা যদি জমিয়ে তুল্‌তে পারি তাহলে দোকান তুলে দিলেও কোন ক্ষতি হবে না? উল্‌টে establishment খরচ অনেক বেঁচে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন কাজও করতে পারব। যদি ২ মাসেও দিতে পারেন ত ভাল হয়। বিভূতিও ৭/৮ শো টাকা ফেল্‌বে। তবে ওর টাকা পেতে দেরী হচ্ছে। ২/১ মাস নাও পেতে পারে। একটু কারবার জোর চল্‌লেই কিছু কিছু বাড়ীতে দিতে পারব। টাকা লোকসানের ভয় আর নেই। সে ভয় কেটে গেছে। আপনার কাছ থেকে টাকা পেলেই আমি একবার ৭/৮ দিনের জন্যে দ্বারভাঙ্গা যাব। বাবার কাজের আগে আবার আসতে হবে। যা বুঝবেন করবেন। আমরা সব ভাল আছি। পরশু দিন থেকে পিসেমশায় এসে আছেন। আজ যাবেন। আপনার শরীর কেমন আছে লিখ্‌বেন।

ইতি

স্নেঃ লোকেন

শ্রীচরণেষু মা,

আপনার চিঠি পেলুম। কাল মেজমা সুকুমার মেশোমশায়ের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছেন। মিনাদির দেওর নাকি বলেছে যে আমার একটা Romance আছে। তাতে সুকুমার মেশোমশায় লিখেছেন যে আমার যখন Romance আছে তখন এ বিয়ে না হওয়াই ভাল। যাক্ এক হিসেবে ভালই হল। আমার এ বিয়েতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না। শুধু মেজমা বল্লেন যে কথা দিয়ে ফেলেছেন আর টাকার জন্যে রাজী হয়েছিলুম। নইলে প্রথমে মেজমাকে বলেছিলুম যে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে। তাতে মেজমা চটে উঠলেন। বল্‌লেন যে মার চিঠি পেয়ে এসে আমি বিয়ের সব ঠিক করে এসেছি এবার আর কথা ঘোরান ভদ্রতা হবে না। আপনার চিঠি পেয়ে বুঝলুম যে এর আগে দুখানা চিঠি দিয়েছি তা আপনি পান্ নি। রোড্‌শোশ ১৯৩১ শালের দেওয়া হয়ে গেছে। তবে অন্যলোক দিয়েচে। ওরা যার কাছে সুবিধে পায় তারই

কাছ থেকে জুলুম করে আদায় করে। শুধু জমিটা রেজিষ্ট্রি করে লেখাপড়া করে নিতে হবে. বড়মাসী বল্লেন যে ভারতীকে ভাল করে চিকিৎসা করান বিশেষ দরকার। রাঁচি থেকে ও কিছু সেরে আস্তে পারে নি। সার্বে কোত্থেকে এমন ভয়ানক হাঁচি আর সর্দি যে তাতেই আদ্ধেক রক্ত সুকিয়ে যায়। আমার মতে যদি বেশী খরচ কর্তে না পারা যায় তাহলে ওর লেখাপড়া বন্ধ করেও ওর চিকিৎসা করান আগে দরকার। কোলকাতার কোন ভাল ডাক্তারকে দিয়ে examine করিয়ে তারি treatment এ কিছুদিন চলা দরকার। অবশ্য বেণীবাবুকে নিয়ে যেতে হবে। বেণীবাবু গোড়া থেকে দেখ্বেন। উনি বুঝিয়ে বল্তে পারবেন। ভাস্করকে tonic আর ওষুধ দিয়েছেন। খোকার Bronchites হয়েছিল। এখন অনেকটা ভাল আছে। ভাস্করের শরীর আমার চেও ঢের খারাপ। ওর তো প্রায়ই অসুখ করে। ভাস্কর আর ভারতীর যতদূর সম্ভব Nourishing Food খাওয়া উচিত। যদি বলেন ত ওদের দুজনের জন্যে রোজ মাংসের Soup করে দি। মাংস, Vegetable ও মুসুর ডাল এই তিনটে জিনিষের Soup। ভারতীকে examine হয়ে গেলে দিল্লীতে ২/১ মাস যদি আপনার কাছে রেখে খুব করে দুধ (গরু কিম্বা ছাগল) আর মাংস ইত্যাদি খাওয়াতে পারেন ত ভাল হয়। শরীরই যদি না হল ত লেখা পড়া শিখে লাভ কি। বাঁচ্লে তবে ত লেখা পড়াতে ফল হবে। আমার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই। আগে রোজগার করি। রোজগার হয়ে যদি বাড়ীঘর টর কোর্তে পারি ত কত সম্বন্ধ আস্বে। আমি ছোট পিসিমাকে মানা করে দিয়েছি বিয়ের কোন চেষ্টা না কর্তে। আপনি বলেছিলেন ৫০্ করে দেবেন কারবারের জন্যে। তাই যদি দেন ত ভাল হয়। এর আগের চিঠি বোধ হয় পেয়েছেন। আপনার শরীর কেমন আছে লিখ্বেন। আমারও ভারি শরীর বেশ ভালই আছে।

ইতি

স্নেঃ লোকেন

PRASADA BHAWAN
SHAHJAHANPUR, U.P.
10.8.'39

My dear Mashima

We have had no news from you for a long time I do hope you are all keeping well. If I can be of any service please don't hesitate

to let me know.

We shall be very happy if you could spend sometime with us during the Pujas. The wealther is beautiful here at that time & change will also be very beneficial to your health. Please do not disapppoint.

Pamela & I myself often talk about you and think of the motherly affection with which you treated us during your stay with us in 1936.

We are anxciously looking forward to hearing from you.

With respects to uncle + yourself + little jitendra. P.S. Please permit us to send you your journey expenses.

Mashima you must come. Pronams. Pamela.

Yours affectionates
Jyoti

SAMLONG FARM
NAMKUN (Ranchi)
31.1.40

স্নেহের সুষমা,

কাল তোমার চিঠি আর সেই সঙ্গে কাগজপত্র ও কটি ৫৲ টাকার নোট পেয়েছি। আজ সকালে সেই সব নিয়ে শ্রী রামকিশোর রায় বি. এলের কাছে গিয়েছিলুম। তাঁকে ৫৲ দিয়ে এসেচি। টাকার রসিদ এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

রামকিশোর বলেন যে তিনি বিশেষ চেষ্টা করে তোমার নামে খাজনার রসিদ দেওয়াবেন।

তবে তিনি বলেন যে তোমার মেজো ঠাকুর মহাশয়ের ৯/১/৩৯ তারিখের Deed of Gifift in your favour সেই দলিলের একটা copy (certified copy নয় ordinary copy) দরকার হতে পারে। একটা copy পাঠিয়ে দিও।

চোখের বেয়ারামের জন্য নীলা কলিকাতা গিয়াছে। তিন সপ্তাহর উপর সেখানে আছে। এখন ভাল হয়েচে। আরও ৮/১০ দিন থাকতে হবে। তারপর এখানে ফিরে আসবে। আমার বড় মেয়ে মীনা ও জামাই জগদিন্দ্র চাটুর্য্যে এখানে আছে। আমি একপ্রকার ভাল আছি। তোমাদের কুশল দিয়ে সুখী করিবে। আশীর্বাদ জেনো।

সুকুমার

# The Institute of International Education

2 West 45th Street, New York
Cable Address "Intered"
Administrative Board



March 23, 1927

Miss Sushama Tagore
184 Claremont Avenue
Apartment 26
New York City

My dear Miss Tagore :

I have just received the following letter from Mr. Fraser of Montreal:

"I am more than grateful for your great kindness in having secured for us Miss Sushama Tagore. Unfortunately the season is too far advanced to so-operate with either of the Women's Clubs, so we shall be glad to pay her expenses as well as the honorarium of fifty dollars.

Meantime, I would be glad if you could send further biographical data than is contained in your News Bulletin or would you prefer to have me get in direct touch with her ? Again thanking you and with kind personal regards, "

P.S. A letter inviting Miss Tagore to be her guest while in Montreal is going forward in your care, from Dr. Helen Reid of Sherbrooke Street."

Will you be good enough to send the biographical material directly to Mr. William Fraser, the People's Forum, Montreal Canada ? As soon as the letter of which he speaks comes, I shall, of course, send it on to you.

Sincerely yours,
Executive Secretary
Mary L. Waite

The University of Texas
Austin
July 6, 1927
Department of
Germanic Languages

Mr. Charles I Reed,
250 West 57th Street,
New York.

Dear Sir :

It has just occurred to me that I did not mention the subject of Miss Tagore's lecture here on Friday night, July 5th. We should like to have her speak on 'The Universal Sisterhood'.

Have you any information as to when she expects to arrive in Austin and by what railroad ? If possible we should like to have somebody meet her at the station, or somewhere else if preferred.

I am having an amplifier installed on the platform, so that there will be no question of her being heard. I thought that would be advisable, it being an outdoor lecture.

Awaiting your reply, I am.

Yours truly
I. L. Boysen

Victoria Palace Hotel
6, Rue Blaise—Desgoffe
(Rue De Rennes)
Telephone Segur 62-46
Fleurus 26-87
Adr. Telegr. Victorpal—Paris
R.C. Seine N' 55. 890

Dear Madame,

I hope you have enjoyed your stay in Pars. I came as I promised hoping to have the pleasure of having you to our house once again. I shall keep a charming memory of your visit. Hoping you a happy return to your home country I beg to remain yours most sincerely.

Beatice Cassencourt

9 Villa Biune
Paris
14 Evne

If I can be of any help to you for your departure please let me know.
BC

The Surf
SURF STREET AND PINE GROVE AVENUE
TELEPHONE LAKE VIEW 7600
CHICAGO

ভগ্নহৃদয় লইয়া দেশে ফিরিবেন না।

আপনার কার্য অসমাপ্ত থাকিবে।

আপনি বোধহয় আমার ভগিনী শ্রীমতী শকুন্তলা রায়চৌধুরাণীর সহিত পরিচিত। দেবকুমার রায়চৌধুরী আমার ভগ্নিপতি। কাজে কাজেই আমরা আত্মীয়।

আমার পত্নী ও আমি আপনাকে শীঘ্রই দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। পত্রোত্তর এবং আপনার মত জানাইবেন।

ইতি
শ্রদ্ধাস্পদ
শ্রী গজপতি শর্ম্মা

হ্যাঁ, ডাক্তার সুধীন বোসও Iowa থেকে ডেকেছেন, সেখানে ১২৫্ ডলার দেবেন বলেছেন। এই শর্মা হচ্ছেন বোধহয় জ্যোতীষবাবুর Cousin।

ইতি
সুষমা

AnandKanan
Mussoorie
3.7.24

My dear Mrs. Mukerji–

As soon as I got your note I set about inquiring the whereabouts of the gentleman in question. Only today I had a reply from the gentleman in whose company I had seen him. I was going to call him to see me, when fortunately I came across him this evening. He is

Private Sectary to senior Maharani, Balrampur. I had thus made a mistake. It was not Mr. Mitter. I had met but this gentleman, Mr. Mitter however is his junior and in fact was his asst. previously. He is prepared to do all he can. I suggested and he agreed that he should meat you before further action is taken. So I asked him to come to tea between 4 & 5 p.m, tomorrow. He has afreed. Would you also mind taking the trouble ? He won't come if it rains. But, you could come along in any case, for you need no invitation to our place. So, do come.

Our united kind regards.

Blessing to Bharatigi.

Yours sincerely
S.P. shah

P.S. A word in reply will oblige. A
Verbal "Yes" or "No" will do. SPS.

S.P. SHAH
I.C.S.

Prai
23.05.25

My dear Mrs. Mukherji

Thanks very much for yours of the 20th.

I was thinking of writing to you and asking how you were doing. Mean while I got yours. One feels a lyt indolent with a temperature of 110°. Besiders I have of late been very busy with a dacoity case in which the S.P. and myself have by sheer luck and pluck hauled up a big gang. The Distt. Magistrate is never without his work & worries. Please accept the kind of greetings from both of us. where is Bharati? I hope she is doing well. Children all well here.

Yours Sincerely
S. P. Shah

7 Ballygunge C. Rd
Calcutta
4/2/1919

প্রিয় সুষমা

তোমার চিঠি পেলাম। কমলাদেবীকে তোমার ভালো লেগেছে শুনে খুশি

হলাম। ওরা তোমাকে কোনো কষ্ট দিলে জানিও। সত্যব্রতকে সব বলতে পারো ও তোমার যত্ন করবে। তোমার মেয়ে দুটিকে পরে আমাদের নতুন স্কুলের boarding-এ নেবার ইচ্ছা আছে—এখন ভাইয়ের কাছেই থাক্—তিন মাস পরে মায়না না বাড়ালে থেকো না—সে সব আমি ঠিক করে দোব—এখন দেখো কাজে কেমন লাগে। মাঝে মাঝে চিঠি লিখে সব খবর দিও। আমি তোমার স্বামীকে তোমার খবর দিলাম—তিনি চিঠি না পেয়ে ব্যস্ত হয়েছিলেন। শোভনার সঙ্গে দেখা হয় নি—আমার ইচ্ছে সেও একটা কাজ নেয়। আমি বিছেনায় শুয়ে চিঠি দিচ্ছি তাই বেশি লিখতে পারলাম না।

তোমাদেরই
সরলা রায়

Cherry Grove
5th July' 19

ওঁ

Dear Mr. Pandey,

I was simply delighted to receive your letter. Especially so, as it was quite an unexpected one. But I knew that you were always sincere and not at all conventional, that is waiting for me to write first.

Well here I am at last. We wanted to get away from the great heat of Baroda, but here find ourselves roasted in the day time.

There are no rains here, although it is going to be the month of July.

we are not using any warm clothing now.

We had an aweful experience of Tonga journey this time. The regular tonga services running between Rawalpindi and Srinagar have been stopped so they engaged just some ordinary one-horse tonga for us. The horses were frightfully lean and thin. They were whipped all the time to run and to draw the tonga's which were fully loaded while they were scarcely fit to carry themselves.

Up to Muree we travelled at night and in the early morning, as it was absolutely impossible for the poor horses to run up hill in the sun.

The monotonous sound of our tongas and the stillness of night were now & then disturbed by the shouts of our tonga men calling out to the cartmen, who quietly enjoy sleep inside the cart and allow the bullocks to go on their own way to keep out of the tonga road. After Muree comes Kohala, where the Kashmir state begins. The climate of Muree was very good and as we did not feel the heat of the sun any more, so we left off travelling by night which was no doubt very risky.

Although the journey was very tiresome physically, it was a grand sight. No poet no artist could ever paint the grandeur of the lovely natural beauty one sees from Kohala to Srinagar oh! the view is magnificent-I tell you. Often would I get down and walk to have the fresh and aromatic morning air and enjoy the grand sight of the place just brightened up by the early morning sun.

From Kohala you come across very often those mountain springs of cold and clear water, where you can quench your thirst, wash yourself–sit down and take rest for a while. At Domel the Jhelum and the Kishen Ganga flow side by side much in the fashion of the Ganges and the Jumna in Allahabad, for a short distance. But you can easily distinguish the Jhelum - brown and muddy....

Sushama

## ৬. বিদেশের পত্রপত্রিকায় সুষমা দেবীর ভাষণের সমালোচনা

### The Statesman

May 14 1926

HOMEWARD BOUND

PASSENGERS PER S. S. 'CITY OF CANTERBURY'

The following passegers from Calcutta sailed by steamer City of Canterbury yesterday :—

Mr. and Mrs. R. E. Benner; Mr. and Mrs. W. Buchan; Mr. Baker ; Mr. Bernard Ash ; Mr. Bleek ; Mrs. Boyd and child ; Miss Clark ; Mr. Chapman; Miss Cornaby ; Mr. Cann ; Mrs. Cruickshank ; Mrs. A. Danskin ; Mr. Dalrymple ; Mrs. Dalrymple and child ; Mr. G. Davey ; Mr. Desbenlais ; Mr. H. Green ; Mrs. Gubbay ; Mr. and Mrs. Gillham ; Mr. and Mrs. Grange ; Mr. A. R. de Hoxer ; Mr. B. R. Hudson ; Miss Harland ; Mr. C. E. Hollins ; Mr. W. FitzHenry ; Dr. G. M. Hughes ; Miss L. Harrison ; Mr. and Mrs. Howlett child and infant ; Mr. Hughes; Mrs. Innes and child; Mr. H. Jackson ; Mr. J. C. Lamb ; Mr. and Mrs. J. Lawrie and 2 infants ; Mr. and Mrs. Leslie ; Mrs. Lobb; Mrs. Mefadzen ; Mrs. C. F. MeGregor ; Mr. Musleach ; Mrs. and Miss Merriman ; Mrs. A. and Mrs. Mookerjee ; Miss MacJohn ; Miss Nicol ; Mrs. Norman ; Mr. and Mrs. J Oscard ; Mr and Mrs. C. A. Phillips; Miss D. Redman ; Master Rennick (two) ; Mr. and Mrs. A Robins ; Mr. Robinson ; Mrs. S. B. Mr. I. and Mr. J. M. Smith ; Mrs. Smart ; Mrs. D. M. Skeen ; Mrs. and Mr. Shore, 2 children and 2 infants ; Mrs. Southward ; Mrs. Sundys, 3 children and nurse ; Mrs. Samson and child ; Mrs. A. B; Trenoweth and child ; Mrs. Wardlaw and infant ;

Miss C. E. Woodward ; Mrs. Collett white and daughter ; Mr. and Mrs. J. A. H. Wilson and infant ; Mr. and Mrs. Wright and daughter.

## The Hindustanee Student of the Hindustanee Association of America

November 1926

SUSHAMA TAGORE, niece of Rabindranath Tagore, the great Bengalese poet, is one of the most famous women of modern India. Miss Tagore is President of the Women's Educational Society of India and head of her own girl's school in Calcutta.

Left at an early age without a father, Miss Tagore was brought up in the family of her uncle, Rabindranath Tagore, under the personal tutelage of the great poet. Many people believe that no one else could better interpret the poetry of Tagore to western audiences than Sushama Tagore. With a perfect command of English and a clear voice such as is not often met with in the people of India, she gives her lectures and recitals in a manner to be understood and enjoyed. The programs are :

RABINDRANATH TAGORE—his life and work—with readings of the poetry of Tagore.

THE UNIVERSAL SISTERHOOD—The ideals of Hindu women explained to the women of the West.

RECITALS OF SONGS OF THE VEDAS—with descriptive talks. India was the birthplace of music and there Tagore is known as a musician rather than as a poet.

THE SPIRIT OF GANDHI—Miss Tagore knows Gandhi and his philosophy as few do.

Management of

Charles I. Reid, 250 West 57th Street, New York.

# The New York Times

February 6 1927

Women's Work

## HINDU WOMEN ARE QUITTING SECLUSION

Education : Great Need of India, Says Sushama Tagore

One of the things that impressed her on first landing on this side of the Atlantic was the liberty and freedom of the women, Sushama Tagore told a large audience in the People's Forum last night. Miss Tagore, who is a niece of Rabindranth Tagore, the Hindu poet and philosopher, has been in the United States for some months, studying educational methods. She expressed her conviction that the women of India must come out of their seclusion and take more part in the life of the country.

Miss Tagore explained how the pardah system had come into being for protection of the women after the Mohammedan invasion, but this was no longer necessary. In olden times the women had been used to discuss affairs together with the men.

The lecturer sought to dispel the idea that women of India are kept in subjection and ill-treated by their men. This she declared, was emphatically not the case. The Hindu treated women with respect and holds womanhood in such regard that the godhead is spoken of as 'God the Mother,' rather than 'God the Father.'

Asserting that the Hindu woman has much influence in domestic life. Miss Tagore asked : "Do you think I could come 14,000 miles away from home if I had no influence with my husband"?

In America, Miss Tagore said, she had asked how it had come that the women had retained their freedom and she had come to the conclusion that it was because in the early days of the country they had worked side by side with the men. While admiring the individuality of the Western women, the Hindu lecturer thought there was too much emphasis placed on the material, an unwholesome longing for worldly pleasure, "Let us use the material world but do not let it hold us in its grip," she pleaded.

Educated men and women in India, Miss Tagore said, have come to realize that the salvation of the country depends on education. Not that the girls now, though unlettered, are quite uneducated. Their minds and characters are trained and they are inspired with ideals in

childhood, through their ancient culture. But women now desired a definite education, in order that they may co-operate with men in working out the destiny of their country. During the last ten years progress had been made in general education and in instruction in the arts. Miss Tagore told of an all-India conference of women to discuss how best to spread education. This conference was presided over by the Maharajah of Baroda, who had introduced free and compulsory education in her own state.

In answer to a question as to the introduction of Christianity into India. Miss Tagore expressed the opinion that before western peoples tried to convert the 'poor Indian heathen' they should study the Hindu religion thoroughly. The people were grateful, however, to the missionaries, especially for their assistance in education.

English is compulsory in all the schools and is taught in the government schools from the fourth standard to the University.

After her short address, Miss Tagore chanted an old Vedic hymn and also sang one of the poems of her uncle, Rabindranath Tagore.

Miss J. G. Sime presided and introduced the speaker. Miss Tagore was in her native costume, wearing a sari of purple silk with sleeves of green embroidered in gold.

## The New York Times

March 6, 1927

Reprinted from The New York Times, February 6, 1927

### TAGORE'S NIECE
### HERE TO STUDY

**An Indian Teacher, She Finds in the American School System Much That Would be Of Use in her Own Country**

**A Hindu Woman Studies America's School System**

**The enlightened women of India long have recognized the need for a better educational system in their country, a system that while teaching the fundamentals of learning will at the same time train the students to follow the traditional ideals of their nation.**

**Foremost among these women is Miss Sushama Tagore, niece of**

the distinguished Hindu poet, Rabindranath Tagore and herself from a family that for six generations has stressed liberality of thought and greater freedom of Hindu women. Miss Tagore is now in the United States visiting the public schools of various cities and acquiring knowledge that will be useful in her own country.

For the purpose of making a study of primary and secondary school systems of this country, in so far as their methods may be applied to India, Miss Sushama Tagore, niece of the distinguished Hindu poet, Rabindranath Tagore, has come to America. Miss Tagore is visiting schools in and around New York, after which she will go to Detroit and Chicago and later to california, returning to India by way of Japan and other countries of the far East.

According to estimates, only $1^1/_2$ per cent of the girls and 3 per cent of the boys of India have even so much as a secondary education. Despite repeated attempts to get a bill through the national congress, India still lacks compulsory education law or the apportionment of sufficient funds to maintain a universal school system if it were established. Our free public school system and the close-knit, efficient organization involved in its maintenance are the facts that, made the deepest impression on Miss Tagore in her first contacts with America.

"In educational methods America has much to offer that can be applied to good purpose at home," she said recently. In education, however, Miss Tagore believes firmly that India must not imitate, but rather must preserve national ideals and traditions : "Educate the Indian boy and girl for Indian life. To be like one's own people is the better way," she says.

Like her uncle, Rabindranath Tagore, she believes that general education for the masses is more important than any kind of agitation for political change. A word such as 'non-co-operation' is meaningless to the great majority in India, education being permanent and political conditions transitory. At Shantiniketan, the school near Calcutta founded by Tagore, fine ideals of Indian manhood and womanhood have been established by the influence of the master.

Indian girls should be educated and trained for marriage, Miss Tagore believes, "To be a good wife and mother is of prime importance." She herself is the wife of a prominent barrister in Calcutta. In India she is known as Sushama Devi. Coming, as she does, from a family

that for six generations has stressed liberality of thought and greater freedom for women, it was only natural that her early' teens should find her in full-fledged revolt against marriage ; marriage as a conventional custom.

But tradition and a mother's firm guidance triumphed, so that she was married at 16. Meanwhile, a new ideal had come to Miss Tagore through the reading of 'Uncle Tom's Cabin.' It was the story of Harriet Beecher Stowe's successful combination of a writing career with domestic problems that pointed the way and helped Miss Tagore in the problems of her own life. The use of her maiden name for professional purposes she treats quite casually; it is a matter of convenience rather than conviction.

Virtues of Hindu Woman

Miss Tagore emphasizes in the training of young girls that come to her school the traditional ideals of Indian Womanhood — the life stories of the great women of the past. Contrary to popular belief in America, she points out that the women of India exercise a profound influence in the home and even, if their position warrants it, in public life. They have full control of money and the family purse and matters of importance in the lives of their children, such as education and marraige, are left in the mother's hands.

The supreme, traditional virtues of the Hindu woman, says Miss Tagore, are fidelity, sincerity and self-sacrificing love. A wife subordinates her wishes to those of her husband. "In a contest of wills on some trivial matter, it is the weaker one who remains stubborn and the stronger one who gives in, is it not?" asks Miss Tagore, with the conviction instilled by a fervent religious faith. Just as a son is trained to consider it his duty to look after his parents in their old age, so a girl knows that when she marries she assumes the obligation of caring for her parents-in-law—nursing them in sickness and always dutifully serving them. For the family as a unit is the axis on which life revolves.

"We have flappers in India, too," Miss Tagore admitted ; "flappers who hide behind their 'saris,' the conventional indian dress for women. Our problem is to guard against their imitating what is bad in their contact with the life of the West. For our schools we need system, organization, more money and leaders with vision and experience."

For such leadership Miss Tagore is fitting herself. Her brief stay in America has already yielded her an enviable familiarity with the Dalton plan and the principles underlying montessori and nursery schools, as well as with the foundations of the American public school system.

## The New York Times

March 7, 1927

INDIA LOOKS TO U.S. SCHOOL

NIECE OF TAGORE HERE TO STUDY

AMERICAN EDUCATION

Ninety-Nine Per Cent of the Women

in Her Country Cannot Read—

Her Mission to Bring Them Enlightenment.

The education of women is more important than the education of men, in the belief of Miss Sushama Tagore, niece of the Hindu poet, Rabindranath Tagore, who arrived in Kansas City yesterday to lecture before women's organizations.

"I believe this is true because the women are to be the future mothers and teachers of all mankind," Miss Tagore said last night.

Miss Tagore is the guest of Manindra C. Guha, professor of chemistry at Kansas City university, Kansas City, Kansas, her countryman and Mrs. Grace Fritter, Mayfair hotel. She came to America to study the school systems in so far as their methods may be applied to India. She is primarily interested in the educational betterment of the women of her country. Her departure from India eleven months ago was her first venture into western countries.

Lectured at Education convention

Miss Tagore gave a series of lectures at the World Federation of Education convention in Toronto. She came here from Los Angeles.

She is president of the woman's educational societies in India and is head of a primary school in Calcutta, ninety miles from the international university of Biswabharati, which her uncle founded.

"I came to study educational methods in this country and to take back something to my own people," Miss Tagore said. "The missionaries have given people the wrong idea of hindu women ; they speak of them as 'down-trodden.' This is not true, the women of India even in olden times talked with men concerning philosophy and music and they are just as competent upon political and social conditions now as they were then."

World Sisterhood a Path to Peace

Asked what she considered the place of women, Miss Tagore answered earnestly. "United sisterhood is a certain path to world peace. Missionaries do good work, but we do not need any more religion or spiritual things, we need real maternal uplift. If we women could be united there would result a betterment of the world, a final striving for world peace and a real brotherhood among nations."

"I believe if there were schools in India to build up the character of the young girls, they would be molded into strong women. What India is lacking, is an educational system for women—only 1 per cent of the women can read at the present time. If we could work by individual effort, then we could do something to promote education among the women and girls of India."

## The New York Times

March 8, 1927

Niece of Great Tagore Sees Romance in Busy Streets
Here for First-Hand View of America, She
Sees U. S. Women as Spiritual and
Believes in Prohibition.

BY ALICE KUEHN

Would you have romance, velvety soft and langorous as the petals of a yellow rose?

Then seek it not in America, for romance in this land is of an entirely different sort. Seeing it through the eyes of Sushama Tagore, niece of the great Indian poet, Tagore, romance in America is found not in moonlit gardens but in the mutterings of crowds in the bustle

of city streets, in the whirr of machinery's wheels, in the busy whirl of progress and achievement. It is a vital sort of romance and is food for thought for a dreamer from the east.

For no other reason than to seek adventure and to study American ways, particularly the ways of American women, Miss Tagore has come to this country. It is the first time she has even been outside the gates of Calcutta.

### Adores American Women

In order to gain all the experience and viewpoints she could she has come to this country alone. While in Cleveland she is the guest of Mrs. E. C. T. Miller in her home in 11318 Bellflower rd.

This charming little woman with skin the color of an olive and great mysterious black eyes in which lie the spell of the east adores American women, their ways, customs and clothes, In fact the first thing she did when she returned to her New York hotel after a saunter up Fifth ave, was to shorten the length of her skirts. She will not shear her locks, however, for long hair is woman's great charm she claims and neither will she rouge nor use a lipstick nor smoke a cigarette, because it is 'most unladylike.'

"America is great and has many contributions to make to the east," she said with her lovely soft voice. "Women here uphold all the great ideals. The big movements of the country, it seems to me, are led by the women. Then and perhaps this seems queer for me to say, but I believe it in my heart to be the truth, no woman of any other race has the spirituality that the American woman has. It is shrouded with a veil, but nevertheless it is there and is a great moving thing. It predominates in all life in this nation. Your independence is to be envied as is your freedom.

### She is for Prohibition.

And as for prohibition this lady of Calcutta who chants the hymns Buddhist priests sang in their sacred temples 4,000 years ago would like to take back to her land the eighteenth amendment locked up in a little box.

"We have heard much of your prohibition," she said, "and I have carefully watched its effect on your people. I hear much of these things

called flasks and was told by people in New York they were quite the thing to carry in one's pocket."

"There seems to be much concern about your young people and the effect of potent liquors—but remember this—it is not this generation, nor the next, but the third that will benefit from these liquor laws. Great changes take long ages to become perfect and it is the third generation that will derive the benefits of this law of American countrymen."

Miss Tagore is 'Miss Tagore' because the laws of her country allow her to keep her maiden name although married. She wears no wedding ring, because it is considered a sign of evil women in the east. She is a teacher in Calcutta and translates the old Indian hymns and Chants which she sings in the weird fashion of the orient.

## IOWA Capital Desmoynes

March 8, 1927

Miss Tagore Sees World Sisterhood

East met west yesterday in spite of Mr. Kipling, when Sushama Tagore, niece of the Hindu poet, Rabindranath Tagore, addressed the Women's Club at Hoyt Sherman place. A great universal sisterhood working for world peace was the speaker's plea, who visioned women as man's co-operator in life rather than his competitor.

"Women have more influence with men than men have with women," said Miss Tagore. "Women is God's way of creation. Here you call God Father. In India we call Him Mother. Women realize themselves through motherhood."

Woman should be adorned with fidelity and self-sacrifice, Miss Tagore said. "When I see the women of your country with so free a spirit, so full of life and accomplishment I know that when I return to India I shall encourage my sisters there to come out of their seclusion and take their place in the world."

Women have always been influential in India, however, according to the speaker, who cited the number of women who are honored in Hindu literature and history.

Hindu scripture teaches that woman has equal rights with man and

the idea which many Americans have that women in India are merely the chattels and playthings of man is all wrong, says Miss Tagore.

"More money is spent on the upkeep of Columbia university in New York in one year," she said "than is expended on education throughout the whole of India."

Miss Tagore is keenly interested in the spread of education among the women of her country and is making a survey of methods during her stay here.

"I see a great international feeling of fellowship among the cultured people of your country," said Miss Tagore. "You are open minded, ready to believe that there are no races on earth except the great human race."

"On the other hand, I hate to say that I observe here a big feeling of unrest in the youth of your country, a hankering after the material things of life".

Wears Native Costume

'Real satisfaction,' she continued, "lies in control and self-restraint. Let us enjoy the material side of life, but not lose ourselves in its glamour."

Dressed in a striking native costume of red and purple satin, embroidered in gold, Miss Tagore was the center of all eyes during her talk.

She was introduced to the club women by the Rev. Henry adlard, who is a student of affairs in India.

## The New York Times

March 7, 1927

Her School in Calcutta

Miss Tagore herself has likewise put her theories for sound eudcation into practice. Five years ago she started a school for girls in her own home in Calcutta, and 'Balika Siksha Sangha', now has an enrolment of from 200 to 250 pupils. It developed originally out of her professional interest in music and slowly expanded into a day school where girls are taught ordinary, common-school subjects.

**From : Sushama Tagore, Room 304, 80 E. 11th St., New York City.**

## The New York Times

March 18, 1927

### NIECE OF TAGORE STUDIES BOSTON

Hopes to Restore India's Lost Culture
With Best of American Ideas

A delightful little Hindu lady—daughter of a land that was the center of a famous culture a thousand years ago—comes to Boston, that she may take back home a taste of the cultural standards of the Occident.

Miss Sushama Tagore, niece of the distinguished Hindu poet, Rabindranath Tagore, devoted 12 years of her life to travel through her native land, that she might better learn the needs of her people ; and now, hopeful that she can restore the lost culture of India, she comes to America for the very latest in educational standards.

In Boston she has been visiting the Museum of Fine Arts, the Public Library and the universities that lie within easy reach of the city and her stay here is but a duplicate of the visits that she has made to a score of other American cities since her arrival here.

Miss Tagore is a charming bit of the Orient in an Occidental setting. Short of stature, quiet and demure, with lazy dark eyes that can flash fire when the occasion arises, it takes the native garb of India to really do justice to her Hindu beauty.

She speakes softly, with never a trace of bitterness at the lot of her people and her expression never changes, except when her deep dark eyes seem to smile.

#### Hard to Escape Politics

Last night, at the home of the Veranta Circle on Beacon st, she was more than willing to talk of India's scholastic troubles and she quietly and pleasantly but firmly refused to discuss Indian politics.

"And yet," she said in her quiet, delightful way, "it is so hard to tell any of India's troubles without talking politics."

Even as late as a Hundred years ago a Governor General of India reported one-third of the population educated. In the years that have passed that third has shrunk to $4^1/_2$ per cent.

"The village schools have disappeared," Miss Tagore rather

sorrowfully remarked, "and it is very hard for those in the small villages to get to the few schools that are in the larger cities." Then she seems to brighten up and she adds, "but I hope to restore the culture that has been lost."

Miss Tagore was a bit disappointed when she first reached this country. She had been reading of our little 'red schoolhouses' and she was delighted with the thought that there was a great possibility that they might solve India's educational troubles.

Then, she came here and as she says in her own inimitable manner, "I found no red schoolhouses—I found huge institutions and great brick buildings."

Just where those village schools that she speaks of have disappeared she doesn't seem to know and what caused them to disappear is another mystery. Enough, perhaps, that they were there a century ago and have slipped into oblivion in the passing years.

Education for the Masses

Miss Tagore believes in putting her theories into practice—her own school at Calcutta is a proof of that. It was started five years ago and is exclusively for girls. It is known as 'Balika Siksha Sangha' and now has an enrollment of 200 to 250 pupils.

Miss Tagore believes that above all things a girl should be "a good wife and mother." She herself is the wife of a prominent man of Calcutta and she is known there as Sushama Devi.

She believes that education for the masses is of much more importance than any political change in India and as she stresses the importance of education to the people of her native land she adds that it must be an education that will preserve national ideas and traditions, not one that is imitative.

"Much may be learned from American methods of education," Miss Tagore insists, "but the Indian boy and girl must be educated for Indian life, for to be like one's own people is the better way."

From Boston she will go to Florida and in a few months return to her native India. Lecturing now and then on India's educational troubles, she is primarily here to study our own methods in the hope that they may be applied with success in Indian villages and cities.

## The Gazette, Montreal

Monday, April 18, 1927

SAYS HINDU WOMEN NOT ILL-TREATED

Sushama Tagore Dispels Western Fallacy as to Men's Attitude in India

EDUCATION NEEDED

Indian People Recongnize Caste System Must Go, Native Speaker Tells people's Forum

India's greatest need is education and the women of India, realizing this, are doing their utmost to foster better methods and establish schools, Sushama Tagore, M.A., niece of Rabindranath Tagore, told a large audience in the People's Forum last night during an address on "What the Women in India are Thinking About."

In her brief address, the speaker, a graduate of the University of Calcutta and an accomplished musician, sought to dispel at least one of the impressions of the western world with regard to the women of India. When she arrived at New York, she said, one of the first questions she was asked was whether the Hindu women were not downtrodden and ill-treated by the men.

To this she gave an emphatic negative and dwelt at some length upon the respect with which women are treated in India. The Hindu conception of women is altogether different from that of the people of the west, she continued; God is conceived as a mother and not as a father and in addressing little girls the men will call them 'mother', realizing that in them they have the spark of motherhood. The term, therefore, is one of the utmost respect.

She was struck, however, on her arrival in America, with the freedom enjoyed by American women, by their brightness and their beauty. She had asked herself how the women in America had been able to maintain their individuality, freedom of movement and expression and had found the answer in the assistance rendered the men in pioneer days, when women proved their worth and their right to a share in the better things of life.

In India the women realized that education alone can solve the problems of India, particularly, in so far as they affect the status and life of women. The Hindu girl, she continued may be unlettered but

she is not uneducated; she is their heir of one of the oldest cultures in the world and carries the ideals and teachings of her youth throughout her life. She does, however, need education above everything else in order that she may better co-operate with men in bringing India to its proper destiny.

Sushama Tagore spoke of the establishment of schools where the arts are taught after the fashion in English schools and where the greater part of the work is done in english, which is compulsory and free.

Religious Question

During the question period the speaker was asked about the place of Christian teaching in India and while she admitted that the missionaries are doing good work, she advised that they should learn something about the Indian religions before attempting to 'convert the poor Hindu.' Another question had to do with the caste system and the speaker voiced the opinion that the people of India realize it should be done away with to make room for fuller development.

After her address, Sushama Tagore intoned an ancient chant in Sanskrit and sang a few verses from the work of her famous uncle, Rabindranath Tagore.

Miss J. G. Sime presided over the meeting and introduced and thanked the speaker.

## The Daily Texan

Sunday, July 10, 1927

"The Ideals of India"

Presented by Niece of Rabindranath Tagore

Lecturer Will interpret Philosophy of Tagore and Ghandi

Sushama Tagore, niece of the famous Hindu poet and philosopher, Rabindranath Tagore, will visit at the University and lecture Friday afternoon on the interpretation of her uncle's works. "The Ideals of India" will be presented by Miss Tagore, Who is especially fitted to give the lecture, since she lived with her uncle.

She is reputed to be the most profound interpreter of the ideals

of the natives of India and certainly of the philosophies of Tagore and Ghandi.

Ideals Misinterpreted

Miss Tagore believes that the ideals of the Indian people have been much misinterpreted and she is expected to present a new and interesting viewpoint on the subject.

The political and social ferment in which India is now involved is frequently discussed by lecturers who seek to interpret it on political and economic bases.

Recent developments in India such as the passive resistance program of Ghandi and his followers will be interpreted in the light of the ideals and philosophies which motivate this type of action.

Understanding Necessary

To acquire a true comprehension of this significant movement, Miss Tagore believe that it is essential to understand the philosophies which play so great a part in determining the attitude of India.

Students of India may expect a novel approach to the subject in this lecture. To the general University public this event should be of unusual interest since it concerns a subject with which so few people are familiar.

Not only is Miss Tagore ably qualified to discuss this subject through extensive study and experience, but she is also capable presenting it in clear and forceful english, which so few of the people of India can do.

## The Daily Texan

First College Daily in the South

AUSTIN, TEXAS, WEDNESDAY, JULY 13, 1927

PHILOSOPHER'S NIECE TO INTERPRET WORKS

Sushama Tagore to Lecture Here Friday at Open Theater

**Sushama Tagore, niece of the famous Sir Rabindranath Tagore, will be one the campus for a lecture at the Open Air Theater Friday at**

8 o'clock.

Miss Tagore, whose home is in India, is making a lecture tour of the United States. She lectured recently at the University of Minnesota, where she was worm-received.

With 'The Ideals of India' as her topic, Miss Tagore will give an interpretation of the works of Sir Rabindranath Tagore. Miss Tagore is ably qualified to interpret the ideals of her native country.

Nobel Prize Winner

As a child she made her home with Tagore, a member of one of the oldest and most eminent families of India. Sir Tagore is famous for the founding of a college at Santiniketan, Bolpur, Bengal, which later became an international institution.

He won the Nobel Prize for literature in 1913. His works cover a wide range of subject matter. He has written 30 poetical books and his prose works include novels, short stories, essays, sermons and dramas. During 1916, he made a lecture tour of America.

Miss Tagore, who is capable of presenting her lecture in clear, forceful english, will have a nobel and entertaining interpretation of the often misunderstood philosophy of India.

## The Daily Texan

First College Daily in the South

AUSTIN, TEXAS, FRIDAY, JULY 15, 1927

Sushama Tagore Interprets Indian Life

And Ideals in Lecture Today

Philosopher From India Talks at Open Air Theater

Niece of Poet Makes Speaking Tour of American Colleges

Educational Leader

**Sushama Tagore, niece of the great poet and philosopher of India, Rabindranath Tagore, is in Austin to deliver a lecture tonight at the Open Air Theater on the 'Ideals of India'. Miss Tagore is making a series of Lectures at the large schools of the United States during the summer.**

The lecturer was reared by her uncle, the great poet and therefore knows more about his ideal than anyone else. It is her desire to enlighten the world to the ideals and philosophies of the Indian people, which have been so badly misconstructed, she thinks.

Miss Tagore is endeavoring to create a world fellowship especially for women. She is one of the most prominent women of India at the present time; she is president of the Women's Educational Society of India and head of her own school in Calcutta.

### Studying American Methods

It is in education that the teacher is most interested and it is for the purpose of learning the educational methods of America that she is in this country, "In educational methods America has much to offer that can be applied to good purposes at home," she says.

In education Miss Tagore believes firmly that India must not imitate, but rather preserve national ideals and traditions. "Educate the Indian girl and Indian boy for Indian life. To be like one's people is the better way," she explains.

Miss Tagore has put her theories into practice. Five years ago she started a school for girls in her own home in Calcutta and 'Balika Siksha Sangha', now has enrollment of from 200 to 250 pupils.

It developed originally out of her professional interests in music and slowly expanded into a day school where girls are taught ordinary, common-school subjects.

### Trains for Marriage

Indian girls should be educated and trained for marriage, Miss Tagore believes. "To be a good wife and mother is of prime importance." She herself is the wife of a prominent barrister in Calcutta.

In India she is known as Sushma Devi.

Coming as she does from a family that for six decades has stressed liberality of thought and greater freedom for women, it was only natural that her early teens should find her in full fledged revolt against marriage; marriage as a conventional custom.

But tradition and a mother's firm guidance triumphed so that she was married at 16. Meanwhile a new ideal had come to her through the reading of 'Uncle Tom's Cabin.' It was the story of Harriet Beecher

Stowe's successful combination of a writing career with domestic problems that pointed the way and helped Miss Tagore in the problems of her own life.

The use of her maiden name for professional purposes she treats quite casually; it is a matter of convenience rather than conviction.

Preserves Indian Ideals

The teacher emphasizes in the training of young girls that come to her school, the traditional ideals of Indian womanhood—the life stories of the women of the past. The supreme, traditional virtues of the Hindu women, says Miss Tagore, are fidelity, sincerity and self-sacrifice. A wife subordinates her wishes to those of her husband. Just as soon as the son is trained to consider it his duty to look after his parents in their old age, so a girl knows that when she marries she assumes the obligation of carring for her parents-in-law—nursing them in sickness and always dutifully serving them. For the family as a unit is the axis on which life revolves.

She also attempts to justify the resistance of the Indian people to the British rule, in view of their principles. Tagore and Gandhi were the leaders of thought of the Hindus, and the lecturer is therefore well qualified to discuss the problems of the orient.

Faculty Women's Club Honors Miss Tagore

The Faculty Women's Club in collaboration with members of the International Relations Club, is honoring Miss Sushama Tagore, niece of the poet of India, Rabindranath Tagore at a reception and garden party Friday evening immediately following Miss Tagore's lecture.

Reception will be held at the faculty Women's Club House, 2610 Whitis Avenue.

In the receiving line will be the officers of the club : Miss Ruby Terrill, Miss Tagore, Miss Mary Gearing, Miss Clara Parker, Mrs. Gharles Joe Moore, Miss Nannie Sanders.

Associate members who will serve are : Mrs. R. L. Bewley, Mrs. C. W. Gardner, Mrs. Rebecca Schofield, Mrs. H. H. Sevier, Miss Fannie Andrews, Miss Leffler Corbitt, Miss Ethel Hilton, Miss Octavia Rogan, Mary Sanders.

The committee on arrangements is as follows: Miss Dorthy Schons,

Chairman, Miss Lenoir Dimmitt, Miss Wilma Ervin, Miss Lois Ware, Miss Sarah Dodson, Miss Annie Hill, Miss Erma Gill, Miss Laura Rissman.

Members of the Faculty and International Relations Club will be guests.

## The Daily Texan

Saturday, August 13, 1927

INDIAN WOMEN
KNOW WAYS OF THE WORLD
DESPITE VEILED LIFE

TORONTO, AUG, 13.

Miss Shushma Tagore, niece of Dr. Rabindranath Tagore, speaking at the World's Education Conference today, expressed the opinion that Indian women in spite of their sheltered life, knew the ways of the world, were trusted and treated with great regard by Indian men.

"I have thought and am convinced," she said, "that in time we shall abolish the veil system and come out into the air. Don't let me give you the impression of some of my Western friends that Hindu women are oppressed and ill-treated or are men's playthings. This has never been so."

Miss Tagore, who was speaking on the subject of universal sisterhood urged that geographical conditions ought not to prevent this.—Reuter.

## The Amrita Bazar Patrika

August, 1927

WAR ON VEILS
POSITION OF INDIAN WOMEN IN SOCIETY
Miss Tagore As defender of Male partners

TORONTO, AUG, 13.

Miss Shushama Tagore, sister of Dr. Rabindranath Tagore speaking

at the World's Education Conference expressed an opinion that Indian women in spite of their sheltered life, knew ways of the world, were trusted and treated with great regard by Indian men. I have thought and am convinced that in time we will abolish the veil system and come out into air.

Don't let me give you the impression of some of my Western friends that Hindu women are oppressed and ill-treated or are latters playthings. This has never been so.

Miss Tagore who was speaking on the subject of universal sisterhood urged that geographical conditions ought not to prevent this. Reuter.

## বিশ্বশিক্ষা সম্মেলনে

### ভারতীয় নারীগণের অবস্থার কথা

**টরোণ্টো, ১৩ই আগষ্ট**

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী সুষমা মুখোপাধ্যায় বিশ্বশিক্ষা সম্মেলনে বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ভারতীয় নারীগণ অন্তঃপুরে বাস করিলেও তাঁহারা পৃথিবীর অনেক রীতি-নীতি জানেন এবং ভারতের পুরুষগণ তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করেন ও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি এবং আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, সময়ে নারীদিগের অবগুণ্ঠনের প্রথা উঠিয়া যাইবে এবং তাঁহারা মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিবেন। আমার কোনো কোনো পাশ্চাত্য দেশীয় বন্ধুদিগের ন্যায় আপনাদের মনে এরূপ ভাব আমি মুদ্রিত করিব না, যে, হিন্দু নারীগণ নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকে বা তাহারা পুরুষদিগের ক্রীড়াপুত্তলী। কোন কালেই এরূপ ছিল না। ঠাকুর কন্যা শ্রমতী সুষমা বিশ্বজনীন ভগিনী ভাবে সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার কালে বলেন, ভৌগোলিক অবস্থার জন্য ইহাতে বাধা প্রদান করিতে দেওয়া উচিত নহে।

## Globe, Toronto San Francisko

Aug 13, 1927

INDIAN POET'S NIECE URGES SISTERHOOD
AS PATH TO PEACE

Miss Sushama Tagore Stresses Value of Women's Unity

LAST W.F.E.A. SESSION

The last of the general sessions of the world Federation of Education Associations was held in Convocation Hall yesterday afternoon. Instead of two sessions, at Convocation Hall and Jarvis Collegiate Institute, with 13 speakers, it was found necessary to combine the two in Convocation Hall and not only reduce the number of speakers, but also limit their time.

Women and especially the women of India, were much to the fore in the speeches. Miss Sushama Tagore of India, niece of the poet, Rabindranath Tagore, spoke on the Universal Sisterhood as being the sure path to world peace and Miss Pope of Hyderabad, India told of the problems confronting the teaching of girls in India.

### Share Equally

Miss Sushma Tagore held forth as the ex-planation of the freedom of women on this continent the part played by the wives and daughters of the Pilgrim Fathers. "They shared equally in the dangers. So why should they not have equal freedom in this time of prosperity ?

Speaking of the modern restless spirit she reminded her listeners of Hindu philosophy, which teaches on the great eternal matter everything in this world is ..... work of the Almighty, ..... should bend, and ..... said.....

## The Times, Los Angeles

California, October 8, 1927

Tagore's Niece Finds America Rather Nice

The freedom and independence of American women have impressed Miss Sushama Tagore, niece of Rabindranath Tagore, Hindu poet and

philosopher, more than anything else she has observed thus far on her first visit to the United States. Miss Tagore arrived in Los Angeles Several days ago from New York and during her stay here will be the guest of Mr. and Mrs. Sakharan G. Pandit of 5135 Range View avenue.

Her visit is being made for the purpose of studying the American school system, with particular regard to primary education. Miss Tagore is at the head of the Balika school for girls in Calcutta and is an outstanding worker in India for the spreading of primary education.

Miss Tagore said that in India she heard much of the materialism of America, but says she had found this an exaggeration. She feels that the large foundations, such as the Rockefeller and Carnegie, are evidences of a spiritual quality in our people and finds an eagerness here to promote a greater understanding among the world's many races.

Modren household appliances regarded as necessities here. Miss Tagore finds interesting. She would like, she says, to have the women of India using vacuum cleaners, egg beaters, electrical irons and other attachments, washing machines and all of the time and labor-saving devices which are used so commonly in this country.

Dressed in native Hindu costume, consisting of a red blouse and a sari of royal purple silk with painjores, or anklets, of hand-wrought silver on her feet, Miss Tagore's only comment on her impressions of the styles of American women was that the clothes look all right on them, but she would hate to see her country women try to wear them.

Miss Tagore has lectured in the East and it is possible that she will give several talks while she is on the coast. Her subjects are Hindu music, the ideals of Hindu women and universal sisterhood.

## The San Francisko Examiner

Moday, November 7, 1927

Tagore's Kin Wants Little Red School
Education Sought for India's Women
S. F. Visitor Says Caste Is Worse in
Texas Than in Her Own Country

Miss Sushama Tagore, niece of Sir Rabindranath Tagore, Indian mystic,

poet and philosopher, would like to take back to India with her the little red school house of Abraham Lincoln's day.

Insisting that her people, while unlettered, are not uneducated she would like to see in all of rural India a little red school house typical of the pioneer American era.

In California for a study of primary and secondary educational systems, she expects to visit Berkeley tomorrow, she said at the Clift hotel, where she is a guest.

"The caste system in India," she said, "is gradually breaking down. I do not think it is as strong in India as it is in your Taxas, if my observation enables me to draw the correct conclusion. I noticed it there in the street cars and other places.

"But in Toronto where I lectured before the World Federation of Educational Association upon the subject, 'Universal Sisterhood'. It seemed to have completely disappeared."

Would Cast Out Caste

SUSHAMA TAGORE, niece of the poet-philosopher of India. She has arrived in San Francisco, studying American education as a means toward eliminating caste in her homeland.

## The University Daily Kansan

Wednesday, December 7, 1927

Vespers Speaker Believes Humanity Same World Over

Sishama [?] Tagore, of India, Speaks on Education of Hindu Women of Today

Declaring that she found humanity the same all over the world, Miss Sishama Tagore, of Calcutta, India, began her address on 'The Education of Women in India,' before a large audience Tuesday afternoon in Myers hall. The speaker was a niece of the Hindu poet, Rabindranath Tagore.

Miss Tagore said that she was continually asked the difference between Hindu and American women and while she finds the American women different, yet she was delighted to find that all humanity is striving for the higher life.

"I felt for the women of my country when I landed in New York and saw the liveliness and high spirits, the gay and light hearts of the American women," said Miss Tagore.

### Women Not Always Secluded

She explained that the women of India have not always been as secluded as they are now. In the early days women discussed philosophy and art with the men in court while the king was an interested listener. Part of the Hindu scripture which is still sung in the temples was revealed by women.

With the coming of the Mohammedans who tried to convert India by the sword, India was devastated, looted and their women carried off, so it was through necessity that the custom of early marriage and the idea of seclusion was introduced.

Today in Bombay and in provinces free from the Mohammedan influence women are not kept in seclusion.

### Held in High Regard

"Hindu women are held in the highest regard in India," explained Miss Tagore "because we believe that God expresses himself through woman."

Miss Tagore said that she was asked everywhere what her impressions of America were, Several things are clearly visible to her.

In the first place she finds among the educated Americans a great international fellowship and a desire to help other nations.

She was pleased not to have seen a single intoxicated man on the streets in America and she thinks that it will help to make the country more prosperous as the years go on. In the old world, she explained that intoxicated people were frequently found lying in the gutters, especially on Saturday nights.

### Americans Found Restless

Miss Tagore's third impression of American people is that there is a feeling of restlessness among them, a hankering after novelty, which leads her to wonder whether there is any limit to man's desire.

"The Hindu women learn most of the ways of the world from behind their curtain and they know how to guide their minds," stated

Miss Tagore.

Miss Tagore said that there are very few educated women in India, but that they are doing very good work in spreading education among the girls as well as the boys. Many of the Hindu women do not learn their letters until they are 12 or 13 years of age and some of them never learn them. One of the famous women writers of India called the 'George Eliot' of India could not read letters untill she was 14.

Declaring that the idea of education in India is not a new one, but a very old one, Miss Tagore traced briefly the educational system as it originated hundreds of years ago in that country.

### Milando Was Seat of Learning

In very ancient times there were learned Brahmans who conducted schools in the north, south and central parts of India. One of the most important seats of learning established long before the birth of Christ was the University of Milando, which had 16 branches of learning and was free to even international students. The teaching of medicine was a very particular branch taught.

In 1822, Monroe, an English governor of India, conducted an educational investigation. He found one third of the people well educated and a school in every village. Now there are no schools in any of the villages, but in several states ruled by native princes they have free and compulsory education, but this is not true in British India. It seems that under the foreign government, 80 per cent of the money goes away from the country for military and other purposes and as a result there is very little left for the improvement of conditions at home.

### Great strides Made

Realizing that education is necessary for the welfare of the country and the people, there has been great strides in the educational movement during the last ten years.

Hundreds of schools have been founded and for the first time, four or five schools where Hindu music is taught have been opened.

It is the hope of Miss Tagore that during the next ten years, they will be able to do much and it is with this object in view that Miss Tagore came to America to study mass education.

In concluding, Miss Tagore was asked for her solution of the world problem and she said, "When women are united as wives, mothers and daughters they have more influence on man, than has man on woman. If we would only remember that we are all children of one God, our women united would establish world peace."

Women's Education Favored

Speaking at the Y. M. C. A., noon forum Tuesday Miss Tagore especially emphasized the fact that she is in favor of educating the women rather than the men, because women have such a great influence on men. Miss Tagore was asked to discuss politics but this she refused to do.

After the conclusion of Miss Tagore's afternoon address she sang a hymn, over 8,000 years old which is sung in every temple in India.

Sandhu Introduces Speaker

Miss Tagore was introduced by Randhir S. Sandhu, a native of India, who is attending the medical school at Rosedale. Mr. Sandhu said that Miss Tagore's family has been known in India for the past 1200 years. Her grandfather was a great reformer and her cousin an internationally known artist.

As a part of the afternoon program, Helen Beard, fa'28, accompanied by Dorothy Enlow, fa '30, sang 'Allah,' by Chadwick and 'Coming Home' by Willeby.

## The Central High School Pantograph Kansas City

KANSAS, December 16, 1927

UPPER CLASSMEN HEAR HINDU LADY

Miss Tagore Learns of Nation Through Book

HEADS PRIMARY SCHOOL

Indian Children Receive Education from Tutors who Charge No Fee.

"I didn't know much of America until a book came to me. It came from a friend and it was 'The Life Of Lincoln,' said Miss Sushama Tagore, who talked to the juniors and seniors at an assembly last

Thursday morning in an interview after the assembly. Miss Tagore is a niece of the great Hindu poet and philosopher, Rabindranath Tagore.

Miss Tagore was born in Calcutta, India and until a years ago had never been out of that country. Through the book which first attracted her attention to America and from missionary friends, she learned of our great mass education and determined that she would investigate it personally. Her work as head of a primary school in Calcutta and president of the woman's educational societies of her country, made her especially interested in the work which is being done here.

Studies Under Tutors

"I did not go to school," she said, "for there are very few schools left since the Mohammedans invaded the country and the people are only four or five per cent literate. Instead tutors came to my home and I learned from them.

"Children in India," she continued, "first learn how to worship God, then how to become good citizens."

Until a Hindu boy is eight years old, he remains at home. Then he goes to live, for several years, with a scholar whom he calls master and from him he derives his education. During that period no fee is required, but implicit obedience and respect are demanded by the master whom the boys regard as a father.

Lessons are Memorized

"They learn by a system called 'cramming.' Everything must be learned by heart. This kind of school is secluded from city life and is supposed to stimulate boys to pure and healthy habits."

"I like your simple, friendly ways," Miss Tagore declared. Then she turned questioner.

"I have looked everywhere for your little red-roofed school houses, but I do not find them anywhere. Have they disappeard, too?"

"People have asked me such queer questions since I have been in this country. They ask if it is true that mothers throw their babies in the river. Why, how could they, when they love and pray for them, do anything like that?"

Indians Accept Missionaries

According to Miss Tagore, Americans missonaries are accepted, but the Dutch, French, German and others are much disliked.

"During a time of famine," she explained, "they attempt to induce the Hindus to embrace the christian religion by bribing them with offers of food. They do not conduct their lives according to the things they teach and they have nothing better, nothing new, to give to the Hindus."

The visitor paused to look around. "Your school is big, isn't it? All of those seats were taken" and she looked toward the balcony.

Miss Tagore was dressed in a sare the native costume of India, made of soft Hindu silk, which she explained would last for seven or eight years.

## The University Daily Kansan

Dec. 30, 1927

Niece of Hindu Poet Tells of her Country in Recent Interview

Believes Homes Are Broken Up by Woman's Competition With Her Mate

Although Miss Sushama Tagore, niece of the Hindu poet, Rabindranath Tagore, did not get to retire until 3:30 the night before, she very graciously gave the inquirer an interview the next morning at Henley house.

Miss Tagore was asked why she came to this country and she said that she came to learn something about it. "We know very little of this country in India." said Miss Tagore, "but we have heard considerable about the ternble Ku Klux Klan. It is written up so horribly that is about equals the stories concerning the burning of our babies and widows."

Sateism Explained

Miss Tagore then told briefly about the practice of 'sateism' which means the burning of widows. It seems that in olden times it was

practiced to some extent, but largely through the efforts of Miss Tagore's grandfather, Prince Tagore, a social reformer, the practice of 'sateism' was abolished.

"We believe in incarnation in India," said Miss Tagore and "we believe that in the next life we shall be united with our loved ones. This accounts for the fact that our widows never remarry. But, widows are not burned, no indeed, they can commit suicide though when oppressed by grief, the same as people in this country do."

### Has Faith in Caste System

Miss Tagore believes that their caste system in India, the product of thousands of years effort, is very good. By it a person of superior caste is kept from marrying a person from a lower caste.

Asked what she thought about the women in America, Miss Tagore looked very serious and a little sad and said, "I don't agree with them in breaking up homes. I believe that woman should co-operate with men, not complete with them, for the progress of the world. If the Almighty had intended them to be rivals they would have been created that way."

### Is Interesting Person

Miss Tagore is very interesting to look at or talk to. She is of about medium height and build. She has a wealth of shiny black hair parted in the middle and drawn softly back into a knot on the back of her neck. Her eyes are very large and very black. She speaks slowly and with apparent deliberation and occasionally she laughs.

## Tallahassee Daily Democrat

Friday, January 20, 1928

### GIFTED HINDU LECTURER AND MUSICIAN INTERESTS COLLEGE AUDIENCE

**The college community had a rare experience yesterday at convocation when Sushama Tagore, Hindu musician and educator, sang a Vedic**

hymn seven thousand years old.

'Music', said Miss Tagore, "was born in India. It is considered a gift from God and is not to be commercialized, but should be dedicated to the worship of the Great Giver". Accordingly, the hymn which she sang affirms the glory and omnipotence of the One and Only Master of the Universe. She held her audience spellbound; no sensitive person could fail to be stirred by the penetrating sweetness and clearness of the singer's voice and the high devotional quality of the noble chant. It needed a connoisseur to appreciate the delicate shading in tone which is one of the unique qualities of Hindu music. In her singing the soul of worship found voice.

The same evening Miss Tagore gave an illuminating lecture on 'What Hindu Women are Thinking' under the auspices of the Association of University Women. Dr. Helseth, Professor of Education and President of the A. U. W., introduced the speaker as a member of one of the most illustrious families of India for many generations. Her grandfather, Devendranath Tagore, was the leader of the Liberal movement of his time; because of his character and achievement he was called by the people Maharshi, or Great Saint. His oldest son was a noted philosopher and poet; the youngest son, Rabindranath, poet, philosopher and educator; is internationally known; he received the Nobel Prize for literature in 1912, [?] the only Asiatic who has been thus honored. A sister in the family is a celebrated novelist and is known as the 'George Eliot of India.'

It was worthy representative of this distinguished family of artists and thinkers that was listened to last evening : Sushama Tagore, gifted musician and leader of the movement in India for the general education of women. The community is greatly indebted to the A. U. W. for bringing Miss Tagore to us.

## Tallahassee Daily Democrat

Jan 21, 1928

### MISS TAGORE ENTERTAINS ASSOCIATION UNIVERSITY WOMEN

Miss Sushama Tagore, a noted educator of India, Principal of a school

in Calcutta, was the guest of honor at the meeting of the Tallahassee branch of the American Association of University Women at its monthly meeting on January 20. As Miss Tagore is interested in educational methods in this country, the subject for the evening was a fortunate one, The Changing College. But the local members were especially happy to become friends with this charming colleague from the Orient and to hear her tell, in her delightful and inimitable way, of her impressions of America.

Miss Tagore explained to her audience that many people in India have formed their opinion of Americans through reading the American newspapers, and thus, for example, suppose that Americans have a custom of lynching. Similarly she finds that many people in America seem to have heard nothing about India except that babies are thrown into the Ganges. But some people have read such books as the Life of Lincoln. On reading this book, Miss Tagore thought how effective it would be in ridding India of illiteracy, to have a little red school house in every community. This led her to visit America and she has now traveled the length and breadth of the country, studying the educational methods and giving lectures.

Miss Tagore wonders what all the mad rush is about in this country. She believes that the present high standard of living in this country gives the people no time to think of such things as who and what they are and what they are here for. She feels that the women of this country are missing the beautiful home life of the women in India. The Indian women's mission is to look after the home, and cooperate with her husband, but not try to compete with him. Perhaps the time may come when they may have to share the burden of man's life, but Miss Tagore is sure they will prefer home life.

The meeting then adjourned for a social hour and light refreshments.

## New York American

Thursday, February 16, 1928

Freedom of U. S. Girls Fascinates Hindu Woman
But She Can't Understand Why
Americans Can Choose Own Mates

SUSHAMA TAGORE, one of the best-known women of modern India, and president of the Women's Educational Society of India, who has been in America for a year studying conditions, decries the apparent lack of poetic beauty in America.

She said yesterday in the office of her manager, Charles I. Reid, No. 250 West Fifty seventh street, that, although she looked forward eagerly to the time when India's industrialism vie with that of other countries, she could hardly picture India as a commercial country.

Miss Tagore is the niece of Rabindranath Tagore, the Bengalese poet-philosopher. When he came to America in 1920, she said, the combined noises of the subways, telephones, automobile horns, factories and other city sounds made him throw up his hands in horror.

### Still in Indian garb

Miss Tagore still wears the colorful garb of an Indian woman and continues to say goodbye to her visitors by raising her hands to her head, as is the Indian costume.

Some of her impressions of America are:

'The first thing that fascinated me when I arrived here was the almost unimaginable freedom of the women. They do everything they please and must be happy.

### Getting used to them

'Then the big buildings and noises. At first I thought I would not be able to accustom myself to the mad noises, but already I am used to them and do not notice them.

"It would take me twenty years or more to come to any definite conclusions about the social customs in this country. Comparatively I am a stranger here and my opinions must not be taken as conclusive and final.

"I think this companionate marriage plan is very, very bad. It would turn your country into chaos, I fear. It would mean that women would lose all modesty and virtue. Men would no longer regard women as wonderful creatures with souls.

"One thing I cannot understand about Americans. They are given the privilege of choosing their mates, while we in India have no say in the matter. Why must Americans make so many mistakes and continually go to the divorce courts?"

## Sunday Times

Detroit, February 19, 1928

Poet's Kin

VISITS HERE—Sushama Tagore, niece of Rabindranath Tagore, Hindu philosopher and poet, stopped off in Detroit Saturday on her way to New York. She criticized American divorces and companionate marriage.

Tagore's Niece Shocked at 'Companionate' Idea of Marriage

Companionate marriage finds no approval in the minds of the Hindus, Sushama Tagore, of India, said here Saturday. She is the niece of Rabindranath Tagore, Hindu philosopher and poet.

"Your ideas of marriage, companionate marriage and love seem very strange to us," she said. "Your divorces startle us. We believe in the holiness of marriage, considering it a sacred and divine union of two souls. Our marriages are regarded as permanent; separation or divorce, unspeakable. We stay married."

The so-called and often condemned "child marriages" of India in reality are betrothals; a second ceremony is gone through after adoloscence has passed, before the principals live together, the visitor explained.

In the United States to study Occidental cultural standards, the Hindu woman stopped off here on her way to New York and was a guest at the home of Thaker D. Sharman, 632 West Palmer avenue.

## Sunday Times

Detroit, Feb, 26, 1928

Native Of India Says Marriage Sacred There

Miss Tagore, Studying Education Does

Not Envy American Women

By Helen Shalet

Fussusana, niece of Sir Rabindranath Tagore, member of one of India's Brahman families, believes that Miss Katherine Mayo's book 'Mother India,' may be instrumental in awakening an interest in India as it actually is today, not as Miss Mayo has portrayed it. Miss Tagore dismisses Miss Mayo's book as a 'biased piece of work, but eighty percent true,' written by a woman who spent only five months in India and did not know the language. Moreover, according to Miss Tagore, Ghandi, who is her friend, is misquoted in 'Mother India.'

### Well Known Educator

Miss Tagore spoke of 'Mother India' and things American in a background typically New England, at Wilton, where she is the guest of Miss Jessica Bronson of Gruman Hill. Ranendra Khastgir, a friend and fellow countryman, is also the guest of Miss Bronson.

Miss Tagore is planning to return to Calcutta in a month. She will introduce the Dalton method of teaching primary grades at her school in Calcutta. She is keenly interested in the problem of education and came to this country essentially to study methods which she has found most satisfactory. Miss Tagore represented India at the World's Federation of National Education at Toronto and has lectured in thirtyeight of our states.

### American Woman Not Envied

Unlike many women who visit America for the first time, she does not think the American woman is to be envied. Marriage, she pointed out, is sacred in India. Mr. Khastgir, who received his education at the University of Pennsylvania and who has had adequate opportunity to observe the American scene, added that while the high caste Indian had more than one wife, the whole family lived together like brothers

and sisters. In America husbands often have a mistress in addition to their wife, he points out. The wife usually is cognizant of the fact and much unhappiness is caused.

### Approves Marriage

When the conversation turned to the marriage of Nancy Ann Miller to the Maharajah of Indore, Miss Tagore expressed her approval. Her dark, mystic face, suddenly lighted into smiles and she said : "Your missionaries have often tried to convert us and now we have converted one of you". It is only the high caste Indian who has more than one wife in India. According to Miss Tagore and Mr. Khastgir there is more unity and happiness in the Indian, than in the American home.

"You say 'father and mother' most often, but we always say 'mother and father.' You say 'sun and moon' while we always place the moon first because it is feminine in India. We worship God in the form of mother. Our respect for woman is traditional," said Mr. Khastgir.

### Strange Mysticism

The attitude of the women in India is probably best expressed by Miss Tagore in her simple statement : "We stoop low to rise high." Such books as 'Mother India' with its appalling picture of what motherhood means in India, do not trouble the thinking woman of that country. They have a quiet, unassuming manner. Theirs is a perpetual duty to husband and home, not only in this life but in the next to come. Spiritually they are superior. One cannot but sense this while talking with the niece of Sir Rabindranath Tagore. Her long silences, her steady low voice and her evident refusal to engage in small talk, are impressive. She accepts you formally, bending her head over her two palms pressed together as in an attitude of prayer and she bids you goodbye in the same manner.

Mr. Khastgir who has helped Miss Tagore feel at home in America is now writing a play in the quiet of the Wilton woods. 'Buddha,' his latest play, is now being considered by Walter Hampden. Despite the popular conception that a play wright must know every phase of the theatre, Mr. Khastgir has written plays both in his native tongue and English without ever having visited a playhouse.

## Bay City Times Tribune

Thursday, March, 15th, 1928

Improvement Club to Sponsor Lecture By Niece of Tagore

Miss Sushama Tagore, the niece of the great Indian mystic poet and philosopher, is making a lecture tour in the United States and she has been engaged by the club to speak in Bay City on April 23 in the blue room of the Madison Avenue Masonic Temple. The subject of her lecture will be 'Rabindranath Tagore' and since she has lived with her uncle since she was left an orphan when only a child, and is considered one of the greatest living authorities on his works, this will be a splendid opportunity for anyone who is interested in this fascinating poet.

## The Bay City Daily Times

March 15, 1928

SUSHAMA TAGORE COMING APRIL 23

Noted Woman of India Secured by Improvement Club

Bay City people are to have the unusual privilege of hearing Miss Sushama Tagore, niece of Rabindranath Tagore of India, probably the greatest poet in the world today. Miss Tagore is better qualified to present the thought and the work of Tagore to American audiences than any other person. Brought up in Tagore's home and sharing his family life for years she is naturally his best interpreter

Miss Tagore is in America primarily to study American schools. In India she is devoting herself to the development of schools for the Indian children. She is president of the Woman's Educational Society of all India, and is head of her own girls school in Calcutta. She is a quiet, serene woman with the culture of a thousand generations of the best people of India behind her. She speaks with a gentle, well modulated voice and uses the English language with simplicity and beauty. Her readings from Tagors are beautifully done and her interpretations of his thought reveal to her audience not only the high and deep thought of Tagore, but something of the best of Indian thought and insight.

Rabindranath Tagore received his university education in England, attaining eminence as a poet soon after returning to India. He is probably best known to Americans through his book of child's poems, 'Crescent Moon' and his love poems which are in fact deep religious poems, the 'Gitanjali.' They show Tagore to be a win-some, far-seeing man whose gifts of poetic expression even in English place him among the creators of the world's great poetry. His sense of the reality of God is so great that people of all faiths, Christian as well as Mohammedan or Hindoo, are moved deeply by his works. Recently he has published a new volume, 'Fireflies.' It is just now apprearing in the bookstores and is being awaited eagerly by those who have been fortunate enough to have made the acquaintance of Tagore.

In addition to being a poet, Tagore is also a philosopher, essayist, dramatist and novelist as well as educator. He is the head of a great school for boys at Shantiniketan, India and he has been devoting himself in recent years to the establishment of a World University in India.

Miss Tagore will speak at the Masonic Temple, Monday evening, April 23, under the auspices of the Woman's Improvement club.

## The Amrita Bazar Patrika

May 19, 1928

### MISS TAGORE SPEAKS ON INDIA

False Notions of Americans Cleared

The following is the summary of a speech (taken from the 'Vassar News') delivered by Mrs. Sushama Mukerjea (known in America as Miss Tagore) at the Women's College at Vassar, America. During her stay of more than two years in the U.S.A. She has delivered numerous speeches throughout the length and breadth of the States mainly on Indian topics to educate American opinion on India. Her Indian 'Sari' was everywhere admired and drew crowded houses. Her speech at the Toronto International Educational Conference last year had already been reported by Reuter. She has succeeded in coverting many distinguished Canadians into friends of India who have expressed their fullest sympathy with the Indian national struggle for freedom. She

has decided, on her return to India, to devote her activities to the cause of education of girls on a wider scale—Ed.)

On behalf of the Department of Study, Elizabeth Scattergood, '28, the President of the Vassar Community Church, introduced Miss Tagore, the speaker last Thursday evening. The Department of Study plans to present some modern ideals, and therefore felt itself particularly fortunate to have for its first lecturer the niece of Rabindra Nath Tagore, the great East Indian poet and one of the greatest idealists of our duty.

Miss Tagore began her lecture by saying that little was known of America in India, but that through the newspapers it seems evident to her that America knows as little of India, since we appear to think of Indian as a country where widows are burned and children are thrown into the Ganges. Miss Tagore first became interested in education in America by reading a 'Life of Lincoln' in which much was spoken of the small country school-houses of Lincoln's day. As she travelled over India and saw the poor educational conditions there she remembered the book and the little school-houses and decided to visit America to see if she could there find help in solving her problem. When she came, she found not the little schoolhouses but 'Palatial' institutions in the form of our colleges. She found that Americans seemed to think that the girls of India are quite different from those of the Occident, but Miss Tagore believes that such is not the case. Although we may differ in dress and minor ideas, "Humanity is the same all over the world" and we all have the same ethical code.

When she came to America, Miss Tagore was impressed by the gaiety and freedom of our girls and felt for the women of her land. She became convinced that the Indian women must come out of seclusion. Contrary to popular opinion, the custom of veiling women came not from India originally but was forced upon her by the sword of the Mahomedan conquerer. The system by no means prevails over all India ; in the west and south and in parts of Bengal, the women may go about freely. The seclusion of women is not an intrinsic part of Hinduism, for in former days women were not kept in seclusion, but had a prominent part in the courts, discussing serious matters with the men.

In some scripture, the Koran and the Bible for instance, we find man blaming woman for sin, suffering and death, but according to

Hindu script, man and woman are equal. Therefore the Hindus believe that a man's wife should have a part in all work and Hindus are always willing to let women be their teachers. By Hindu philosophy, every woman in India is highly regarded for in her is "the divine spark of motherhood." Where we speak of "God the Father" the Indians speak of "God the mother", for a child learns to know its mother long before it knows that there is such a being as its father. When God is mysterious and impenetrable, he is addressed as "God the Father," but when the Indians speak of the God that they have learned to know through observation of the universe, they talk of "God the Mother."

In taking up the question of early marriage in India, Miss Tagore said that there was a great difference between matters as they really are and the state of affairs that we think exists. The early marriage system, like the veil, was introduced by invaders, when Tamurlaine took away with him ten thousand unmarried girls. At present high caste girls are not married usually until they are sixteen or seventeen. Among the average people a double ceremony prevails. At the first ceremony the girl, although given away by her father while she is still young, remains at home for several years. After her family is able to send her well-equipped, she goes to her husband and by this time she is sixteen or seventeen. Because of the warmth of the climate, girls mature earlier in India and are prepared sooner for marriage than those of a more temperate climate. The Hindus believe that every man and woman should marry, but the first ceremony, which they call marriage, is more equivalent to our betrothal.

Although she had not expected in stay long in America, Miss Tagore became interested in education here and decided to remain. While she travelled over the country, she gradually found the answer to the question which had arisen in her mind as to how the American women had attained their great freedom. When the Pilgrims came ever, they brought their wives with them and since these women had an equal share in facing all the dangers of the new country, why should they not have an equal share in its advantages? Miss Tagore found that among the educated and cultured men and women of the world was coming a realization of universal relationship and a desire to know more of other people. Miss Tagore found drunkenness but not intoxication in this country. By 'intoxication' she means, the condition

of the utter loss of selfcontrol that she saw in the streets of some of the cities of Europe. The Hindus do not believe in drinking and when Miss Tagore found no drunkenness in the streets, she felt it a proof that the masses have been uplifted and had great hope for the future of the country after the craving for drink had ceased. In regard to the restlessness of the younger generation, Miss Tagore laid the blame on our desire for too much material pleasure. Miss Tagore believes that we can find complete satisfaction in our minds only when we have learned self-restraint. The Hindu woman, inspired with the traditions of her race, has this control of her mind.

Miss Tagore blamed the British for holding back education in India, for it is to their interest to have the people in ignorance. The Hindus learned to value education long before the coming of the aliens, for excavations have shown the presence of many and highly cultivated centers of learning long before the time of Christ. In 1822 a Governor, investigating educational conditions in India, found one half of the population well educated.

## The Times of India

May 28, 1928

BY THE WAY

Miss Mayo might fret and fume at what she considers to be inhuman treatment to which Indian women are subjected. She might boast of her 'unsubsidised' and well documented performance in b inging out "Mother India." She might even include Mahatma Gandhi and Dr. Tagore in her frenzied condemnation of Indians. But Indian mothers, sisters, daughters and wives are certainly supposed to know better than this American maid the honoured place they occupy in their homes. As Srimati Shushama Debi, niece of Rabindranath said at the World's Education Conference, "Do not let me give you the impression of some of my Western friends that Hindu women are oppressed and ill-treated or are the latter's playthings. This has never been so." The mistress of a Hindu house is called 'Griha-Lakshmi'. This word clearly expresses how she is regarded by her male relations.

## A STUDENT OF SOCIOLOGY

Miss Sushama Tagore, niece of Rabindranath Tagore, is now touring the United States of America in order to study the sociological conditions in that country. — P. P. A.

## বঙ্গবাণী

### সোমবার ১০ই আগস্ট, ১৯২৮

### আমেরিকা প্রত্যাগত সুষমা দেবী

### জনশিক্ষার বিস্তারে অভিনব পরিকল্পনা

ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী সুষমা দেবী আমেরিকার বহু স্থান পরিভ্রমণের ফলে তত্রত্য জনশিক্ষার ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিবার যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি ভারতে জনশিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে যে অভিনব পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, নিম্নে তাহার মর্ম লিপিবদ্ধ হইল ঃ—

পরিকল্পনাটির বিশেষত্ব এই যে সরকার হইতে সাহায্য গ্রহণ না-করিয়াও পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রারম্ভে না-হউক, পরিণামে পরিকল্পনাটি আত্মনির্ভরক্ষম হইবে।

### পরিকল্পনা

(১) ভারতের বির্ভিন্ন প্রদেশ হইতে অন্যূন ২০ জন সদস্য লইয়া 'ভারতে গ্রাম-নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি' নামে একটি নিখিল ভারত সংঘের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক কমিটীর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, উহার কার্যালয় সেই প্রদেশের প্রধান নগরে স্থাপিত থাকিবে।

(৩) যে সকল স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড আছে, সেই সকল ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে যতগুলি গ্রাম আছে, সেই সকল গ্রামের এক-একজন প্রতিনিধিকে লইয়া প্রাদেশিক কমিটী গ্রাম-শিক্ষা কমিটী স্থাপন করিবেন। ইউনিয়ন বোর্ড এবং স্থানীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে উক্ত কমিটির সহযোগিতা করে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে পাঠশালা স্থাপিত হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা এবং সকল বালক, বালিকা যাহাতে পাঠশালায় পড়িতে আকৃষ্ট হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ঐ সকল গ্রাম্য-শিক্ষা কমিটীর কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

স্থানীয় চাঁদার সাহায্যে পাঠশালা-ঘর ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকল সময়েই যে ঘরের ভিতর পাঠশালার কার্য্য হইবে, এরূপ নহে। অনেক সময় মুক্ত বায়ুতে পাঠশালার কার্য্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এই সকল গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার জন্য যোগ্য শিক্ষকদিগকে আকৃষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক এরূপ লোক পাওয়া না গেলে পারিশ্রমিক দিয়া শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। এই পারিশ্রমিক যাহাতে নগদ অর্থে না হইয়া জিনিষপত্রে দিবার ব্যবস্থা হয়, এরূপ করিতে হইবে। আমাদের দেশের কৃষকদিগের পক্ষে অনেক সময় নগদ অর্থ দেওয়া কষ্টকর হয়। তাহার পরিবর্তে তাহাদের জমার উৎপন্ন দ্রব্য দিতে তাহারা তত কষ্টবোধ করে না। সপ্তাহে ১ সের করিয়া চাউল বা ডাল অথবা অন্য কোন দ্রব্য তাহারা অনায়াসে দিতে পারে। উহা পাইলে শিক্ষকেরও বেশ চলিয়া যায়।

প্রত্যেক গ্রামের জমিদার শিক্ষককে ৫ বিঘা হিসাবে জমী বিনা খাজনায় আবাদ করিতে দিয়া তাঁহাকে শিক্ষাকার্য্যে প্রোৎসাহিত করিতে পারেন।

গ্রাম্য, শিক্ষা কমিটীর সদস্যদিগের আন্তরিকতা এবং স্ব-গ্রামের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগের উপর উল্লিখিত পরিকল্পনার সত্যফল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কার্য্যালয়ের ব্যয় অন্য বিষয়ক ব্যয়ের হিসাবে প্রত্যেক প্রদেশের জন্য ৫ হইতে ১০ হাজার টাকার প্রয়োজন। ইহা তেমন বেশী বলিয়া মনে করা যায় না।

## The Amrita Bazar Patrika

Friday, June 21, 1929

### MASS EDUCATION

New Scheme Formulated

(By Mrs. Sushama Debi)

Mrs. Sushama Debi, niece of Dr. Rabindranath Tagore, who has recently returned from an extensive tour in America where she had an

opportunity or studying the American mass education system, in course of a statement to the 'Free Press' formulates a nobel scheme of mass education for India.

The chief merit of her scheme consists in the fact that it can be worked out independently of Government aid. The scheme as outlined by her, she confidently asserts, may be self-supporting in the long run, it not from the beginning.

Scheme for mass educations

1. To create an All-India organisation under the name on "Society for the abolition of illitreracy in rural India" consisting of not less than 20 members representing the different provinces.

2. To establish a Provincial Committee in each province the office of which should be located in its principal town.

3. This Provincial Committee to organise a Rural Education Committee for each group or villages for which there is a Union Board consisting or at least 10 members representing the villages concerned. The Co-operation of the Union Boards and other local public institutions must enlisted.

The function of these Rural Committees would be to see that each village has a school or pathsala for little children and devise means to attract boys and girls to it.

School buildings and other accessories need not absorb more than what each village can easily afford to raise by local subscriptions. In rural areas it is not always necessary that schools should be held indoors. Open air schools should be prepared.

To attract qualified men to serve as teachers in these rural schools, where volunteer teachers are not available, their remuneration must be met from the contributions in kind instead or in coins from the guardians of pupils. Money is so scarce with the cultivators of our country that they would feel hardship to contribute an anna but would not mind giving away the produce on the soil worth four times was much. If every boy or girl attending a school should be required to pay a seer of rice or dal or any other produce of the soil each week, this will be enough to meet the daily requirements of the teacher.

As an additional in entry for the teacher, the village Zemindar may be prevailed upon to allow him to enjoy the fructus of not more than

5 bighas of rent-free land in return for the education of his poor ryots.

The success of the scheme will depend entirely on the earnestness and whole hearted devotion of the members of the rural committees.

## The Pioneer

Monday, July 15, 1929

BACK FROM AMERICA

Mrs. Sushama Devi, niece of Dr. Rabindranath Tagore, who has just returned to India after an extensive lecturing tour in America.

## ৭. সুষমা দেবীর একটি ইংরেজি রচনা

ADVANCE
Tuesday, January 28, 1930
Hindu Students—A Long-Felt Want
Unions in Foreign Countries
(By Mrs. Sushama Devi)

While travelling in Europe, I was struck with the ardour of the 'Hindu' students in Paris to establish the existing 'Hindu' Students Association there on a permanent basis. There are just a few 'Hindu' students in France; but one is hardly aware of the amount of trouble taken by them to build up the infant Association in Paris.

This Association, as at present constituted, was founded in 1923 by the 'Hindu' students then residents in Paris.

'Hindu Students' Association

Here I may mention by the way that by 'Hindu students' I mean both Hindus and Mahomedans. On the continent and in America every man from Hindusthan is called a 'Hindu,' no matter what religion he may chance to belong to. It was most pleasing to find that Mussalman students in the United states of America not only do not mind being called Hindus but actually take pride in the name. In New Jersey state there is a colony of "Hindu" Labourers, consisting mostly of Mussalmans from the Matia-Buruz side of Calcutta. Invited by the "Hindu" Labourers' Union of New Jersey, I was fortunate to have been able to attend a few of their meetings there. Once I asked them if they resented being called Hindu by the Americans. Their answer was that

they were all sons of "Bharatmata". "Why is it only in India," thought I, "that these same men forget that they are sons of "Bharatmata" first and mussalmans afterwards.

## An Interesting Episode

I am reminded in this connection, of an incident that happened to a mussalman gentleman in one of the Southern states in America. The Negroes in the South are quite agregated from the 'White' population. There are separate arrangements in tram cars and separate railway compartments and even the waiting rooms are different for the 'Black' people as the negroes are called there. It happend that the muslim gentleman question who was travelling from New York to Florida was a bit darker in complexion than the ordinary run of 'Hindus'. As soon as the train passed the Northern Zone and arrived at the 'verge' of the south, coloured people took car to shift themselves and their belonging to the compartments specially reserved for them. Of course, the Mussalman gentleman not being a Negro, stayed where he was. The guard came and looked at him and was surprised at the audacity of the man to remain seated in white people's compartment. He ordered him to leave that compartment at once. 'Out to your proper place' shouted the guard in American English. The 'Hindu' defied his and refused to change into the Negroes' compartment, saying that he was not a Negro but a 'Hindu'. He also pointed out to him that he was not even a citizen of the States but just a casual visitor. The guard would not listen to him, but compelled him to vacate the 'white' compartment. The 'Hindus' in the South generally wear a *Safa* or a turban in order to distinguish themselves from the 'coloured people,' but this Mahomedan gentleman made a mistake by overlooking the necessity of wearing his native head dress. He could not or would not gulp down the insult, so he brought a damage suit against the guard and the Railway Company.

In court he declared himself to be a 'Hindu' i.e. a native, of Hindusthan and produced his certificates, pass-port etc. in support to his nationality. His 'white' friends also gave evidence in his favour and spoke to his identity as a 'Hindu.' He won the case and came out of court with a smile of victory on his face. Needless to say that he got a few hundred dollars from the Ry. Company as compensation for the insult.

## Experiences In France

While in Paris I had a talk with some enthusiastic and patriotic Muslim students who were members and ardent supporters of the 'Hindu' students 'Association' there on the subject of a common national designation for all Indians irrespective of castes, creed or race. They all agreed to call themselves 'Hindus' or 'Hindusthanis' indicating one nationality and country. I was glad to find several Muslim students among its enrolled members. Thus only can one get the benefit of travelling abroad. One gets one's angularities knocked off by contact with foreign people.

In Paris there already existed before an Association called the 'Association des Hindus' composed of students as well as non students and Patronized by Hindu and Mussalman merchants. While Dr. Kalidas Nag and Dr. Suniti Kumar Chatterjee were visiting Paris they suggested the creation of a separate Association for students only and accordingly the students' section came into existence. It is needless to say about the imperative need and utility of an Association such as that for our students abroad.

## Indian Students In London

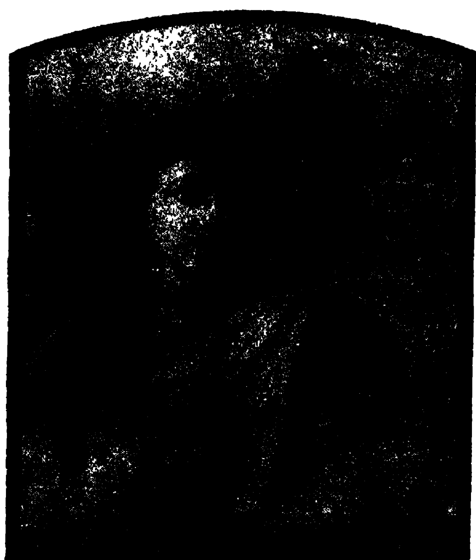
London does not seem to be so much complicated as Paris appears to be for want of a knowledge of French Language on the part of new arrivals from India. There are over 1000 students studying in England; but there does not exist any union, club or association organized by the Indians themselves. The Cromwell Road Hostel or Barrack for Indian students is wholly official. Those who are receiving state scholarships or any other kind of money help towards their education from the Government are supposed to live there. Then there is the Gower St. Union, which, if not wholly, is half official. It is in fact the Indian section of the Y. M. C. A., The English section is altogether separate from it. The Gower St. Union is of course well organised; but according to the Y. M. C. A. rules the officials must be all Protestant Christians. They may come from India, but their thoughts and actions are not in accord with those of us, Indians. Although the money that keeps it going comes out of the pockets of its Indian members, it is those Protestant Christians that run it.

During my visit to London I met many Indian students there and came to learn from them of their difficulty to find a room in a decent Boarding house and where a room is available the charges for it are simply enormous. It is indeed regretful that they have no organization of their own even in London where there are so many students from India. Is there no enterprising man among the students in London who realizes the necessity of such an organization? The sooner the American system of self-help is introduced the better. There are many students who could help themselves by taking up some job or other towards meeting their living expenses.

## ৮. সংযোজিত চিত্রাবলি


রবীন্দ্র-অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুষমা দেবীর পিতা


নীপময়ী দেবী
সুষমা দেবীর মাতা



সুষমা দেবী



যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সুষমা দেবীর স্বামী



প্রতিভা দেবী
সুষমা দেবীর বড়দিদি



সুদক্ষিণা দেবী
সুষমা দেবীর বোন



শোভনাসুন্দরী দেবী
সুষমা দেবীর দিদি



স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ (মুণ্ডিত মস্তকে)
তাঁর বামদিক থেকে লোকেন্দ্রনাথ, ভর্গনাথ ও ভাস্করনাথ
সুষমা দেবীর পুত্রগণ



সুমিত্রা দেবী ও বিমলেন্দুকুমার ঘোষাল
সুষমা দেবীর বড়ো মেয়ে ও তাঁর স্বামী

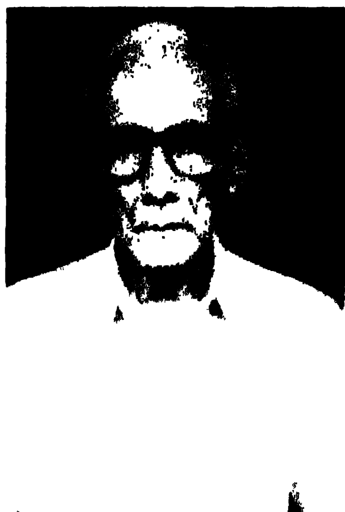




ভারতী দেবী ও জনকপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
সুষমা দেবীর ছোটো মেয়ে ও তাঁর স্বামী



জয়প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
ভারতী-জনপ্রকাশের পুত্র সুষমা দেবীর দৌহিত্র




ভাস্করনাথ মুখোপাধ্যায় ও উমা দেবী
সুষমা দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূ



জয়ন্তনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুতপা দেবী (বুলবুল)
সুষমা দেবীর পৌত্র (ভাস্কর-পুত্র)



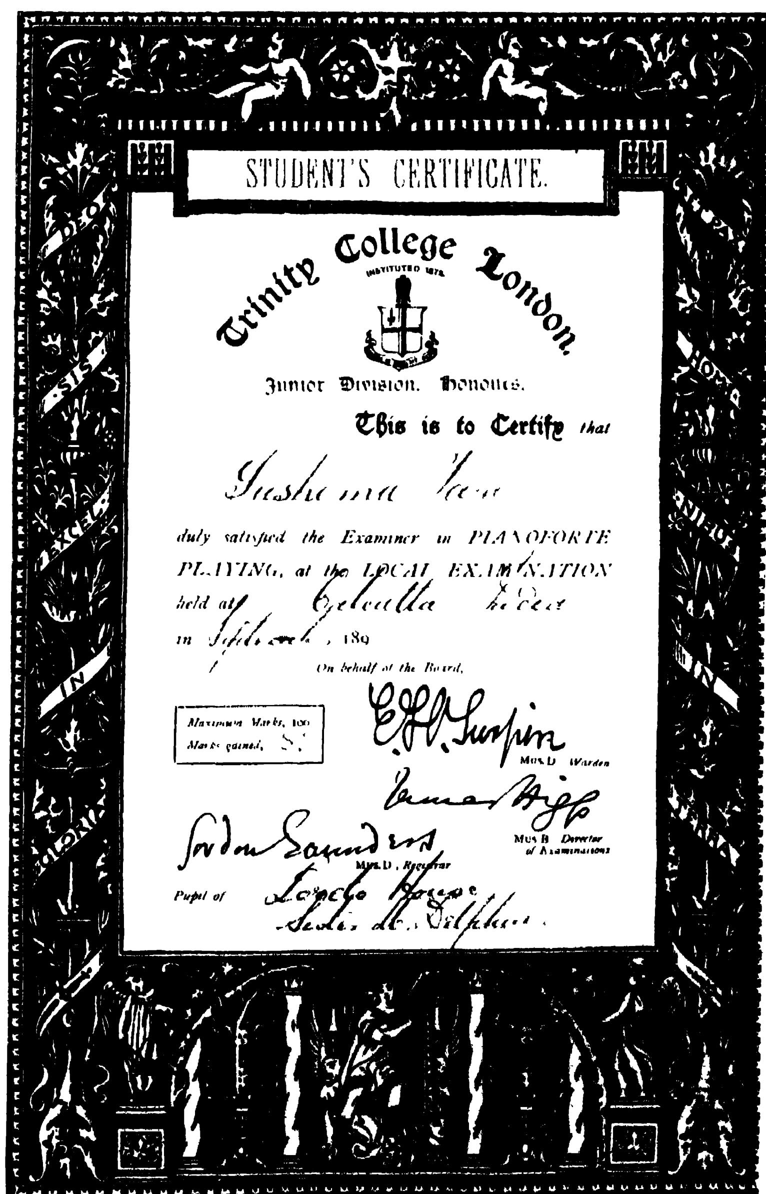
নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
পুরস্কার গ্রহণরত সুষমা দেবীর পৌত্র



অনিল স্মৃতি স্বর্ণপদক
(প্রাপক নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২



প্রভাবতী দেবী
নৃপেন্দ্র-পত্নী সুষমা দেবীর পৌত্রী



STUDENT'S CERTIFICATE.

Trinity College London

INSTITUTED 1872.

Junior Division. Honours.

This is to Certify that

[illegible]

duly satisfied the Examiner in PIANOFORTE PLAYING, at the LOCAL EXAMINATION held at [illegible] in [illegible], 189

On behalf of the Board,

| |
|---|
| Maximum Marks, 100 |
| Marks gained, [illegible] |

Mus.D Warden

Mus.B Director of Examinations

Mus.D., Registrar

Pupil of [illegible]

সুষমা দেবীর পিয়ানো শিক্ষার শংসাপত্র

Anand-Kanan

[illegible]

1/5/24.

श्रीमतीजीके पूज्य चरणकमलोंमें—

आज हम दोनों हरद्वार तथा हृषीकेश
जा रहे हैं। एक दिन ठहरेंगे। फिर
लौट आवेंगे। आप यदि आना चाहें
तो ३॥ साढ़े तीन बजे तक आप
[illegible] लाइब्रेरीपर मिलियेगा।
उससे विलम्ब होना ठीक नहीं
क्योंकि ट्रेन नहीं मिलेगी।
देहरादूनसे ७॥ बजे [illegible]
जो ट्रेन मिलनेवाली उससे हम
आवेंगे। हाँ [illegible]
कृपा करके तुरंत दीजियेगा। [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
Himanshu

সুষমা দেবীকে লেখা একটি পত্র



Magistrate's House
Howrah
12th May 1926

Mrs. Sushama Mukerjee wishes to visit America (United States) to see the country, as she is going to England and would like to pay a flying visit to America also. She will probably stay there a few months only, and will have about two thousand rupees with her.

S. C. Mukerjee
District Magistrate
Howrah




Seen
Vice Consul of
The United States of America at
Calcutta, India
MAY 12 1926

সুষমা দেবীর বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে ছাড়পত্র

SOUTHERN PACIFIC STEAMSHIP LINES
'MORGAN LINE'

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২৭

ON BOARD S S COMUS

[illegible]

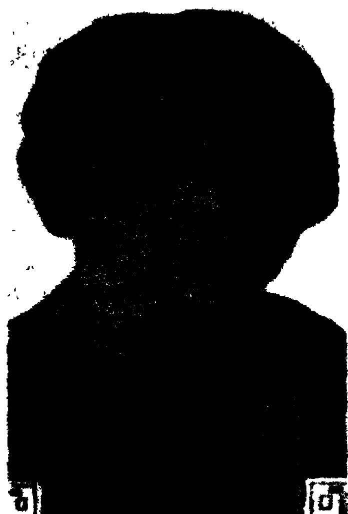
বিদেশ থেকে কনিষ্ঠ পুত্রকে লেখা সুষমা দেবীর একটি পত্র



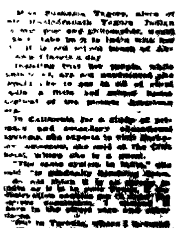
*The Hindustanee Student* পত্রিকায়
প্রকাশিত সুষমা দেবীর একটি ছবি
আমেরিকা নভেম্বর ১৯২৬



*The New York Times* পত্রিকায়
প্রকাশিত সুষমা দেবীর একটি ছবি
৬ মার্চ ১৯২৭

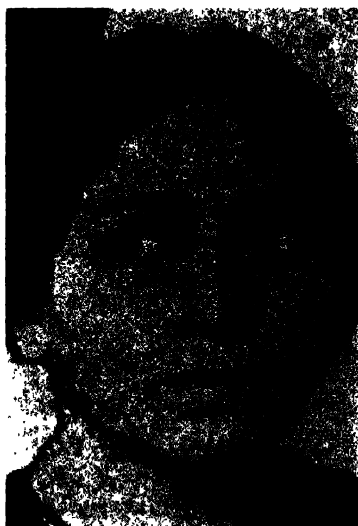


*The Times, Los Angeles*
পত্রিকায় সুষমা দেবীর একটি ছবি
ক্যালিফোর্নিয়া, ৮ অক্টোবর ১৯২৭





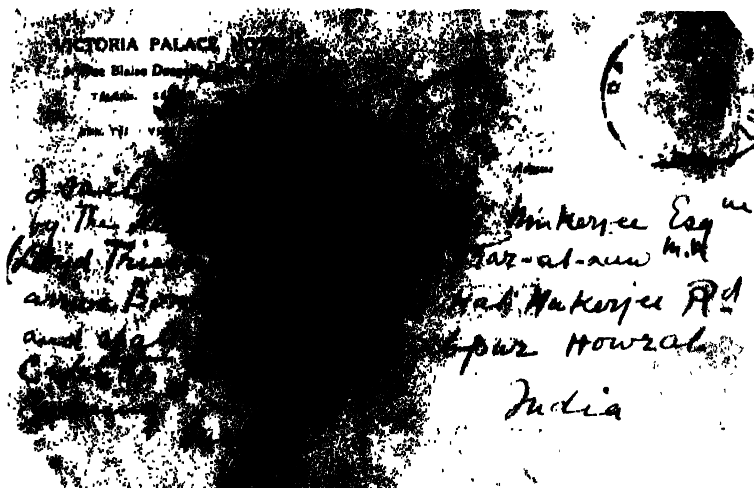
***The San Francisco Examiner***
**পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবি**
**৭ নভেম্বর ১৯২৭**



*Sunday Times, Detroit*
পত্রিকায় প্রকাশিত সুষমা দেবীর ছবি
১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮



**A Student of Sociology Sushama Tagore, niece of Rabindranath Tagore, is now touring the United States of America in order to study the sociological conditions in that country**
**-- P.P.A., *The Times of India*, May 1928**




বিদেশ থেকে হাওড়ার ঠিকানায় স্বামীকে লেখা সুষমা দেবীর একমাত্র চিঠি

BACK FROM AMERICA



আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি ছবি

Copy of a Resolution passed by the Council of Regency held on the 28th February, 1925.

--------------oOo--------------

11. To consider the question of appointing Mrs Mukerji as Tutoress to the Bai Sahibas on a salary of Rs. 275/- p.m.

It was observed that a suitable lady of the qualifications held by Mrs Mukerji could not be engaged on the budgetted salary of Rs. 175/- and it was necessary therefore to make some arrangement to meet the pay demanded by Mrs Mukerji. Mr. Bhupendra Nath Sanyal, the Bengali Tutor, is getting Rs.150 p.m. and it was therefore thought proper to dispense his service with effect from the day Mrs. Mukerji joined, and he be given whatever gratuity he is entitled to, in addition to which it is Her Highness's wish to give him his homeward expenses. Pandit Thakur Prasad, who is also a Tutor to Bai Sahibas, receives his pay from the savings under heading " Pay to lady Tutor and Governess ". He is therefore to be transferred, as agreed to by Her Highness, to Jeb Khas. He will be given Rs. 75/- by Jebkhas and Rs. 50/- by the State from the surplus left after paying Rs. 275 to Mrs Mukerji.

Resolved that :-

Mrs Mukerji be appointed Lady Tutor to Bai Sahibas on Rs. 275 p.m., and in order to meet the excess in pay Mr Bhupendra Nath Sanyal be relieved with effect from the day Mrs Mukerji joined her duties; further that the Bengali Tutor be given Rs. 600/- as gratuity to which he is entitled and he be also given his homeward expenses. It was further resolved that Pandit Thakur Prasad be transferred to Jeb Khas he should be paid Rs. 75 the rest being paid

No. [illegible]

**No.329**

**সুষমা দেবীকে গায়কোয়াড় রাজপরিবারে মাসিক ২৭৫ টাকায় গৃহশিক্ষিকা রূপে নিয়োগ করার সিদ্ধান্তপত্র**

এদেশে প্রদত্ত সুষমা দেবীর একটি ভাষণের পাণ্ডুলিপির অংশ